কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক স্মরণিকা

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক
সম্পাদিত

বাংলা একাডেমী : ঢাকা
বাংলা একাডেমী : ঢাকা

ডিসেম্বর, ১৯৭১

প্রকাশন-মুদ্রণ-বিক্রয় বিভাগ,
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রাকর
এস. খান
শাহজাহান প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৭/২, সিদ্দিক বাজার, ঢাকা—২

প্রচ্ছদ ঃ কাইয়ুম চৌধুরী

কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক স্মরণিকা

সূচীপত্র

কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক স্মরণিকা

সম্পাদকীয়

রবীন্দ্র-সমকালীন বাংলা কাব্যে বহু বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য, বহু বৈভব ও বৈজয়ন্তী। এই কালের বর্ণাঢ্য কবিতার সৌন্দর্যশ্রী এবং কাব্য-আত্মার গভীরতা ক্রমবর্দ্ধিত-পরিমণ্ডল রচনায় দেশী-বিদেশী প্রাচ্য-প্রতীচ্য সর্বভাবের সাগরতীর্থে অবগাহন করেছে। সেই তীর্থবারি-সিঞ্চিত কাব্যভূমিতে রবীন্দ্র-পরবর্তী কবিকুল ছন্দের সুষমায় দ্রুত পরিবর্তনশীল জীবন ও জগতের বাণীচয়ন করলেন।

জীবন ও জগতের সামগ্রিক রসরূপে বিভূষিত কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক। শুধু পল্লী প্রকৃতি বা গ্রাম বাংলার কথাকার সর্বস্ব নন বৃহত্তর বোধ ও বোধির আলোকে কাব্যচৈতন্যে ছিলেন তিনি সদাজাগ্রত। স্নেহপ্রবণ ও সহানুভূতি-শীল, স্বদেশসাধক ও ভক্তিভাবনায় নিবিষ্ট চিত্ত অথচ সমাজ ও সংসারের কর্তব্যনিষ্ঠ ছিলেন তিনি। তাঁর সান্নিধ্যে যাঁরাই গিয়েছেন তাঁরাই উপলব্ধি করেছেন কি গভীর প্রীতিপ্রবণ মানসিকতা নিয়ে তাঁর আতিথ্যের আপ্যায়ন। যাঁরাই তাঁকে পত্র লিখেছেন তাঁরাই জানেন কি নিবিড় নৈকট্যের সুর প্রতি-ধ্বনিত হয়েছে তাঁর পত্রে পত্রে। খুব কাছের মানুষরা বা প্রতিদিনের দেখা আছে এমন মানুষরা কি গভীর শ্রদ্ধায় যে তাঁর কাছে আসতো তা দেখার সৌভাগ্য হয়েছে যখন তাঁর জন্মদিনে বা অন্য সময় কোগ্রামে যাই। তিনি সকলের কুশল সংবাদ নিচ্ছেন আবার তারা তাঁর কুশল জানতে চাইছে—এই যে পরস্পরের শুভ-সন্দেশের মানসিকতা তা মৌখিক পোষাকী নয় গভীর আন্তরিকতায় ভরা, নিবিড় নৈতিকতায় জড়ানো।

কুমুদরঞ্জনের কবিজীবন এবং ব্যক্তিজীবনের চিত্র ও চরিত্র নানাজনের নানাদিকের দৃষ্টিতে ধরা রয়েছে তারই যতটা সম্ভব সংকলন আলোচ্য স্মরণিকায় সংগৃহীত হল। তাঁর সম্বন্ধে অনেকে আরো লিখতে পারেন এবং লেখাটাই স্বাভাবিক—আমরা অনেককেই অনুরোধ করি তবে সকলেই দিতে পারেন নি সময় মতো। যাঁদের সময় মতো পাওয়া গিয়েছে তাঁদের রচনা নিয়েই এই স্মরণিকা তাঁর একানব্বইতম জন্মদিনে আত্মপ্রকাশ করছে। এখানে বলে রাখা ভালো যে 'সাহিত্যতীর্থ' ১৩৭৮ অষ্টাদশ বার্ষিকী সংকলনে যে রচনাগুলি মুদ্রিত হয় তার সঙ্গে শেষের দিকে আরো কিছু সংযোজন করেই এই স্মরণিকা গ্রথিত হয়েছে।

বর্তমান বাংলা কাব্যসাহিত্যে দ্রুত পরিবর্তনশীল রূপ ও রীতির, প্রকাশভঙ্গি ও শিল্পকলার পরীক্ষানিরীক্ষার দিনে কুমুদরঞ্জন তাঁর কাব্যরীতিকে শুধু ঐতিহ্যাশ্রিত পথেই রেখেগিয়েছিলেন তা বলা যায় না। এই সংকলনে প্রকাশিত তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রের কিপ্‌লিং অধ্যায়ের আলোচনা এ ক্ষেত্রে সবিশেষ স্মরণীয়। তাঁকে একদিকের দৃষ্টি নিয়ে বিচার বিবেচনা না করে আমরা যেন সামগ্রিকভাবে তাঁর পুনর্মূল্যায়ন করতে পারি।

কুমুদরঞ্জন এবং অজয়ের বন্যা একাত্মভাবে উচ্চারিত হয়। কারণ অজয়ের বন্যার কথা তাঁর কাব্যের বহু ছত্রে চিত্রিত। ১৩৬৬ সালের বন্যায় কোগ্রাম হল বিধ্বস্ত। তখন শ্রদ্ধেয় প্রবীণ সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের উনাশিতম জন্মজয়ন্তী উৎসবে তাঁকে অর্থের তোড়া প্রীতি-উপহার হিসাবে দেওয়া হয়। তার মধ্যে একটা অংশ তিনি সাহিত্যতীর্থের তীর্থপতি কুমুদ-রঞ্জনের কোগ্রামের গ্রামবাসীকে প্রদান করার বাসনা প্রকাশ করেন। কারণ যে অর্থ তাঁকে দেওয়া হয় এই উপলক্ষে তা সবই বন্যার্ত সাহায্যে প্রদত্ত হয়। কুমুদরঞ্জনকে সেই হিসাবে পাঠানো অর্থ দেওয়ায় তিনি একটি তালিকা পাঠালেন কদিন পরেই। তার প্রথমেই স্বহস্তে লিখেছেন—'সাহিত্য তীর্থ হইতে সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্মজয়ন্তী সমিতি প্রেরিত ৫১ একান্ন টাকা বন্যার্তের মধ্যে বণ্টনের তালিকা।' এই তালিকায় প্রথম তিনি বণ্টন করলেন—'১। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত শ্রীশ্রী৺ লোচনদাস ঠাকুরের পাটবাড়ীর সংস্কারে সাহায্য স্বরূপ দেওয়া হইল সংস্কার সমিতির পক্ষের শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার চট্টোপাধ্যায়কে ১৬ ষোল টাকা'। তার পরে নামের তালিকার পাশে পিতা বা স্বামীর নাম এবং পরিমাণ। কাকে চার, কাকে দুই, কাকে এক এবং টিপসই দিয়েছেন অনেকেই, কেবল দুজন ছাড়া। তার পরে আবার তালিকার শেষে নিজে স্বাক্ষর করেছেন তারিখ ৮.১২.৫৯ (ইংরাজি)। এবং শ্রীশিশিরকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও। শেষ পৃষ্ঠায় লিখছেন—'প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকের জন্মজয়ন্তী সমিতির প্রেরিত ৫১ টাকা বিশেষ বিবেচনা করিয়া বণ্টন করা হইয়াছে। ক্ষতি বিপুল, প্রার্থী ও যোগ্যপাত্র অনেক তাহারি মধ্যে বাছিয়া দেওয়া হইল। শ্রীশ্রীলোচনদাস ঠাকুর চৈতন্যমঙ্গলকার প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-ভক্ত ও কবি। সামান্য হইলেও কিছু অর্থ তাঁর বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ পাটবাড়ীর সংস্কারে দেওয়া হইল। সব শুভ হউক। উপেন্দ্র জন্মজয়ন্তী সমিতিকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। গ্রামবাসী কৃতজ্ঞ। ইতি স্নেহধন্য শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।' এই সময় বন্যার্ত সাহায্যবাবদ তাঁর কাছে লোক মারফৎ ৫০টি শাড়ি,

১০টি ধুতি, ৭২টি নানা সাইজের ফ্রক, ৪৮টি নানা সাইজের সার্ট ও ৩৬টি নানা সাইজের ব্লাউজ পাঠানো হয়। মোট ২১৬টি সামগ্রী। এই ফর্দের নীচে লিখছেন—'উপরি উক্ত জিনিষগুলি সাহিত্যতীর্থের মারফৎ শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন-বিহারী মল্লিক মহাশয়ের মহৎ দান হিসাবে পাইলাম এবং কোগ্রাম এবং বাহিরের কিছু বন্যার্ত্ত লোককে বিতরণ করা হইল। Master Rolls Book Postএ পাঠানো হইল। বস্ত্রাদি উৎকৃষ্ট এবং বন্যার্ত্ত বিশিষ্ট পরিবারও আগ্রহের সহিত উহা গ্রহণ করিয়াছেন। ইতি শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক'।

এইটুকু লিখেই শেষ করেন নি চার নম্বরের দাঁস্ এক্সারসাইস্ বুক পাঠালেন ডাকযোগে যার উল্লেখ করেছেন উপরে। তার প্রথম পৃষ্ঠায় লিখছেন 'বিবরণ' শিরনামায়—'বর্দ্ধমানে কোগ্রামের বন্যার্ত্তদের জন্য কলিকাতা ৬৭নং পাথুরিয়া-ঘাট ষ্ট্রীটস্থ সাহিত্যতীর্থ মারফৎ সাহিত্যতীর্থের সম্পাদক শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিকের ছোট কাকা শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনবিহারী মল্লিক মহাশয়ের প্রদত্ত এই মহৎ দান গ্রামবাসী আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিবেন। এই দুর্দ্দিনে বৃন্দাবন বাবুর শ্রদ্ধার দান অতি বড় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাও গ্রহণ করিয়াছেন, দরিদ্রের তো কথাই নাই "দাতা শতং জীবতু"। সাহিত্যতীর্থ প্রতিষ্ঠানের এই দান গ্রামবাসী চিরদিন স্মরণ করিবে। ইতি—কোগ্রাম ১০ই নভেম্বর ১৯৫৯ ২৩শে কার্ত্তিক ১৩৬৬ শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক। P.O. তালিকা'। তৃতীয় পৃষ্ঠার উপরে নিজে আবার লিখেছেন—'সাহিত্যতীর্থ মারফৎ শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনবিহারী মল্লিক মহাশয়ের দানের তালিকা'। নিচে অন্যের হাতে লেখা সামগ্রীর ফর্দটি। পঞ্চম পৃষ্ঠা থেকে আবার আরম্ভ হয়েছে প্রাপকদের 'ক্রম নং, নাম, পিতার নাম, বস্ত্র, জামা, টিপ বা সহি' এই সব হিসাবে রেখে তাদের তালিকায় স্বাক্ষর বা টিপ ছাপ নিয়েছেন। এরও উপরের দিকে আগের পাতার মতো লিখেছেন—'সাহিত্যতীর্থের শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনবিহারী মল্লিকের শ্রদ্ধার দান'। নামের ঘরে অতি যত্ন সহকারে তাদের নাম লিখেছেন নিজে হাতে এবং তার পরে টিপ বা সই নিয়েছেন তাদের। প্রথম থেকেই খাতার এক পিঠে লিখেছেন কেবল তালিকার শেষ পৃষ্ঠার উল্টোপিঠে লিখছেন—'ইছাবট গ্রাম, সাগিরার অতি দরিদ্র বন্যাপীড়িতদিগকে ফ্রক ও জামাতে মোট ৮ (আট)-খানি দেওয়া হইল।'

এমন নিখুঁত হিসেব তাঁর পাঠানোর কোনোই প্রয়োজন ছিল না কিন্তু আদর্শনিষ্ঠ ও ন্যায়নীতিতে স্থিতধীপুরুষ তাই করেছিলেন। তিনি নিজে যেমন এই সব অন্যায় ও অসত্য জানতেন না তেমনি অপরের আছে এটাও

শুধু ভাবতে নয় কানেও শুনতে চাইতেন না। তিনি যাকে স্নেহ করেন তার পুরোপুরি ভালো যেমন চাইতেন অত্যন্ত আন্তরিকভাবে তেমনি অপরে সেইসব জনের বিষয়ে মন্দ কথা বলবে এটাও অসহ্য ছিল। কোনো এক জন শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক অপর একজন শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক সম্বন্ধে যদি কোনো কটুক্তি অসতর্ক মুহূর্তে করতে চাইতেন তখন তিনি তাঁকে সে প্রসঙ্গের আলোচনা না করতে বলতেন। তিনি নিজের মুখে হাত চাপা দিয়ে বলতেন—'আমাকে ওসব শুনায়ো না।'

এই চরিত্রের সত্যনিষ্ঠ কবি তাই হিসাবের খাতা পাঠিয়ে তালিকা শেষ করে পঁচিশ পৃষ্ঠায় স্বহস্তে লিখছেন আবার—'সাহিত্যতীর্থের সম্পাদক শ্রীরমেন্দ্র নাথ মল্লিক মহাশয়ের মাধ্যমে তাঁর ছোটকাকা শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনবিহারী মল্লিক মহাশয়ের শ্রদ্ধার মহৎ দান কোগ্রামের বন্যার্তগণ অতি দরিদ্র হইতে অতি সম্ভ্রান্ত পরিবারেও গ্রহণ করিয়াছেন। দাতা শতং জীবতু। পুরাতন বস্ত্রগুলিও দরিদ্রদিগকে দান করা হইয়াছে। সমস্ত দানই সৎ ও উপযুক্ত পাত্রে দেওয়া হইয়াছে এবং দু একক্ষেত্রে অঞ্চল প্রধান ও বিশেষ বিশ্বস্ত ব্যক্তিগণের নিকট বিতরণ করিবার জন্য পাঠানো হইয়াছে দরিদ্রদিগকে। ইতি' লিখে নিজে স্বাক্ষর করে তারিখ দিয়েছেন ৩০।৭।৬৬ এবং তাতেও সব হল ভাবলেন না। শ্রীশিশিরকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে দিয়েও নিচেই করিয়েছেন স্বাক্ষর। সামান্য জিনিস পাঠানো হল তার জন্যে কতকিছু করেছিলেন ভেবেই আমরা লজ্জাবোধ করছি—আমরা যোগ্য হাতে দিয়েছি যোগ্যজনের কাছে কাছে পৌঁছিয়ে যাবে ভেবেই—কিন্তু তিনি তার মূল্য এমনি নিখুঁত লিখিতভাবে করলেন।

কবি-আত্মার এ এক নৈষ্ঠিক পরিচয়।

কুমুদরঞ্জন-সান্নিধ্যের সব থেকে স্মরণীয় দিন ১৮ই ও ১৯শে ফাল্গুন ১৩৬২। এ বিষয়ে এই সংকলনে শ্রদ্ধেয় কুমারেশ ঘোষ বর্ণনা করেছেন এবং সেই সময়ের 'যষ্টি মধু' পত্রের পৃষ্ঠায় বিস্তৃত বিবরণ বিধৃত হয়ে আছে। সেখানে এই উপলক্ষে শ্রদ্ধেয় কবিবর যে কবিতাটি রচনা করেন তা ছাপিয়ে বিতরণ করা হয়। সেটি এখানে যথাযথ উদ্ধৃত করি, মুদ্রিত ছিল—'কলিকাতা সাহিত্যতীর্থের শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিকসহ প্রথিতযশা সাহিত্যিক শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসজনীকান্ত দাস, শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীকুমারেশ ঘোষ প্রভৃতির কোগ্রামে শুভাগমন উপলক্ষে

তোমরা এলে কি আনন্দ! কইবো আমি কায়?
উজল হ'ল বনগৃহ তীর্থ মহিমায়।
দর্শনীয়ের দর্শনীয়, বাণীর সাধকগণ
দেহে মনে করলে আমার অমৃত সিঞ্চন।
ভালবাসি তোমাদিকে, তোমরা আপনার।
তোমাদের যে আগমনই উৎসব আমার।
দুটি নদীর মাঝে থাকি শ্যামলিমার সাথ,
গলগ্রহ মায়ের, করি কতই যে উৎপাত।
কর্ম্মে এবং ফলে আমার নেইকো অধিকার।
কথা থেকে চলছি এখন রাজ্যে রূপকথার।
অকৃতী সন্তানের লাগি কি স্নেহ বক্ষে
আদর কর আমায়, মাতা হাসেন অলক্ষ্যে।
হয়ত এতে মিট্‌লো কতক স্নেহময়ীর সাধ,
শির পাতিয়া তোমরা লহ মায়ের আশীর্ব্বাদ।

কোগ্রাম শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১৯শে ফাল্গুন ১৩৬২

সাধনা প্রেস, বর্ধমান।

একটি সাদা কাগজে নীল কালিতে মুদ্রিত এই কবিতাটি তিনি সভায় পাঠ করেন এবং বিতরণ করা হল। আমরা এই দেখে বিহ্বলতায় ও স্নেহ-শ্রদ্ধায় একেবারে বিচলিত হয়ে যাই। আগের দিনের ঘটনা যা 'কবিতীর্থে' আলোচনায় আছে তা এখানে আর উল্লেখ করছি না। পরদিন অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে তিনি সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত সাহিত্যতীর্থের বসন্ত অধিবেশনে সভাপতিরূপে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্যজীবনের গোড়ার কথা শুনলেন। পরবর্তী যুগের তরুণ ও প্রৌঢ় সকলের প্রতি যে তাঁর গভীর প্রীতি ও সহজ আত্মীয়তাবোধ ছিল তা সেই সময়েই আমাদের মুগ্ধ করে।

২৮শে অগ্রাণ ১৩৭৭ সালের সকাল বেলায় পরলোকগমন করেন। পরলোক-গমনের পর প্রথম শোকসভার এবং জন্মদিনে অনুষ্ঠিত সভার বিবরণ দিই।

সেদিনের বাংলার প্রবীণতম কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের পরলোকগমনে বিশিষ্ট কবিসাহিত্যিকবৃন্দ পয়লা পৌষ ১৩৭৭ বৃহস্পতিবার বিকেলে 'সাহিত্যতীর্থ' ৬৭ পাথুরিয়াঘাট স্ট্রীটে এক সভায় মিলিত হন। কবির স্থায়ী স্মৃতিরক্ষার জন্যে

একটি সমিতি গঠন করে 'সাহিত্যতীর্থ'-সম্পাদক হিসাবে প্রারম্ভে প্রস্তাব করা হয় যে, (১) কুমুদরঞ্জনের স্মৃতিশ্রদ্ধাঞ্জলি সম্বলিত স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ। (২) কবির সমগ্র রচনাবলী প্রকাশ। (৩) কবির প্রামাণ্য জীবনী প্রকাশ এবং (৪) বালিগঞ্জ প্লেসের যে অংশে কবি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করলেন তার নামকরণ হোক 'কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক সরণী'। সভায় কবির পবিত্র স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন প্রসঙ্গে বহু মধুর স্মৃতিচারণা এবং কবির কবিতা উদ্ধৃতি করে ভাষণ দেন সভার সভানেত্রী রাধারানী দেবী এবং আশাপূর্ণা দেবী, বাণী রায়, পুষ্প দেবী, মনোজ বসু, জরাসন্ধ, কালীকিংকর সেনগুপ্ত, দক্ষিণারঞ্জন বসু, ভবানী মুখোপাধ্যায়, অখিল নিয়োগী, কৃষ্ণ ধর, কুমারেশ ঘোষ, রণজিৎকুমার সেন, মন্মথ রায়, বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় ও গোপাল ভৌমিক।

প্রারম্ভে উত্থাপিত শোকপ্রস্তাবে বলা হয়---'এই সভা আজ বঙ্গীয় কবিকুলের ঐতিহ্যবাহী নৈষ্ঠীক চৈতন্যের অধিকারী সর্বজন শ্রদ্ধেয় বর্তমানের প্রবীণতম কবি শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক মহাশয়ের পরলোকগমনে আত্মীয় বিয়োগ বেদনা অনুভব করছে। তীর্থপতি রূপে দীর্ঘ ষোল বছর সাহিত্যতীর্থের কল্যাণবিধানে তাঁর আন্তরিক আশীর্বাদ আমাদের পরম পাথেয় স্বরূপ। পল্লী বাংলার এই সহজ প্রাণের কবিপুরুষকে হারিয়ে সকলেই বাংলার রবীন্দ্রোত্তর কবিসমাজের অন্যতম সাধকের অভাব অনুভব করছে। এই সভা তাঁর বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করছে এবং আত্মীয়বর্গের প্রতি আমাদেরও সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।'

বিভিন্ন বক্তা তাঁদের শ্রদ্ধাভাষণে উপেক্ষিত অবহেলিত গ্রামবাংলার মানুষের সহজ প্রাণের কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের দীর্ঘজীবনে কোনো রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রদান করা না হওয়ায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ পায়। 'পদ্মশ্রী'র উর্ধ্বের সম্মান তাঁর প্রাপ্য ছিল তাও কেউ কেউ উল্লেখ করেন। ভাষণে সকলেই বলেন যে, কবি তাঁর ব্যক্তিজীবনে এই সকল সম্মানের কোনো ভাবনাই করেন নি। সকলের প্রতি প্রীতি পরিবেশনাই তাঁর কাম্য ছিল।

কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের ৮৯তম জন্মোৎসব ১৯শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার বিকেলে রামমোহন লাইব্রেরী হলে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সদ্য পরলোকগত কবি কুমুদরঞ্জনের জন্মদিনে শ্রদ্ধা জানিয়ে সভাপতির অভিভাষণে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন—কুমুদরঞ্জনের সাধক কবিমানসের মহৎভাবনার কথা। কুমুদরঞ্জনের অন্তর্লোক প্রসঙ্গে প্রাক্তন বিচারপতি সমরেন্দ্রনারায়ণ বাগচী বিস্তৃত আলোচনা করেন। দক্ষিণারঞ্জন বসু

তাঁর ভাষণে কবির জন্মগ্রাম বর্ধমানের কোগ্রামের নাম 'কুমুদগ্রাম' রাখার প্রস্তাব করেন। সভায় কুমুদরঞ্জনের স্মৃতিচারণা করেন ও কবিতা পাঠ করেন কালীকিংকর সেনগুপ্ত, কুমারেশ ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন বসু, ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অখিল নিয়োগী ও রমেন্দ্রনাথ মল্লিক। কুমুদরঞ্জন-রচিত সংগীত পরিবেশন করেন সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়, জগন্নাথ দত্ত, চন্দন সমাদ্দার। কুমুদরঞ্জনের কবিতা আবৃত্তি করে কবির কনিষ্ঠপুত্রের পুত্রদ্বয় বাণীকুমার ও শ্রীকুমার মল্লিক। মেদিনীপুর বীরসিংহ গ্রামের বিদ্যাসাগর সার্ধশতবার্ষিকী সংকলন গ্রন্থটি কবি কুমুদরঞ্জনের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত হওয়ায় সভায় কবির জ্যেষ্ঠপুত্র জ্যোৎস্নানাথ মল্লিকের হস্তে অর্পণ করা হয়।

সাহিত্যতীর্থের প্রতিষ্ঠা কাল থেকেই কবিবর কুমুদরঞ্জন প্রতিষ্ঠানের পরম শুভার্থী। করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরলোকগমনের পর থেকে ষোল বছর তিনি তীর্থপতি ছিলেন। প্রথম কবি সম্মেলন ১৩৬২ সালের পয়লা বৈশাখ থেকে কয়েকবার তিনি সাহিত্যতীর্থের তীর্থপতি রূপে পাথুরিয়াঘাটায় অনুষ্ঠিত উৎসবে যোগদান করেছেন, সকলের সঙ্গে সহাস্যে প্রীতি বিনিময় করেছেন। তাঁর মধুর উপস্থিতি সমস্ত পরিবেশকেই মধুময় করে তুলতো। তাঁকে ১৩৬২ সালের ১৯শে ফাল্গুন তাঁর ৭৪ তম জন্মদিনে কোগ্রামের গৃহে গিয়ে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে সেই সম্বর্ধনায় এক মানপত্র প্রদান করা হয়, তাতে বলা হয়েছিল—

'সাহিত্যতীর্থের তীর্থপতি কবিবর শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক করকমলেষু—

পল্লীপ্রাণ বাংলার কবি, বাংলালীর কবি, আপনার সরল অনাড়ম্বরময় কাব্য কল্পনা-কালিন্দীর তটতীর্থে অতিবাহিত বিগত ত্রিসপ্তি বৎসরের কবিমালঞ্চের জীবনযাত্রাকে আজ আমরা অন্তরের অন্তরতম প্রদেশের ভালোবাসার হৃদয়-অর্ঘে বরণ করতে এসেছি। এসেছি আমরা আপনার মানবপ্রীতির প্রেমরসাপ্লুত 'বনতুলসী', 'বনমল্লিকা', 'শতদল', 'বীথি'র টানে। এসেছি আমরা 'একতারা'র বাউলের সুর শুনতে, 'নূপুর' ধ্বনি অনুভব করতে, 'উজানি' 'অজয়' নদীর তীর্থতীরে এই 'স্বর্ণসন্ধ্যা'য়। আপনার কবিমানসে গ্রামীণ চিন্তাই চৈতন্যলোক বিহারী। পল্লীগ্রামের শ্যামল তরুচ্ছায়ে লীলায়িত আপনার অম্লান কবিজীবনকে আমরা আজ অভিনন্দিত করি। পল্লীপ্রকৃতির কোলে বসে পদরজ বলে পথের ধুলা মাঠ-মাটিকেই আপনার মাথায় তুলে নিয়েছেন—আপনাকে প্রণাম, শত প্রণাম।

ভাবপ্রবণ কবি, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শময় পৃথিবীর সকল কিছুর

মধ্যেই বাউলের ব্যাকুলতার সুর আপনি শুনেছেন ; আপনি জেনেছেন পৃথিবীর সরল সত্যকে। কবিহৃদয় অতিচেতন তাই আপনার চিত্তচৈতন্যে অতিশয় ক্ষুদ্র বস্তুও অতি মূল্যবানরূপে প্রতিভাত হয়। আপনার হৃদয়স্পর্শে ক্ষুদ্র হয়েছে বৃহৎ, মূল্য হয়েছে অমূল্য। আপনার কবিতার ছন্দে ছন্দে শুনেছি আমরা স্বদেশপ্রীতির ভক্তিগীতি। তাই গ্রহণ করুন আমাদের অকৃত্রিম আন্তরিক ভালোবাসা।

ভক্তকবি, বৈষ্ণবের বিনয় নিয়ে বুঝেছেন মনের অহংকার মুছে ভক্তিসাধনাই হৃদয় অলংকার, প্রেমই প্রাণের বস্তু, প্রীতিই গীতির ধর্ম, বহু তীর্থের পথ ঘুরে চাওয়া-পাওয়ার উর্ধ্বে এক মন নিয়ে। তাই সাহিত্যতীর্থের তীর্থংকর আমরা এনেছি শুধুই শ্রদ্ধাঞ্জলি। আপনার সঙ্গসুখে ও কাব্যসুধায় আমাদের মনপ্রাণ পবিত্র হোক, মহিমান্বিত হোক। আপনার চতুর্সপ্ততিতম জন্মজয়ন্তী দিনে হৃদয় হতে উৎসারিত এই সম্বর্ধনা গ্রহণ করুন। সাহিত্যতীর্থের তীর্থংকরদের পক্ষে রমেন্দ্রনাথ মল্লিক কো:গ্রাম ১৯ ফাল্গুন ১৩৬২।'

সাহিত্যতীর্থের যুগজয়ন্তীবর্ষপূর্তি উৎসব গত ১৩৭৩ সালের পয়লা বৈশাখ ডক্টর হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় তীর্থপতি কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক মহাশয়কে জয়ন্তীপূর্তি উপলক্ষে সম্বর্ধিত করা হয়। শ্রদ্ধাঞ্জলি মানপত্রে উল্লেখ করা হয়—

'পল্লীপ্রাণ বাংলার ভক্ত-কবিসমাজের অন্যতম আপনি। আপনার 'বনতুলসী', 'বনমল্লিকা', 'শতদল', 'বীথি', 'নূপুর', 'একতারা', 'অজয়', 'স্বর্ণসন্ধ্যা' প্রভৃতি কাব্যছন্দাবলী বাঙালীর হৃদয়ের বস্তু। ক্ষুদ্রের মধ্যে বৃহতের সম্ভাবনায় অনুসন্ধানী আপনার চেতনালোকিত কবিমানস। আপনার কবিতাবলী আমাদের বিশেষভাবে মানস উদ্বোধনের সহায়ক। আমরা আপনার অনাড়ম্বর প্রকৃতিপ্রেমিক সুন্দরের পূজারী কবিরূপে সুদীর্ঘকাল সঙ্গসুখ আশা করি। আজ সর্বাগ্রে স্মরণযোগ্য সুদীর্ঘকাল ব্যাপী আপনার অনলস বাংলা কাব্যসাধনার কথা। আমাদের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশের শ্রদ্ধার্ঘ্য আজ নববর্ষের এই সুন্দর সন্ধ্যায় গ্রহণ করুন, প্রণাম গ্রহণ করুন।'

অনেক গ্রন্থে বিশেষ করে তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা রয়েছে—আরো আলোচনা হবে, আমরা সামান্য সামর্থে কয়েক বছর পরে থাকার পর যতটুকু ছাপা হয়েছে তাই দিয়েই জন্মদিনটিতে স্মরণিকা প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি।

সবিনয়ে কবিজীবন-পরিচয়ের সেই শ্রদ্ধার স্মরণিকা-নৈবেদ্য উপস্থাপিত বঙ্গভাষী সমাজের সমীপে।

কবি কুমুদরঞ্জন ও তাঁর কাব্যচৈতন্য

বিহারীলাল চক্রবর্তীর গীতিকবিতার ধারা রবীন্দ্রনাথ, গোবিন্দচন্দ্র, দেবেন্দ্র সেন, অক্ষয় বড়ালের হাত দিয়ে বাংলার মহাকাব্যিক চৈতন্যকে ছন্দসুষমায় ও গীতিমূর্ছনায় যখন পরিপূর্ণভাবে আপ্লুত করেছে সেই সময় রবীন্দ্রনাথই তাঁর গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য গীতালির মতো উৎকৃষ্টতম ও আদর্শ স্থানীয় গীতিকবিতা রচনা করেছেন এবং বাংলার কাব্যদিগন্তকে বহুদূর বিস্তৃত ক'রে দিয়েছেন। এই ভাবরাজ্যে যখন বাংলার কবিহৃদয় পরিপ্লুত সেইক্ষণের যে ভাবপরিমণ্ডল তারই সঙ্গে আপন আপন প্রকৃতিচৈতন্যের সংযোগে রবীন্দ্রোত্তর বা রবীন্দ্র-সমকালীন কবিকুল বঙ্গীয় কাব্যনিকুঞ্জের এক-একটি শাখায় উপবিষ্ট হয়ে আপন আপন কাব্যধ্বনিতে বাতাসকে মধুময় করেছেন। রবীন্দ্র-সমকালে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, নরেন্দ্র দেব ও কালিদাস রায়—এঁরা আপন বৈশিষ্ট্যে বাংলার কাব্যকুঞ্জে নব নব কুসুমাঞ্জলি প্রদান করেছেন। এই কালের কবিদের কাব্যবিচারে প্রবৃত্ত হয়ে অনেকেই বলেন যে, এঁরা কবিতার ভাষায় ও ছন্দে, বক্তব্যে ও ব্যঞ্জনায় রবীন্দ্র-প্রভাব মুক্ত হতে পারেন নি। কিন্তু তবুও তাঁদের কাব্যের বিচার করতে গেলে তাঁদের পূর্বসূরীর প্রভাব নির্মুক্তির কথা এলেও তাঁদের যে আপন বৈশিষ্ট্যের কিঞ্চিৎ অংশও আছে সেটুকুও যেন আমরা কখনো ভুলে না যাই। তাই কুমুদরঞ্জনের কাব্যবিচারে প্রবৃত্ত হয়ে আমরা যেন কখনো তার ভাববস্তু ও প্রেরণার ক্ষেত্র এবং বিষয় বৈচিত্র্যের কথা উপেক্ষা না করি। রবীন্দ্র-সমসাময়িক কাব্যক্ষেত্রে কবি অক্ষয়কুমার বড়াল যেমন তাঁর ভাষা সংযমে ভাবকেন্দ্রিকতার পরিচয় দিয়ে আপন সৃষ্টি স্বকীয়তায় উজ্জ্বল তেমনি রবীন্দ্রযুগের কবিগণের মধ্যে কুমুদরঞ্জনের কবিতায় শব্দপ্রয়োগ ও ঋজু বক্তব্য উপস্থাপনে তাঁর কবিতা অপূর্ব রসঘন।

আধুনিক কালের বিচারে কুমুদরঞ্জনের কবিতা প্রাচীনপন্থী হলেও তাঁর বিচার তাঁর কালের ও মননচারিত্রের দিকটির মৌলকেন্দ্রকে বিশেষভাবে অনুধাবন করার পর তবেই আলোচনায় বিরূপ মন্তব্য বা ফতোয়া জারির জিগীর তুলতে পারলেও তবু কোনো ভাবে যদি বা পারা যায় কিন্তু তার আগে নয়। প্রাক মধুসূদনের যুগের বাঙালি সাধককবিগণের যে গান ভাব-ভাষার সরলতায় ও

প্রাণের আকুলতায় মর্মস্পর্শী, সেই গানই নতুন রূপে কুমুদরঞ্জনের রচনায় ভাব-ভাষা ও বিষয়-বৈচিত্র্যে, ছন্দে ও উপমা-অলঙ্কারে, দেশী-বিদেশী পৌরাণিক-আধুনিক উপমা-উদাহরণ সংযোগে সার্থক কবিতার মহান পর্যায়ভুক্ত হয়েছে। তাঁর কবিতার মৌলভাব-লক্ষণ নির্ণয়ে দেখা যায় ভাষা ও ছন্দে তিনি যেমন রবীন্দ্রযুগের সীমানায় তেমনি হৃদয়বৃত্তি এবং ভাব ও ভাবনার রাজ্যে পরিশীলিত বৈষ্ণবধর্মী। তাই কুমুদরঞ্জন ১৩২৭ সালে প্রথম প্রকাশিত 'নূপুর' কবিতাগ্রন্থটি উৎসর্গ করেন 'অজয়ের তীরে রহিতেন কবি পর্ণ কুটিরবাসী' সেই 'বৈষ্ণব কবি শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের শ্রীচরণে' এবং শেষ কবিতাটিতে লিখেছেন—'ইতির পরে নিতিই লিখি নূতন করে 'শ্রীহরি'।' কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার বলেছেন—'কবি হিসাবে ইঁহাকে প্রাচীন বৈষ্ণব কবিগণের আধুনিক বংশধর বলা যাইতে পারে—ইঁহার প্রাণমন সেই প্রেম ও ভক্তি রসে পূর্ণ।' তাই দেখা যায় কুমুদরঞ্জন 'বৈষ্ণব-বন্দনা' কবিতায় বলেছেন—

'তোমার জ্ঞানের পাষাণভূমিতে মধুর-মালতী ফুল
উষর মরুর ধূসর বালুতে যমুনার কুলকুল।'

এই দিক থেকে কুমুদরঞ্জনের কবিতার বিচার করতে হলে তাঁর কবিতা ভক্তিরসাত্মক ও প্রীতি প্রাধান্য যুক্ত বলেই মনে হবে। কিন্তু এই ভক্তিপ্রীতি তথাকথিত বৈষ্ণবসাধকদের মতো কেবলমাত্র রাধাপ্রেমে বা কৃষ্ণবিরহেই ক্ষান্ত হয় নি তাঁর কবি-অন্তরের অন্তস্থল থেকে হৃদয়বৃত্তি সঞ্জাত ভক্তিপ্রীতি দেশ, জাতি, সমাজ, রাষ্ট্র থেকে আরম্ভ ক'রে প্রাচীন কবি, প্রিয়জন, ছোট্ট গ্রামটি, ক্ষুদ্র মাঠ, সংকীর্ণ নদী, বটবৃক্ষ—এমন কি পশুপক্ষী পর্যন্ত কবিমানসের ঐকান্তিক প্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ। ১৩২৫ সালে প্রথম প্রকাশিত কুমুদরঞ্জনের 'বনমল্লিকা' গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন গাঁয়ের পরিচিত বটবৃক্ষকে। উৎসর্গ পত্রে লিখেছেন—'যে আশ্রিত বৎসল সন্তাপহারী অক্ষয় শ্যামছায়াতরুর পবিত্র পদতলে দুঃখে আশা, সুখে তৃপ্তি, শোকে শান্তি পাইয়াছি, যাঁহার সুশীতল ছায়ায় বিমল আনন্দ অনুভব করিয়াছি—সেই দেবতাত্মা বটবৃক্ষের শ্রীচরণতলে এই ক্ষুদ্র 'বনমল্লিকা' ভক্তিভরে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইলাম।' ভূমিকায় তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন—'ইহা আমার পূজনীয় প্রিয় একটি বটবৃক্ষকে অর্পণ করিলাম। তাঁহার ছায়ায় আমি বহু তৃপ্তি ও শান্তি লাভ করিয়াছি।'

অনুরূপ প্রাকৃতিক বস্তুর প্রতি মমত্ববোধের আর একটি উদাহরণ পাওয়া যায় একটি পল্লীগ্রামের পুরাতন বকুলবৃক্ষের মৃত্যুতে ব্যথিত কবির সহৃদয়

শোকগাথায়। শুধু সিদ্ধবটের জন্যে শোক নয়, প্রীতি সঞ্চারিত তরুলতাটির প্রতিও। 'বকুলতরু' কবিতায় কবি লিখেছেন—

'পাঁচ শো বছর হেথায় ছিলে প্রাচীন বকুল গাছ
অজয় নদের স্রোতের ঘায়ে পড়লে ভেঙে আজ।
...
সিদ্ধ তুমি না হও, মোদের বৃদ্ধ তরুরাজ
বক্ষ ওঠে টনটনিয়ে বিদায় নিলে আজ।'

পল্লীর গুণমুগ্ধ প্রাণ কবি গ্রামের একটি প্রাচীন অশথ গাছের শোকেও লিখছেন—

'চ'লে গেছ তুমি, শুধু প্রান্তর ধূ ধূ করে অনিবার,
চারিদিকে ক্ষীণ কাশের শীর্ণ দীনতা বাড়ায় তার।'

এই 'প্রাচীন অশথ' কবিতাটি রচনার ইতিহাস কবি স্বয়ং উল্লেখ করেছেন —'গাছটি বহু প্রাচীন, অজয়ের ঠিক ধারেই ছিল, ক্রমশ সরিয়া আসে। গাছটি প্রতিষ্ঠা-করা। সেই জন্য লোকের ভালোবাসা ও ভক্তির পাত্র ছিল। অল্পদিন হইল নদীর ভাঙনে পড়িয়া গিয়াছে।'

'আমার বাড়ি' কবিতায় বলছেন—

'বাড়ি আমার ভাঙন-ধরা অজয় নদীর বাঁকে,
জল যেখানে আদর ভরে স্থলকে ঘিরে থাকে!
সামনে ধূসর বেলা   জলচরের মেলা,
সুদূর গ্রামের ঘর দেখা যায় তরু লতার ফাঁকে।'

অজয় নদের তীরে বসে অজস্র কবিতায় তাঁর আপন গ্রামের সর্বস্তরের মধ্যে প্রীতির প্রেমের ও একাত্মতার বোধ নিয়ে কবির মনোলোক গঠিত হয়। তবুও 'শেষ' কবিতাটিতে আবারো লিখলেন—

'দীন পল্লীর মেঠো গান তোর কে শুনিবে রাজসভাতে ?'

কুমুদরঞ্জনের প্রকৃতিগত প্রীতিমুগ্ধ কবিদৃষ্টিতে সামান্যের প্রতি অসামান্য বোধ উদ্ভাসিত হয়—সরল মনের গভীর আর্তি সহজ সুরে। অজয় ও কুনুর নদীর সঙ্গমস্থলে কুমুদরঞ্জন বর্ধমান জেলার 'উজানি' বর্তমান কোগ্রামের যে মাটিতে ১২৮৯ সালের ১৯শে ফাল্গুন জন্মগ্রহণ করেছিলেন তার ফল ফুল পাতা লতা সব কিছুর মধ্যেই আপন কবিহৃদয়ের সহজ একাত্মতার ভাব অনুভব করেছেন। এই প্রগাঢ় অনুভূতি কুমুদরঞ্জনের প্রীতিভক্তি রসাশ্রিত সরলঋজু কবিমানসেরই

স্বভাবধর্ম। তাই তাঁর সৌন্দর্যসম্ভোগের কবিদৃষ্টি সর্বত্র ভক্তি অথবা প্রীতির আবেগচাঞ্চল্যে বিরহজনিত অশ্রুসজলিত কিন্তু এই দুঃখের প্রভাবে কুমুদরঞ্জনের কবিতায় ভীম-অসন্তোষ বা বিদ্রোহ নেই। কুমুদরঞ্জনের কবিতা শান্তরসাত্মক, শান্তরসের কবি কুমুদরঞ্জন। প্রেমধর্মীয় বৈষ্ণব সাধনার প্রভাবেই কুমুদরঞ্জনের এই চিত্তোৎকর্ষ ঘটেছে। মোহিতলালের ভাষায়—'কুমুদরঞ্জনের কবিতা এক শ্রেণীর খাঁটি বাংলা কবিতা, কুমুদরঞ্জন বাংলার পল্লীকেই তীর্থমহিমায় মণ্ডিত করিয়াছেন।' এই দিক থেকে পল্লীবাংলার সার্থকনামা কবি কুমুদরঞ্জন যিনি পল্লীপ্রিয় বাঙালি কবি। বাংলা কবিতার শ্যামল প্রান্তরে হৃদয় উৎসারিত আনন্দধারায় স্নাত এক অপরিসীম প্রীতিময় কবিসত্তার অধিকারী ছিলেন। বাংলার পল্লীপ্রীতির কবিতায় তাই তাঁর দান অনস্বীকার্য। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের প্রকৃতিপ্রেম আবাল্য কবির মনকে সঞ্জীবিত করেছে—যা তিনি একাধিকবার পত্রে এবং কথায় বলে গেছেন। 'বনমল্লিকা' গ্রন্থের 'গ্রামে' কবিতায় বলছেন—

'তীর্থ আমার, স্বর্গ আমার, ক্ষুদ্র গৃহকোণ
সফল আমার পুণ্যিপুকুর, সফল আরাধন।'

এবং ধরার ধূলিক্ষেত্রেই কবির মানসমায়া তাই 'মা' কবিতায় লিখেছেন—

'তীর্থে ঘোরে নিত্য লোকে স্বর্গ লাগি হায়
স্বর্গ আসে দেখতে মরত মায়ের পদছায়।'

কুমুদরঞ্জনের কবিতায় কুমুদরঞ্জনের ভাবজীবন ও অনুভূতি প্রাণ উভয়েই গভীর ভাবে রেখাপাত করেছে। তিনি সহজের সাধনা করেছেন, সরল গ্রামীন মানসিকতাকে গ্রাম বাংলার পথে প্রান্তরে উপলব্ধি করেছেন এবং কাব্যের বিষয়বস্তু রূপেই সেগুলির ব্যবহার করেছেন। গ্রামের বালিকা, গ্রামের মাঝি, ভদ্রজন—এমন কি নতুন কনে বউকে পর্যন্ত তাঁর কাব্যগাঁথার অভাবনীয়ভাবে বিষয়িভূত করেছেন। এইখানেই বৈষ্ণব প্রেমের উচ্চ আধ্যাত্মিকতার রসে প্রেমার্ত হয়েও নিজেকে মাটির পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হতে দেন নি; তিনি কবিকল্পনায় কালিন্দীর তটতীর্থে যেমন বিহার করেছেন তেমনি চর্মচোখের মুক্তদৃষ্টিপাতে ধূলিধূসরিত পৃথিবীর সব কিছুকেই কাব্যমহিমা দান করেছেন। তাই খাঁটি বাঙালি প্রাণের সঞ্জীবনীরসের উৎসার যে পল্লীগ্রাম, সেই পল্লীরই প্রীতিমুগ্ধ কবি কুমুদরঞ্জন—তিনি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও ঐতিহ্য লালিত বঙ্গীয় ভাবচৈতন্যকে বিস্মৃত হন নি। তাই তাঁর কবিতায় রয়েছে এক সহজাত পল্লীপ্রীতি-প্রবণতার সফল পরিচয়। ১৩১৮ সালে প্রথম প্রকাশিত

'উজানি' গ্রন্থের ভূমিকায় কবিবর লিখেছেন—'অনেকগুলিই সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। ইহা আমাদের ক্ষুদ্র গ্রামের ক্ষুদ্র ইতিহাস। সামান্য জীবনের সামান্য চিত্র।' আবার এই রকমভাবেই 'একতারা' গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন—'সামান্য গ্রাম্য ঘটনা,—বিষয় ক্ষুদ্র, কবিও ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র একতারাতে বড় সুর বাজিবে না, বাজাইবার সামর্থ্যও নাই।'—বৈষ্ণব বিনয় বললেও অনেকে বলতে পারেন কিন্তু তিনি এমনি ভাবের কথায় সকল সময় নিজেকে তৃণের চেয়েও ক্ষুদ্র বলতে পারাকেই যেন ভালোবাসতেন। তিনি তাই তাঁর 'স্বর্ণসন্ধ্যা' গ্রন্থের 'মাতৃস্তোত্র' কবিতায় বলছেন—

'গুল্ম হয়ে বসুন্ধরে স্তন্য তোমার টেনেছি গো।'

পল্লীপ্রীতির পরিচায়ক তাঁর অধিকাংশ কবিতায় 'আমার অপূর্ণতা জানি আমি গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী'—এমনিই মানসিকতায় তিনিও কবিগুরুর অনুগামী সহযাত্রী। তাঁর পল্লীপ্রীতির পরিচয় সেকালের প্রচুর কবিতায় পাই। 'বনমল্লিকা' গ্রন্থের 'প্রবাসী' কবিতায় বলেছেন—

'কোথা আম গাছে ঝুল ঝাপ্পুর কোথা বটগাছে ঝুলবো
কোথা অজয়ের সেই শ্যামকুল যেথা বুনো কুল তুলবো।'

অথবা 'স্বর্ণসন্ধ্যা'য় 'পল্লী' কবিতায় 'তোমারে যে আমি ভালোবাসিয়াছি কাব্য পড়িয়া নহে।' প্রসঙ্গ ক্রমে এই গ্রন্থের 'কোকিলের ব্যথা' কবিতার এক ছত্র উল্লেখ করা চলে যেখানে তিনি বলছেন—'সেথাকার ধূলি মোর রেণু কুঙ্কুম'।

গ্রামের নদীর নামে কুমুদরঞ্জন 'কুনুর' কবিতায় লিখেছেন—

'আমি চলে যাবো, হে বন্ধু মোর, দীর্ঘ তোমার স্থিতি
বরষ বরষ আনিবে বন্যা উদ্দাম কলগীতি।'

আলোচ্য কবিতাটিতে ইংরাজ কবির নদীর[১] কবিতার অনুরণন পেলেও কুমুদরঞ্জনের রয়েছে স্বকীয় বক্তব্য তিনি অজয়ের বন্যার জলে প্লাবিত কুনুর নদীটির কথা লিখছেন আপন অভিজ্ঞতার সজীব রসে রঞ্জিত হয়েই। অপর কবিতাও তাঁর এমনি ধারার রয়েছে। বন্যা থাকলেও গ্রাম ছাড়েন নি অশীতিপর জীবনে।

'অজয়ে তো জানো, দুর্দম তার গতি
যত ভালোবাসা তত বেশি তার রাগ;

১ 'Men may come and men may go,
But I go on for ever.' —Tennyson [The Brook]

বরষ বরষ করে সে আমার ক্ষতি
তবু ভালোবাসি তাহার সেই সোহাগ।'

এই 'অজয়ের বন্যা' কবিতাটিতে প্রীতিপ্রসন্ন কবিহৃদয়ের এমন যে স্পষ্টপ্রত্যক্ষ স্বীকারোক্তি তা কুমুদরঞ্জনের পক্ষেই সম্ভব। তাঁর প্রেমচৈতন্য ক্ষতির ক্ষতিয়ান পরিমাপ ক'রে কখনো দরদী হৃদয়বৃত্তিকে সসংকুচিত করেন নি, কখনো লাভের আশায় লোভের নেশাকে প্রশ্রয় দেন নি। তিনি জানতেন—আপাত মধুর নয় চিরন্তন স্বাদ—যা শাশ্বত আনন্দের বিজয়োৎসব।

তাই পার্থিব মানসিকতা সর্বস্বজনদের উদ্দেশ্যে কবি শেষ ছত্রে বললেন—

'তোরা খুঁজে মর ভুলি আনন্দ সব,
হারালো কাহার পুঁটুলির সম্বল।'

এমনি তাঁর অজস্র অসংখ্য সহজপ্রীতির পরিচায়ক, প্রকৃতির প্রীতিপ্রবনতায় মাখা কবিতা ছাড়াও কবিতাপুস্তকের নামগুলোর দিকে লক্ষ্য করি যদি তা হলেও দেখব তাঁর কবিমানসে আপন দেশগাঁয়ের চিন্তাই চৈতন্যলোকবিহারী। জন্মস্থানের নামে তাঁর গ্রন্থের নামও দিলেন 'উজানি'। আবার এই গ্রামের দুই ধারে কুনুর ও অজয় নদী প্রবাহিত তার নামে গ্রন্থের নাম দিলেন 'অজয়'। তার পর 'নূপুর', 'শতদল', 'একতারা', 'বনতুলসী', 'বনমল্লিকা', 'রজনীগন্ধা', 'স্বর্ণসন্ধ্যা' প্রভৃতি। বহুপূর্বে 'দ্বারাবতী' নামে একটি নাটিকাও প্রকাশ করেন।

বাংলা দেশের গ্রামের সরল মানুষদের নিয়ে কুমুদরঞ্জন কাহিনীকবিতা রচনায়ও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কিন্তু এই কাহিনীর মধ্যেও একটি ভক্তিরস কেন্দ্রিভূত আছে দেখা যায়। যার ফলে এগুলি নিছক কাহিনী সর্বস্ব না হয়ে ভাবসমৃদ্ধ উচ্চ কবিতার সীমায় উন্নীত হয়েছে। কুমুদরঞ্জনের কবিতায় ভাবপ্রকাশের সার্থক বাহন হিসাবে লক্ষ্য করা যায় স্থানে স্থানে সুন্দর অথচ সহজবোধ্য উপমা প্রয়োগ করেছেন। কুমুদরঞ্জনের কবিতায় উপমা কেবল মাত্র অলংকার বিশেষ বললে ভুল হবে; উপমা ভাবের হৃদয়স্পর্শী অনুভূতি সহায়ক। কোনো কোনো কবিতায় তিনি পৌরাণিক বা ধর্মীয় উপমা প্রয়োগ ক'রে সরল সরল ভঙ্গিমায় নিজের সার্থক কাব্যচৈতন্যের স্বরূপটি প্রকাশিত করেছেন। এই শ্রেণীর অনেক কবিতা আছে।

'সাহিত্যবিতান' গ্রন্থে বিধৃত 'কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক' প্রবন্ধে মোহিতলাল বলছেন—'রবীন্দ্রযুগে—উনবিংশ শতাব্দীর সেই নব-ভাবপ্লাবনের শেষে, সেই নব-ভাবকে উৎকৃষ্ট কলাশিল্পে মণ্ডিত করিয়া যে গীতিকাব্যের পত্তন হইল,

তাহার আওতায় পড়িয়াও, বাংলার সেই জাতিগত কালচার যে খাঁটি কাব্যরূপ ধারণ করিতে পারে—কুমুদরঞ্জনের কাব্য তাহাই।'

তাই 'কুমুদরঞ্জন মল্লিকের শ্রেষ্ঠকবিতা' গ্রন্থের 'পরিচায়িকা'য় কবিশেখর কালিদাস রায় লিখেছেন—'যে জন্য কুমুদরঞ্জন মোহিতলালের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন—ঠিক সেই জন্যই কুমুদরঞ্জন বাঙালির মর্মও গভীরভাবে স্পর্শ করিয়াছেন, আবার ঠিক সেই জন্যই এক শ্রেণীর অর্বাচীন পাঠকের কাছে কুমুদরঞ্জনের কবিতার যথাযোগ্য মর্যাদা নাই। এই বিমানের যুগে বিশ্ব যাঁহাদের হস্তামলক, বিশ্ব-সাহিত্য যাঁহাদের নখ দর্পণে, কিন্তু যাঁহারা দেহে বাঙালি হইলেও মনে বাঙালি নহেন—তাঁহারা বাংলার যাহা কিছু নিজস্ব সেই সমস্তকেই অকিঞ্চিৎকর মনে করেন।······কুমুদরঞ্জনের কবিতার উপাদান, উপজীব্য—সম্পূর্ণভাবে বাংলার মাটি, জল, আকাশ, বাতাস, তরুলতা এবং খাঁটি বাঙালির ভাবনা-ধারণা ও সংস্কৃতি হইতে আহৃত।'

কুমুদরঞ্জন রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষ-পূর্তিতে নিখিল-ভারত বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের জোড়াসাঁকো প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে সাহিত্যশাখার উদ্বোধকের অভিভাষণেও নিজে বাঙালির সহৃদয় বন্দনা গান করেছেন, বলেছেন—'যাঁহারা বৃহত্তর ও মহত্তর বঙ্গের স্রষ্টা আপনারা তাঁহাদের যোগ্য বংশধর। আপনারা বাঙলার সংস্কৃতি ও বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক, যে প্রদেশে গিয়াছেন মর্যাদার আসন লাভ করিয়াছেন এবং সে স্থানকে নব নব গৌরব দান করিয়াছেন। আপনারা দণ্ডকারণ্যে নব ইন্দ্রপ্রস্থের ভিত পাতিতেছেন—গভীর আনন্দে ও আগ্রহে আপনাদিগকে বরণ করিয়া লইতেছি।

বাঙালি হায় যেথায় যাবে, বাঙলা তাহার সঙ্গে যায়
বৃন্দাবনের কাছেই তাহার নদীয়া যে দিন দাঁড়ায়।
যেথায় থাকুক নাইকো ক্ষতি,
সঙ্গে থাকেন হৈমবতী,
'কালিদহের' কাহিনী কয়—সিংহলের সে রাজসভায়।
থাক যে দেশে, থাক যে বেশে সপ্তসাগর লঙ্ঘি সে
কাশীদাস আর কৃত্তিবাসে পায় যে চিরসঙ্গী সে।
বাউল নাচে তাহার মনে,
হৃদয় গলে সংকীর্তনে,
চিন্তা তাহার নয়ন জলে গ্রামের পথে পথ হারায়।

বাঙালি কল্যাণকৃৎ হইয়াও অনেক দুর্ভোগ সহ্য করিয়াছেন ও করিতেছে। অনেকে বলেন বাঙালি কি মহাসমরে না মরিয়া সাতনলার ঘায়ে মরিবে? সব্যসাচী কি বৃহন্নলা হইয়াই থাকিবে? না, থাকিবে না—মহাভারতের কপিধ্বজ রথের সারথি তাঁহাদিগকে ভুলিবেন না।

কবিগুরু আপনাদের ভাষাকে ঐশ্বর্যশালিনী করিয়া জগৎবরেণ্য করিয়াছেন, আপনারা নিজ অব্যভিচারী প্রতিভায় ও মনীষায় সেই সুধাসত্রের অধিকারী হইবেন। আপনাদের সর্বাঙ্গীণ অভ্যুদয় আমি কামনা ও প্রার্থনা করি।'

তাঁর আন্তরিক ও নৈষ্ঠিক প্রণতি তিনি নিবেদন করেছেন যেমন প্রাচীন কবিকুলের প্রতি তেমনি পূর্বসূরী সদ্য-অতীত কবিজনের প্রতিও। কবি অক্ষয়-কুমার বড়ালের জন্মশতবর্ষ উৎসবের সভাপতির ভাষণেও বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষদে 'এষা'কাব্যকার ও বঙ্গের কবিজনের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করেন কুমুদরঞ্জন।

'যুগান্তর' পত্রিকায় ২০শে চৈত্র ১৩৬৬ সালে প্রকাশিত হয়—'কবি শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক সভাপতির ভাষণে বলেন যে, অক্ষয়কুমারের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব রাজোচিতভাবে হওয়া উচিত ছিল। দানসাগরের পরিবর্তে তাঁহার এই তিলকাঞ্চন শ্রাদ্ধ দেশবাসীর দৈন্য দুর্ভাগ্য ও উদাসীনতার পরিচায়ক।...তিনি আরও বলেন যে, বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষদ ধনী নহেন। তবু দেশবাসী যেসব কবিকে ভুলিতে বসিয়াছেন তাঁহারা তাঁহাদের কাব্যকীর্তিগুলি রক্ষা করিয়াছেন বা করিতেছেন। দেশের লোক এই প্রতিষ্ঠানের মূল্য ও গৌরব ভবিষ্যতে বুঝিবেন।...বড়াল কবির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া তিনি বলেন যে, অক্ষয়কুমার কত বড় কবি ছিলেন, তাহা যাঁহারা জানিতে ইচ্ছুক তাঁহারা স্বর্গীয় বিপিন পাল, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ মনীষীবৃন্দ তাঁহার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন। ১৩১১ সালে ১৬ই চৈত্র স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি অক্ষয়কুমার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা আজও তেমনি সত্য আছে। তবে অধিক উজ্জ্বল ও নানাদিকে তাৎপর্যপূর্ণ হইয়া বিরাজ করিতেছে। অক্ষয়কুমার সাধক ও ভক্ত। তাঁহার কবিতায় 'নারী' ভোগের উপাদান নহে। কবি নারীকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মানসপুষ্পে অর্ঘ দিয়াছেন। তাঁহার প্রেমের কবিতাগুলি শুচিতায় ভরপুর। তাঁহার কবিতা মানবিকতায় পূর্ণ। সমবেদনায় সমৃদ্ধ বলিয়াই তিনি বর্তমানকালের বহু হীনতা ও দীনতা অতিক্রম করিয়া অণু হইতে বিরাট আব্রহ্মস্তম্ভ পর্যন্ত সর্বত্র বঞ্চিতকে অনুভব করিয়াছেন। উপসংহারে

তিনি বলেন যে, যদি অক্ষয়কুমারকে ছোট করা হয়, তথাপি তিনি যাহা ছিলেন, তাহাই থাকিবেন। তাঁহার যশ ও কীর্তি অক্ষয়।'

স্বভাব কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের জন্মশতবর্ষ উৎসবও কুমুদরঞ্জনের সভাপতিত্বে বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষদ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। যুগান্তর ও আনন্দবাজার পত্রিকার ১১ই বৈশাখ ১৩৬২ সালের সংবাদ থেকে পাওয়া যাচ্ছে কবি বলেছিলেন—'নির্বাসিত, নির্যাতিত দেশপ্রাণ কবির আজ শতবার্ষিকী জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে সাহিত্যপরিষদ ভবনে, আর তাহাতে পৌরোহিত্য করিতেছেন একজন পল্লীকবি। মনে হয় স্বর্গ হইতে কবি ইহা দেখিয়া পরম কৌতুক উপভোগ করিতেছেন।···গোবিন্দচন্দ্রের কবিপ্রতিভা অনন্য সাধারণ। তিনি খাঁটি বাঙালি কবি, তাঁহার অমার্জিত কবিতারাজি 'খনির মণির মত ম্লানমনোহর'। এমন সহজ সুন্দর উপমা, এমন স্বতঃস্ফূর্ত অনুপ্রাস, ভাষার এমন লালিত্য, অনুভূতির এমন তীব্রতা ও নিবিড়তা সুদুর্লভ। কবির কুসুমবর্ষী লেখনী সময় সময় অনলবর্ষী হইত। বাঁশী সহসা অসি হইয়া দেখা দিত। গোবিন্দচন্দ্র একদিকে 'গোঁয়ার গোবিন্দ' ছিলেন। পরাধীন দেশে অতবড় গণতান্ত্রিক মন বিস্ময়ের বস্তু।···তিনি অন্যায় অত্যাচার ও অসত্যের সঙ্গে আপোষ করিতে শিখেন নাই। তাঁহার আত্মমর্যাদা জ্ঞান প্রবল ছিল। কবি অত্যাচারিত ও নিপীড়িতের বন্ধু ছিলেন। দেশ ও জাতির প্রত্যেক হিতকর আন্দোলনেই তিনি যোগ দিতেন।' কুমুদরঞ্জন আন্তরিক ভাষায় যা বলেছেন—তিনি তা বলেছেন কারণ প্রাচীন কবির প্রতি আপনার শ্রদ্ধার অন্তরকে সদা সজাগ রাখতেন।

১৩৬২ সালের ১৯শে ফাল্গুন কুমুদরঞ্জনের ৭৪তম জন্মদিনের সম্বর্ধনা সভা হয় কোগ্রামেই, সভাপতির ভাষণে ('সাহিত্যতীর্থ' পঞ্চম বার্ষিকীতে প্রকাশিত) তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় তাই যথার্থ ই বলেন—'কুমুদরঞ্জন অন্যতম শেষ প্রাচীন কবি। তাঁর কাছে আজ ক্ষমা চাইব, প্রার্থনা করব এই জন্যে যে, আমরা একদিন যে সম্বিত হারিয়েছিলাম তিনি যেন তা ক্ষমা করেন। বাংলার কাব্যপুরাণ বাংলার লোকেরা জানে না। তাই আজ দুর্বোধ্য সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে। কুমুদরঞ্জন কিন্তু প্রাচীনতায় আস্থাশীল এবং কুমুদরঞ্জনের কবিতা সহজ সুন্দর সুষমায় মণ্ডিত। তাঁর কবিতার নূতন রূপ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে দেশের গ্রামীন মানুষ ও প্রকৃতি প্রীতির মধ্যেই।'

স্বল্প, তুচ্ছ, সামান্য বস্তুকে অসামান্য দৃষ্টিতে দর্শন তাঁর কবিমানসের বিশেষ ভাবলোক। এবং এই অবিশেষকে বিশেষ উপমায় তুচ্ছাতীত মহিমাদানও

তাঁর বিচিত্র স্বাদের কবিতায় বিধৃত। তিনি সেই স্বল্প খ্যাতকে বিখ্যাত করেন উপমাদির উপযুক্ত প্রয়োগ কলায়। 'রিকৃশ' কবিতাটিকে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। তিনি বলছেন—

'টুং টুং ঘণ্টা, যান আগুয়ান
রাজপথ দিয়ে জোরে টানছে জোয়ান।'

কলকাতার পথে দেখে কবি বলছেন তাই—

'সন্ সন্ ধায় ট্রাম মোটরের দল,
রিকৃশ এ টুন্‌টুনি, তাহারা ঈগল।'

কবির দৃষ্টিতে ক্ষুদে যানটি টুন্‌টুনি, জেলেডিঙি কিন্তু মহাকাব্য নয় 'স্নিগ্ধ সে সুন্দর উদ্ভট শ্লোক'। সে কারণেই তিনি বলতে পারছেন—

'ভালোবাসি আমি তার ক্ষীণ শোভাটি
গ্রাণ্ডিফ্লোরার মাঝে দীন দোপাটি।'

কবির নান্দনিক দৃষ্টির পরিচয় 'ভূঁই চাঁপা' কবিতার শেষ ছত্রে আরো উজ্জ্বল। ভূঁই চাঁপাকে দেখে কবির মনে হল—

'তুলট পুঁথির মলাট ভেঙে শকুন্তলা বেরিয়ে এলো।'

সৌন্দর্যসন্ধানী কবিদৃষ্টি নিয়েই রোমান্টিক কবির হয় চিরন্তন রূপাভিসার। কাব্যিক রসজীবনের অনুভূতি-গভীর চৈতন্যস্থিত সৃজনীসুষমায় যে ললিতলীলার প্রকাশ তা মহৎ প্রেরণার অবশ্যই অংশভাগ। তা শুধু ভঙ্গি দিয়ে চোখ ভোলাবে না রসরূপ দিয়ে মন ভরাবে। বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল' কাব্যের ভাবতন্ময়তা বা রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতার উদ্দেশে মানসযাত্রার ঊর্ধ্বলোক বিহার কুমুদরঞ্জনের সহজিয়া সুরে বিধৃত। তাই তিনি বলতে পেরেছেন—

'ছোট যে হায় অনেক সময় বড়র দাবি দাবিয়ে চলে ;
রেখা টেনে ছোটর গতি, বড় যে জল গাবিয়ে চলে।
অতি বড়র তুচ্ছ যা তাই ভালোবাসি আমরা সবাই,
ভুলায় বড়র অট্টহাসি ছোটর কণা নয়ন-জলে।'

এবার কবির 'অজয়' গ্রন্থের এই 'ছোটর দাবি' কবিতার কথা ভাবা চলে। এখানে ভাবপ্রবন কবির চিত্তচৈতন্যে অতি ক্ষুদ্র বস্তুও মহামূল্যবান হয়। কারণ তাঁর কবিহৃদয় অতি সচেতন ও সূক্ষ্ম অনুভূতি প্রবন। কবি কবিতায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শময় পৃথিবীর চৈতন্যকে সকল কিছুর মধ্যেই দেখেছেন। বলা

যায় বাউলের ব্যাকুলতার সুরও কোনো কোনো কবিতায় স্পন্দিত হয়েছে। কুমুদরঞ্জনের কবিসত্তার এইটিই যথার্থ রসোপলব্ধির মহিমান্বিত রূপ।

কবির জীবন পল্লীগ্রামের শ্যামল তরুচ্ছায়ে লালায়িত। মাঠ মাটিকেই মাথায় তুলে নিয়েছেন, পথের ধুলাকে পদরজ বলে জেনেছেন। তাঁর কবিমানসের মধ্যেও এই জীবনদর্শন ফুটে উঠেছে। 'ভক্তির যুক্তি' কবিতার শেষে কৃষক প্রাণের সরল বিশ্বাসের মূলতত্ত্ব জেনে বলছেন—

'…ধর্মক্ষেত্র এই যে তোমার মাঠ,
নীরবে হেথায় তুমিই করেছ বুকের চণ্ডীপাঠ।'

পল্লীপ্রকৃতি ও গ্রাম্য কৃষকের চরিত্র বর্ণনা করেই মনে হয় তাঁর কবিপ্রাণ বড় পরিতৃপ্তি লাভ করে! 'গ্রামের পথে' কবিতায় প্রাণের নির্জনতম কক্ষের বাণী উচ্চারিত হয়েছে—

'ফিরে যদি জন্মাতে হয়, এই করুণা চাই
এই গ্রামেতেই দিয়ো দয়াল ফিরে আমার ঠাঁই।'

বা 'স্বর্ণসন্ধ্যা' গ্রন্থের 'যদি' কবিতাটিতে কুমুদরঞ্জন বলেছেন—

'সেইখানেতে ছড়িয়ে গেছি অনুরাগের ফাগ—
হয় ত আজও তরুলতায় মিলায় নি কো দাগ।'

পল্লীগ্রাম-প্রেমিক কবি তাই 'অজয়ের চর' কবিতায় বললেন—

'অজয়ের চর ভুলায় আমার মন—
দর্শনীয়ের পাই সেথা দরশন।
তীর্থের ফল সেই দেয় মোরে আনি,
আমি ত তারেই কন্যাকুমারী জানি,
সেই মোর সেতুবন্ধ রামেশ্বর।'

'পল্লীকবি' কবিতায় কুমুদরঞ্জন রবীন্দ্রনাথের মতোই 'যখন রব-না আমি' এই চিন্তায় লিখলেন—

'অজয়-পারে ওই যে ভাঙা দেয়াল আছে পড়ি,
শিউলি এবং শ্যামলতাতে করছে জড়াজড়ি—
বছর বিশেক আগে মনের অনুরাগে
থাকতো হোথায় পল্লীকবি অনেক দিবস ধরি।'

কুমুদরঞ্জন 'হয় তো' কবিতায় মহাকালের অনন্তের অজানা অভিসারের স্বপ্নে বলে ফেলেছেন আপন মনের সন্দেহের প্রসুপ্ত কথা—

'হয় তো আমার এ-পথে আর হবে নাকো আসা,
দু'ধারে যাই রোপণ ক'রে বুকের ভালোবাসা।'

কবিমর্মে প্রতিনিয়ত প্রীতিপ্রকাশ, প্রতিশ্বাসে নৈষ্ঠিকভাবে বুকের বীণায় অনুরণিত ভালোবাসার গীতিকা। কুমুদরঞ্জনের কাব্যভাবনায় ও জীবনসাধনায় মানবপ্রেমের মানস সঞ্চরণই বহু ব্যঞ্জনায় বিধৃত।

তাঁর জীবিত কালের প্রকাশিত মৌলিক কাব্যগ্রন্থের শেষ চয়নের মুখবন্ধে কবি জীবনযাত্রার শেষ খেয়ার গোধূলি তীরে পূরবী রাগিনী সঞ্চারিত ক'রে লিখেছেন—

'মেলা দেখা শেষ, পূরবীর সুরে সন্ধ্যা আসিছে ভাসি,
মরণের কাঁধে চেপে ফিরে যাই বাজাতে বাজাতে বাঁশী।'

'স্বর্ণসন্ধ্যা' গ্রন্থের এই কয় ছত্রে কবির অন্তিম ভাবনাটি সুন্দর ভাবে আভাসিত। কিন্তু কুমুদরঞ্জনের কাব্যচৈতন্যের মৌলভাবনায় বৈষ্ণবীয় রূপকল্পনা স্থায়ীভাব হিসেবে বর্তমান থাকে তাই শেষের চিন্তাচেতনায়ও বলে উঠেছেন মৃত্যুর স্কন্ধে চেপে ফিরে যাবেন বাঁশী বাজাতে বাজাতে। শান্তি সমাহিত অন্ধকারকে সুন্দর স্বরসুষমায় চিন্তা করেছেন। তাঁর কবিমানস দীর্ঘজীবন লাভ করেও বহু পূর্ব থেকেই পূরবীর সুর শুনতে অভ্যস্ত ক'রে নিচ্ছিলেন কারণ ১৩৫৫ সালের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে 'স্বর্ণসন্ধ্যা' এই নামকরণে গ্রন্থায়িত ক'রে উৎসর্গপত্রে লিখলেন—'আমার পরমারাধ্য স্বর্গবাসী জনক-জননীর শ্রীপাদপদ্মে অর্পিত হইল।' এবং 'স্বর্ণসন্ধ্যা' কবিতাটিতে লিখেছেন—

'সন্ধ্যা—জীবন-সন্ধ্যা আমার—স্বর্ণসন্ধ্যা হোক
রবির কিরণ মিলাবার আগে উঠুক চন্দ্রালোক।

...

প্রখর রৌদ্র বহেছি মাথায়, সহেছি ঝঞ্ঝা ঝড়,
কঠিন যাত্রা, কর মা আমার পরিণাম-সুন্দর।'

কুমুদরঞ্জনের চিঠিপত্র যাঁরা পেয়েছেন তাঁরা আন্তরিক হৃদয় মাধুর্য উপলব্ধি করেছেন। 'পুরানো চিঠির ফাইল' এই নামের একটি কবিতা এই প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি করছি যার মধ্যে তাঁর কাব্যচৈতন্যের সহজ রসবোধের নিপুণ চিত্র স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। তিনি লিখছেন—

১

'এটা বিয়ের নিমন্ত্রণের চিঠি মুছে গেছে আঁখরগুলো যত,
রঙটি রাঙা তেমনি আছে লেগে অতীত বিয়ের পাকচুণারই মতো।

২

এ যে বড়ই গরম গোছের চিঠি চেয়েছে কার সাতশো টাকা বাকি.
কাঠ্‌ঠোকরা কোথায় গেছে উড়ি নীরস শাখায় ঠোকর কটা রাখি।

৩

এ বটে এক সু-খবরের লিপি, পরীক্ষাতে প্রথম পাশের খবর ;
লাভের চেয়ে আনন্দটাই বেশি, কাঁকুড় ছোট বীজটা তাহার জবর।

৪

একি এ এক আদালতের সমন— মুড়কি সাথে বোলতা কেন হেরি ?
সাপ গিয়েছে খোলসখানা রাখি, ফুলে এ ছুঁচ মিশলো কেমন করি ?

৫

এ চিঠিটা লিখছে বাড়ির ছেলে ইস্টেশনে পাঠিয়ে দিতে গাড়ি—
ছেলের এখন বহুত ছেলেমেয়ে ঠাকুরদাদা, চিনতে তাঁরে পারি।

৬

এখানা এক আত্মীয়েরই চিঠি চেয়েছে হায় ত্রিশটি টাকা ধার ;
দেখছি তাহার শীর্ণ হাতের সহি, পাওয়ার কোনো খবর নাহি আর।

৭

কোনটি ছেঁড়া শোকের খবর এটি অতীত-ভোলা সুদূর বুকের ব্যথা ;
ছেলের গলায় সোনার হারের সাথে কেন রে এই বাঘের নখর গাঁথা ?'

ঊনিশ ও বিশের শতকে বাংলা কাব্যে গার্হস্থ্যচিত্র-অঙ্কনকলা এক বিশিষ্ট আঙ্গিকে পর্যবসিত হয়। কুমুদরঞ্জনও অনুরূপ গার্হস্থ্যচিত্র তাঁর বহু কবিতায় অঙ্কিত করেছেন। কিন্তু সেই খানেই তাঁর শেষ কথা হয়ে থাকে নি, তিনি কাব্যাত্মার গভীর রসের ব্যঞ্জনাকার তাই সব সময়েই মহৎ কাব্যিক পরিণতি দান করেছেন বক্তব্যে ও উপমায়।

'বিয়ের ফর্দ' কবিতায় এমনি ভাবের আর এক রচনাশৈলীর নিদর্শন পাওয়া যায়। সেখানে লিখছেন—'বাক্সে পেলাম আমার বাবার বাবার বিয়ের ফর্দখানা—' এবং শেষে লিখছেন—'নিত্‌বর হবার ইচ্ছা যে হয়, হাসিমুখে পাল্‌কী চ'ড়ে'।

কবি এই ধরণের লিখেছেন আর একটি কবিতা 'কখানা পুরানো রেকর্ড'। সেখানে বলছেন—

'সারানো হয়েছে পুরানো সে গ্রামোফোন,
খোকাখুকীদের নাই কোনো আর কাজ।
বাজাইছে বসি—করি বেশ আয়োজন
বহু পুরাতন রেকর্ড ক'খানা আজ।

...

মনে দোল দেয়, সহসা ফিরায়ে আনে
রঙিন বুকের রাঙানো আকাশ গোটা ;
দেখি নাই হেন হাসি-অশ্রুর বানে
শুষ্ক এমন মালঞ্চে ফুল ফোটা।'

কুমুদরঞ্জনের ব্যক্তিজীবন যেমন সহজ সরল ছিল তেমনি কাব্যচৈতন্যের জগতও ঋজু সুন্দর। আপন কাব্যভাবনার সামগ্রিক-লোকের গভীরে জীবনঘনিষ্ট বোধ ও বোধির স্পষ্টপ্রত্যক্ষ চেতনায় উদ্ভাসিত তাঁর চিন্তা পরিমণ্ডল। তাই শেষের দিকের গ্রন্থটি যেমন জনক-জননীকে উৎসর্গ করলেন তেমনি দুটি কবিতায় বাবা মায়ের শেষ পত্রস্মৃতি ছন্দায়িত করেছেন। কবি লিখছেন—'আমার অসুখের কথা শুনিয়া মাতাঠাকুরাণী এই চিঠিখানি লিখেন—২৭শে অগ্রহায়ণ শুক্রবার ১৩৪২ সাল উহা পাই—৬ই পৌষ বড়দিন তিনি স্বর্গারোহণ করেন।' 'মায়ের শেষ চিঠি' কবিতায় লিখেছেন—

'বুড়া খোকার তৃষিত এই মুখে মায়ের বুকের শেষ দুধের এ ধার,
শেষের কাজল জলভরা এই চোখে এ জনমে মিলবে না ত আর।'

এবং 'বাবার চিঠি' কবিতায় লিখলেন—

'চাইনে আমি জয়পত্র চাইনেক তায়দাদ্
বাবার চিঠি পেতে আবার হয় যে শুধু সাধ।'

কুমুদরঞ্জনের এই মনোভঙ্গি সাম্প্রতিক ভারত সরকার প্রদত্ত 'পদ্মশ্রী' প্রাপ্তি উপলক্ষে অভিনন্দন পত্রের উত্তরেও নানা জনকে এমনি কথাই বলেন। তিনি সকলের প্রীতিপ্রসন্ন মনটিকেই চান, সেটি তাঁর পরমপ্রাপ্তি বলে মনে করেন। তাই 'দগ্ধা' কবিতায় বলেছেন—'হে প্রভু কাজের দর্পণে কেন হৃদয় উঠে না ফুটি ?' হৃদয়ের সত্য প্রতিচ্ছবি কবিদৃষ্টিতে আবিষ্কার করার যে মহতী প্রাবল্য তাও বিভিন্ন কবিতায় কুমুদরঞ্জন প্রস্ফুটিত করেছেন। নবনীধর নামের এক সহপাঠীর স্মৃতিরেখার 'ব্যবধান' কবিতায় লিখছেন 'অভাব তাহার ভারী—দিতে হল পড়া ছাড়ি, সত্য সে ছিল ছাত্র প্রতিভাবান...দুর্ভাগ্যের ফলে

গোয়েন্দাদের দলে, পথে একদিন ঘুরিতে দেখিনু তাকে,...সেবার হরিদ্বারে... দেখি এক সাধু হায়...ও যে আমাদের সেই সে নবনীধর।' বহু কাহিনীমূলক কবিতাতে তিনি স্বল্প কথার বাঁধনে একটি হৃদয় মাধুর্যের ও ঔদার্যের পরিচয়-লিপি রচনা করেছেন। ছ'মাস বয়সের মা-মরা ছেলের অসুখে উদাসী পিতার চিত্ররেখা রচনা করেছেন 'রুগ্‌ণ ছেলে' কবিতায় যার মধ্যে পিতৃত্বের দায়িত্ব কথা ব্যক্ত করেছেন একটি সকরুণ ঘটনায়। বাৎসল্যরস প্রাধান্য পেল।

এ প্রসঙ্গে কবির 'কাপালিক' কবিতার বিষয়েও উল্লেখ করা চলে। যেখানে বলেছেন—

স্নেহ প্রেম প্রীতি হীন কর্কশ কঠিন কারাগার
পারে না হইতে কভু দেবতার বিলাস-আগার।
আপনার জননীরে জেনো বৎস পারে যে ভুলিতে
বিশ্বজননীর স্নেহ সে কখনো পারে না লভিতে।

ভূমি থেকেই ভূমায়, ভাণ্ড থেকেই ব্রহ্মাণ্ডে তাঁর বসতি। বিন্দুতে সিন্ধু দর্শনও হয়তো। ঘরকে পর ক'রে নয় ঘর নিয়েই পরও আপন হবে। আত্মতুষ্টি নিয়ে জগৎ তুষ্টিও। তাই 'বীথি' গ্রন্থের 'অনুরোধে' কবিতায় লিখেছেন—

'আমার লাগি যদি আমারে ভালোবাসো
জনমে জনমে সখা ত্যাজো না,
হৃদয় ফুল সম দিব হে তব পায়ে
আপনি বিকাইব আপনা।'

কুমুদরঞ্জনের কাব্যচৈতন্যের আর একটি দিক ঐতিহ্যচেতনা। তিনি 'সোমনাথ'কে ভারত সংস্কৃতির ভাবরূপ হিসেবে আপন ভাবনায় গ্রহণ ক'রে নানা দিক থেকে বিবেচনা ক'রে বহু কবিতা রচনা করেছিলেন।

১৩৬৮ সালের দৈনিক বসুমতীর শারদীয়া সংখ্যায় 'পূজার সাধ' কবিতায় লিখলেন—

'আমি চাহিনাক 'কুবের'-ভবনে কোজাগর রাতি গুজারি,
আমি হতে চাই শ্রীসোমনাথের দীনদরিদ্র পূজারী।'

প্রায় শতাধিক কবিতায় কুমুদরঞ্জন অন্তর প্রেরণার অনাবিল তাগিদে বিভিন্ন বোধের আলোকিত কণিকাবলী রচনা করেছেন সোমনাথের ভাবনায়। ঐতিহাসিক চেতনা যেমন তাঁর সদাসজাগ ছিল তেমনি ভারত সংস্কৃতির ক্রমবিকশিত এক ঐতিহ্যভাবনাও প্রবল অনুপ্রেরণার স্থল। 'মেগাস্থিনিসের

সোমনাথ দর্শন', 'হুয়েনশাঙ্‌-এর সোমনাথ দর্শন', 'আলবেরুণীর সোমনাথ-দর্শন', 'সোমনাথের পূজারী' প্রভৃতি শিরোনাম থেকেই তাঁর বিশেষ দৃষ্টিকোনের পরিচয়টুকু বিধৃত।

তিনি কোনোদিন কোনো বিশেষ ফরমায়েসী হয়ে রচনার কথা ভাবেন নি, তাঁর অন্তর প্রেরণায় কাব্যাঞ্জলি অর্পিত হয়েছে আবাল্য। তাই কবির অনুপ্রেরণার আকর ছোট ছোট বস্তু যা তিনি বাংলার প্রকৃতিঘেরা গ্রামাঞ্চলের জীবনে এবং পঠনপাঠনের দ্বারা আহৃত জ্ঞানলোকের মনীষায় উপলব্ধি করেছেন তারই প্রকাশ দেখা যায়। 'কথাসাহিত্য' কুমুদরঞ্জন সংখ্যায় এক পত্রে তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন—'কলেজ জীবনে প্রথমে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতাই আমাকে কবিতার প্রকৃত রূপ যেন দেখাইল।' ইংরাজি কবিতার প্রকৃতিচেতনা এই ভাবে প্রাচীন কবির ও রবীন্দ্র-কাব্যের সংরাগে কুমুদরঞ্জনের চেতনায় সঞ্চারিত হয়েছে।

কবির মানস গঠনে তাঁর পল্লীপ্রীতি, প্রবল প্রকৃতিচেতনা, ভারত সংস্কৃতিবোধ ও ঐতিহ্যাশ্রয়, সত্যমূল্যে স্থিত জীবনদর্শন ও উদার হৃদয়-ঐশ্বর্য বিশেষ সহায়তা করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে তাঁর সামগ্রিক কাব্যকলায় রবীন্দ্র-ভাবনাজগতের যে রূপৈশ্বর্য তার সঙ্গে ঐতিহ্যপুষ্ট ভারত সংস্কৃতির ধ্যানদৃষ্টি যুক্ত হয়ে পরিপূর্ণ রসমূর্তি পরিগ্রহ করেছে যা বিহারীলাল চক্রবর্তীর গীতিকবিতা-ধারার আত্মতন্ময়তার কাব্যধারাকে নতুন চেতনায় বিশেষ রসপুষ্টই করেছে বলা যায়। কিন্তু কুমুদরঞ্জনের এই আত্মতন্ময়তায় ভোগারতি নেই দেবারতিই প্রধান। পঞ্চেন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রদীপে নয় হৃদয়ানুভূতির গভীর অন্তর্লোকে তাঁর মাঙ্গলিকী।

'কবি লেখে কেমন ?' কবিতায় তাই ভক্তিভাবনার কবি কুমুদরঞ্জন দ্বিধাহীন চিত্তে অবলীলাক্রমে বলছেন—

'সাধক তার ইষ্টদেবের চরণতলে লুটায় যেমন।'

ভক্তবৈষ্ণবের পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন। আবার জীবন লালিত্যরসের তৃষ্ণাও কবিকুঞ্জে গুঞ্জরিত হয়। তখন বলছেন—

'মোদের হরি বংশীধারী, মোদের হরি মাখনচোরা,
যুগল রূপের উপাসী যে, পিপাসী যে রসের মোরা।'

'বৈষ্ণব' কবিতায় কুমুদরঞ্জন উপরের বক্তব্য যেমন স্থাপন করেছেন তেমনি 'শাক্ত' কবিতায় বলছেন—

'মা আমাদের দয়াময়ী, মা আমাদের সর্বনাশী,
ভালোবাসি আমরা মায়ের বরাভয় ও অট্টহাসি।'

শ্যাম ও শ্যামার সমান উপাসনা বাংলার শ্যামলমৃত্তিকায় অপূর্ব চেতনার ভাববন্যায় আপ্লুত করে বাঙালির সাধন-মানসে। সেই মানসিকতারই অনুকূল যাত্রী কবি কুমুদরঞ্জন। তাঁর ভক্তপ্রাণের আরতি তাই যেমন শ্যাম পেয়েছেন তেমনি শ্যামাও পেয়েছেন। 'বৈষ্ণব বন্দনা' কবিতায় বলছেন—'দেবতারে কর প্রেমের পুতুল, তুলনা যে নাহি তার।—গরবী নাগরী শ্যামের সোহাগে নিয়েছ গাগরী ভরি।' বৈষ্ণবপ্রাণ কবি কুমুদরঞ্জন নিজেকে লোচনদাসের পাঠের রক্ষী ভাবতেন কারণ লোচনদাসের পাঠ কোগ্রাম।

'হংস খেয়ারী' কবিতার শেষ স্তবকে তাই লিখেছেন—

'চণ্ডী-মায়ের 'সোনার কোগা' তার বুকে যে থাকে,
ভোরে উঠেই 'লোচনদেব'এর চরণধুলা মাখে।'

বহু কবিতায় গানে বৈষ্ণবপ্রেমরসের বন্দনা করেছেন এবং বৈষ্ণব কবিদেরও। মাতৃসাধক 'রামপ্রসাদ' নামক কবিতায় লিখলেন—'ভক্তি আর শক্তি এক, নহে ভিন্ন ভেদ, তুমিই দেখায়ে দিলে করিলে প্রচার।' 'আমাদের ভারত' কবিতায় তাই যথার্থ ভাবেই কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে—

'শ্যামের ভারত শ্যামার ভারত অসি-বাঁশীর দেশ;
মধুময় তার চরণরজ, মধুর পরিবেশ।'

লেখনী তরবারির চেয়ে শক্তিশালী এমন কথা শোনা গেছে। কিন্তু কবি সৌন্দর্য-রসবিহারী। তিনি সুরের মায়াবীতে ভ্রমণবিলাসী। তাই বাঁশীর মূল্য অধিক তাঁর কাছে। কুমুদরঞ্জন তাঁর 'বাঁশী' কবিতায় উদাত্ত কণ্ঠে বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে বলে উঠেছেন—'আমি বাঁশী, অসির চেয়ে দামী।'

'বন্যা' বা অনুরূপ তাঁর 'ঝঞ্ঝা' কবিতাটিও উল্লেখযোগ্য। দীপ্ত সুরে বলছেন—

'আমি ভালোবাসি দিগন্তব্যাপী বন্যার অভিযান;'...

বা

'ঝঞ্ঝা প্রলয়-ঝঞ্ঝা, দুর্নিবার,
অঙ্গে অঙ্গে ঘুরিছে ঘুর্ণি তার।'

বিপ্লবী যুগের বাংলা ও স্বাধীনতা-উত্তর বাংলার কবিমানসে অনেক ভাব-প্রবাহ প্রবাহিত হলেও মৌলভাবে কুমুদরঞ্জন ছিলেন শান্তরসের রসিক। কিন্তু তাঁর বক্তব্যের বলিষ্ঠতা ও ঋজুতা যে পরবর্তী যুগের বিশিষ্ট বিদ্রোহী কবি

নজরুলের মনে নতুন এক ভাবানুভূতির প্রেরণা দেয় তার উল্লেখ পাওয়া গেল 'কথাসাহিত্য' নজরুল সংখ্যায় একটি রচনায়। সেখানে লেখা হয়েছে— 'নজরুল যখন কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন, তখন একদিন কুমুদরঞ্জন তাঁকে দেখবার জন্য পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে দুপুরবেলায় ৩২ কলেজ ষ্ট্রীটে 'বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য সমিতি'র অফিসের সামনে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করেন। বোধ করি তাঁর মনে সংশয় ছিল ছেলেবেলার মাষ্টার মশাইকে নজরুল হয় তো ভুলে গিয়ে থাকবেন। অবশ্য কুমুদরঞ্জনের এই সংশয়কে মুছে নিশ্চিহ্ন ক'রে অপার আনন্দই দিয়েছিলেন নজরুল। পবিত্র বাবুর মুখের কথা শেষ হতে না হতে নজরুল খালিপায়েই ছুটে চলে গেলেন ফুটপাতে এবং মাষ্টারমশাইয়ের পায়ের ধুলা নিয়ে প্রণাম ক'রে সসম্মানে সমিতির অফিসে নিয়ে এলেন। গুরু-শিষ্যের এই মিলন উভয়েরই হৃদয়ের সুন্দর দিক উদ্‌ঘাটিত করে। আলাপ আলোচনার মধ্যে এক সময়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে নজরুল বললেন— 'সার, আমিও আপনার মতো পাগল।' তাঁর এ কথায় কুমুদরঞ্জনের দুচোখে স্নেহ ও বাৎসল্যের কোমল মাধুর্য ঝরেছিল।'

তাঁর শিক্ষকতা জীবনের গোড়ার দিকের ছাত্র নজরুল প্রসঙ্গে তাই তিনিও নজরুল সাহিত্য সম্মেলনের শুভেচ্ছাপত্রে লিখেছেন—'নজরুল সাহিত্যের যত আলোচনা হয় ততই মঙ্গল, সে সাহিত্য নূতন শক্তি সঞ্চার করিয়াছে।'

আত্মনিবেদিত চিত্ত কুমুদরঞ্জন 'কবির সুখ' কবিতায় লিখলেন—

'লিখি হিজিবিজি, কী পাই তাহাতে? বন্ধু, কহিব কিবা আর—
সেই সুখ পাই, রামধনু আঁকি উপজে যে সুখ বিধাতার।'

বাউলসাধনার পীঠভূমি বীরভূম ও বর্ধমানের প্রান্তদেশ। কুমুদরঞ্জন সেই রাঙামাটির দেশের মানুষ। তাঁর মনটিও ছিল তাই রাঙানো বাউলের রসে ও রূপে, যথার্থ ই তাঁর মানসিকতায় বাউলের সুরও অনুপ্রাণিত করেছে বারংবার। তিনি নানা ছন্দে সহজিয়া সাধনবাদের সরল বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন নানা প্রকৃতিতে। 'বাউল' কবিতায় বলছেন—

'বাউল আমি, আমিই রাজা—আমিই যুবরাজ রে।
'আঙরাখা' মোর সখের পোশাক অভিষেকের সাজ রে!'

এমনি ধারার আর একটি কবিতা 'গোপীযন্ত্র'। সেখানে ধ্বনিত করেছেন আর এক ভঙ্গিতে—

'সেতার আমি নই তা জানি, নইকো আমি সারঙ্গ।
তবু আমি বাজবো খানিক ক'রো না কেউ বারণ গো।'

কুমুদরঞ্জনের কবিমানস ব্যাখ্যায় কবিশেখর কালিদাস রায় যথার্থই বলেছেন—'এই কবির রচনায় বৈরাগ্যের সহজিয়া সুর ধ্বনিত।'

'প্রত্যাবর্তন' কবিতায় কুমুদরঞ্জন বলছেন—

'ফিরে এলাম তোমার কোলে, আবার এলাম ফিরে,
অভাগিনীর বেশে মাগো আকুল আঁখিনীরে। ...
বুকে ব্যাধের শায়ক ঢাকি এলো ফিরে তোমার পাখী
গোলাপ আজি কাঁটা হয়ে কাঁদাক জননীরে।'

আনন্দচৈতন্য যেমন বৈষ্ণব কবিপ্রাণে আছে, তেমনি বিরহ ও কারুণ্যঘন রসসৃষ্টিও প্রবল। 'মজুরের মমতা', 'মাঝির ব্যথা' প্রভৃতি কবিতাগুলির কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে।

সাম্প্রতিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিছু ব্যঙ্গকবিতাও তাঁর নানা সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত রয়েছে। স্বপ্নচারিতাই যে তাঁর মনের মৌল বিহার তা নয় তারই প্রমাণপত্ররূপে উক্ত কবিতাগুলি উল্লেখযোগ্য। 'সমকালীন শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গকবিতা'য় গ্রথিত তাঁর 'পর্তুগীজ' কবিতায় উদাত্ত কবিকণ্ঠ ধ্বনিত—

'গোয়াকে' দ্বিতীয় গয়া কি করিবে? সাঙ্গ করিতে শেষ লীলা
উহাই হবে কি পর্তুগালের পিণ্ডদানের প্রেতশিলা?'

সম্প্রতি কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের অপ্রকাশিত কবিতা 'শিথিলতা'য় ('কথা-সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত) আধুনিক যুগের বিশৃঙ্খল মানসিকতার বিষয়েও গভীর অনুভূতির ব্যঞ্জনা উপস্থাপিত হয়েছে। শান্তপ্রকৃতির গ্রামের পল্লীপ্রকৃতির প্রিয় কবিরও শান্তি কুঠিরে যন্ত্রণা উৎপাদন করেছে, কবি বলেছেন—

'শিথিলতা সে যে বিষলতা জানো নাকি?
যদু বংশের ধ্বংস এনো না ডাকি।
কোথা চলে যাবে অর্জুন সম বীর,
জাতিটা হইবে কেবল শিখণ্ডীর।'

কুমুদরঞ্জন মনোজিৎ বসুকে পত্রে লিখেছেন—'রবীন্দ্রনাথ একদিন বোধ হয় আদর করিয়াই কবি কুমুদরঞ্জন বলেন, তখন সবে কবিতা লিখিতেছি। ইহা আমার জীবনকে যেন রঞ্জিত করিয়া দেয়, মনে হইল তবে সত্য সত্যই কবি হইব।' কিন্তু তাই বলে চেষ্টাকৃত ভাবে কাব্যকর্মে নিযুক্ত হন নি, স্বতঃস্ফূর্ত

প্রেরণাতেই তাঁর কাব্যসৃষ্টি। উক্ত পত্রে তাই তিনি নিজেই বলেছেন যে, 'কবিতা আমি লিখিব বলিয়া লিখি না, লিখিবার জন্য নির্জনতার দরকার হয় না। সহস্র গোলের মধ্যে কবিতা লিখি। নদীতে বন্যা বা জোয়ার আসার মতো কবিতা লেখার সময় একটা মাঝে মাঝে আসে। আমি কবিতা গড়ি না। তাহারা রূপগন্ধহীন হইলেও ফুলের মতো ফোটে।' আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে, আপন প্রাণের আকুতি জড়িয়ে, আপন চেতনের পরাগে ভরিয়ে কবিতায় হয় পুষ্পিত প্রকাশ। তাই বলা যায় কুমুদরঞ্জনের কবিতাবলী তাঁর স্বভাবের স্বাভাবিক ফসল তাঁকে কবিতা গড়ে তুলতে হয় নি তা আপনা থেকেই ফুটে উঠেছে।

কুমুদরঞ্জন কিছু ব্যঙ্গকবিতা, কিছু স্বদেশীভাব-উদ্দীপক কবিতা এবং বহু শিশুদের নীতিমূলক কবিতা প্রভৃতিও লিখেছেন। তাঁর গানও স্বল্প হলেও এক সময় বেশ জনপ্রিয় ছিল। এই প্রসঙ্গে স্বয়ং কুমুদরঞ্জন 'রবীন্দ্র-স্নেহকণিকা' প্রবন্ধে 'সাহিত্যতীর্থ' রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী সংখ্যায় লিখেছেন—"রবীন্দ্রনাথ আমায় বলিলেন, 'ওহে তোমার গান যে আমার ওপরও চাপিয়েছে!'—আমি তো অবাক। ভাবিলাম কি বলিতেছেন তিনি। বলিলেন 'লোকে এখানে এসে বলছে, আমি 'ওরে মাঝি তরী হেথা বাঁধবো না কো আজকে সাঁঝে'—গানটি বেশ লিখেছি। তাঁরা ভাবছেন কবিতাটি আমার রচনা।' আমি শুনিয়া বলিলাম, 'ভালোই তো, নদী যদি সাগরে মিলবার সৌভাগ্য লাভ করে, তাতে আপনার বাধা দেওয়া কেন?' উত্তরে তিনি বলিলেন, 'আমি সকলকেই বলেছি যে আমার নয়, ওটি তোমার লেখা।' তখন তিনি পরিতৃপ্তির হাসি হাসিলেন।"

কুমুদরঞ্জনের গীতিকবিতা এক সময়ে বাংলার ঘরে ঘরে যে কত জনপ্রিয় ছিল তার পরিচয় যেমন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের উক্তিতে রয়েছে তেমনি বিগত যুগের প্রখ্যাতগায়িকা যাদুমণির একটি স্মৃতিচারণাতেও অধ্যাপক বিশ্বপতি চৌধুরীর মুখ থেকে শোনা যায়। তখন তিনি ছাত্র। "একদিন বিশ্বপতি চৌধুরী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। হাতে ছিল একটি কবিতার বই—কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের 'একতারা'। যাদুমণির সে দিন শরীর ভালো ছিল না, শুয়েছিলেন। কবিতার বই দেখে বললেন—'একটা কবিতা পড় শুনি।' ছাত্র বইটি খুলতেই বেরুল সেই পাতাটি—

মাঝি, ভিড়ায়ো না চলুক তরী নদীর মাঝে,
তরী এ ঘাটেতে বাঁধব নাকো আজকে সাঁঝে।

তিনি শেষ পর্যন্ত কবিতাটি পড়ে শোনালেন। পড়া শেষ হতে দেখেন—শ্রোত্রীর দুচোখ অশ্রুপূর্ণ, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, 'কি চমৎকার এই লোকটির প্রাণ? বলে বিছানা থেকে উঠে বসলেন—'সুর দাও তো বিশ্বপতি।'

তানপুরায় সুর ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গে যাদুমণি তন্ময় হয়ে গাইতে লাগলেন সাহানা সুরে—

ওই ঘাটে ওই বকুল গাছে,
জলটি যেথা ছুঁয়েই আছে,
এখনো ওই যে ঘাটেতে
পল্লীবালার কাঁকন বাজে।
তরী সেথা বাঁধব না কো আজকে
সাঁঝে।

ডুবছে রবি নীল গগনে,
যদিই আঁধার হয়ে এসে
তবু নদীর মাঝে মাঝে
তরী মোদের চলুক ভেসে।
এই গাঁয়ের ভাই নামটি শুনে,
প্রাণটি এমন করে কেনে,
ঘুম পাড়ানো কোন বেদনা
জেগে উঠে হৃদয় মাঝে;
তরী হেথা বাঁধব নাকো আজকে
সাঁঝে

মৌন সাঁঝের ম্লান মাধুরী
কতই ব্যথা আনছে ডেকে,
গ্রামের সাঁঝের দীপটি ছোট
বিষাদ ছবি দিচ্ছে এঁকে!
একটি গৃহ হেথায় কিনা
ছিল আমার বড়ই চেনা,
ছবিটি যার আজও আমার
হৃদয় কোণে সদাই রাজে।
তরী হেথা বাঁধব নাকো আজকে
সাঁঝে।

এই নদীরই এই ঘাটেতে
এমনি সাঁঝে আমার প্রিয়া,
যেত ছোট কলসিখানি
কোমল তাহার বক্ষে নিয়া।
উল্লাসে জল উথলে উঠি,
বক্ষে তাহার পড়ত লুটি,
পথের মাঝে আমায় দেখে
ঘোমটা দিত হর্ষে লাজে।
তরী হেথা বাঁধব নাকো আজকে
সাঁঝে।

ওই ঘাটে ওই গাছের পাশে,
দিয়েছি সেই স্বর্ণলতায়
আজকেও সেই চিতার পরে,
শিথিল বকুল পড়ছে ঝরে,
আজও মধুর মুখখানি তার

তটিনীর ওই শ্যামল কূলে,
আপন হাতে চিতায় তুলে।

দেয় যে বাধা সকল কাজে।
তরী হেথা বাঁধব নাকো আজকে
সাঁঝে।

(এখানে বলে রাখা যায় যে, কুমুদরঞ্জন কবিতারূপে রচনা করলেও গান হিসেবে এটির চলন হয়। যাদুমনি হয়ত আগে থেকেই জানতেন গানখানি। পরেও, প্রথম দুটি লাইন পরিবর্তিত হয়ে গ্রামোফোন রেকর্ডে গানটি অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করে। রেকর্ড হয় দুবার। একবার ইন্দুবালার কণ্ঠে গান এবং দ্বিতীয়ত নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদারের ক্ল্যারিওনেটে গানের সুর।)

যাদুমণি গানটি আগাগোড়া সাহানায় গেয়ে গেলেন অতি দরদ দিয়ে। কি করুণ, কি মর্মস্পর্শী তাঁর এই সুরের আবেশ।

তাঁর সুরের জগৎ ভাবের জগতের সঙ্গে, তাঁর আত্মা সুরের জগতের সঙ্গে এমন সূক্ষ্ম তন্ত্রীতে বাঁধা ছিল যে, একটি ভাবের আলোড়নেই যেন ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল। হৃদয়স্পর্শী এই কাব্যের আবেদনে জেগে উঠল তাঁর প্রাণের সুর। তাঁর সাহানা। তাঁর স্পর্শকাতর মন গানের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করলে।" [দিলীপ-কুমার মুখোপাধ্যায়ের 'আসরের গল্প', পৃঃ ২৪—২৬ দ্রষ্টব্য]

কবিহৃদয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতির কোমল অনুরণন গীতিকবিতার ছন্দে, ভাষায়, ভাবে ও ব্যঞ্জনায় হয় রূপময় প্রকাশ। সেই সামান্য ক্ষণের একটি অনুচিন্তা, একটি ক্ষনিক অনুভব নিয়েই গানের বাণী চয়ন। এবং সেইখানেই তার কাব্যরূপ। সামান্যের ভিয়েনেই অসামান্যের বিভূতি। একটি বিশেষ সময়ের মর্জি বা মেজাজে, একটি বিশেষ ভাবের প্রকাশে বিশেষভাবে একটি ভাষাছন্দের আশ্রয়ে যে রসমূর্তি কবির মানসলোকে সঞ্চারিত হয় তার সহজ সুন্দর বাণীরূপেই সার্থক গীতিকবিতার জন্ম। কুমুদরঞ্জনের হৃদয় সঞ্জাত কাব্যচৈতন্যে ছিল সেই স্বভাব অনুভবের গভীরতা যেখানে প্রাণপ্রাচুর্যের মহৎ আর্তি শাশ্বত মহিমায় উদ্ভাসিত হয়। এই মহৎ-আর্তিই তাঁর কবিসত্ত্বাকে সহজ সুন্দর গীতি-কবিতা রচনায় আনুকূল্য করেছে স্বভাব ধর্মে এবং জীবনচর্যায়।

কুমুদরঞ্জনের কবিমানস ভাবের নিবিড় নিষ্ঠায় অন্তরের গভীর তন্ত্রীতে

অনুরণন ধ্বনিত করে তুলে ছিল তাই সংগীতের সুরসংযোগে তার মধ্যে আরো অপূর্ব রসব্যঞ্জনার রূপায়ণ। গীতিকবিতার স্বভাব ধর্মের মৌল বৈশিষ্ট্য নিয়ে তাঁর কবিতা তাই উৎকৃষ্ট ও আদর্শ স্থানীয় হিসেবে সুরকারদের কাছে যেমন আদরণীয় শ্রোতার কাছেও তেমনি সহজ রসসঞ্চারণে শ্রবণীয় এবং বরণীয়। তিনি যদি শুধু গান রচনাই করতেন তা হলেও তাঁর আসন রবীন্দ্র-পরবর্তীগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হয়েই থাকে। নজরুলের সঙ্গে তাঁর সংগীত রেকর্ড হওয়ার বিষয়ে কিছু পত্রালাপ হয়। তার মধ্যে একটি পত্র পাওয়া যায় যা 'কথা-সাহিত্য' কুমুদরঞ্জন সম্বর্ধনা সংখ্যায় প্রকাশিত। সেই পত্রটি এখানে সম্পূর্ণ প্রকাশ করা হল। পত্রটি এই—

৫৩জি, হরি ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

২৮, ১০, '৩৭

শ্রীচরণারবিন্দেষু,

প্রণাম-শতকোটি অন্তে নিবেদন : বহু পূর্বে আপনার এক আশীর্বাদী পত্র পেয়েছিলাম। আপনার "অধরে নেমেছে মৃত্যু-কালিমা" শীর্ষক গানটির কথাগুলি ও তার সাথে অন্য একটি গান (যা ওর জোড়া হতে পারে) যদি অনুগ্রহ করে পাঠিয়ে দেন, তা হলে বিশেষ বাধিত হব। শ্রীমতী ইন্দুবালা ঐ গান দুটী গাইতে চান। আপনার প্রেরিত গান দুটী পেলেই রেকর্ড করা হবে। গ্রামোফোন কোম্পানী আপনাকে প্রত্যেক রেকর্ডে শতকরা আড়াই টাকা হিসাবে রয়্যালটী দিতে চান—এক সঙ্গে টাকা নেওয়ার চেয়ে এতে বেশী লাভ হবে। গ্রামোফোন কোম্পানী আপনার গান পেলে ঐ সর্ত অনুসারে লিখিত এগ্রিমেণ্ট দেবে। যত শীঘ্র পারেন, গান দুটী পাঠিয়ে দেবেন।

৺বিজয়ার প্রণাম নেবেন। আশা করি কুশলে আছেন। নিবেদনমিতি

প্রণত

নজ্‌রুল

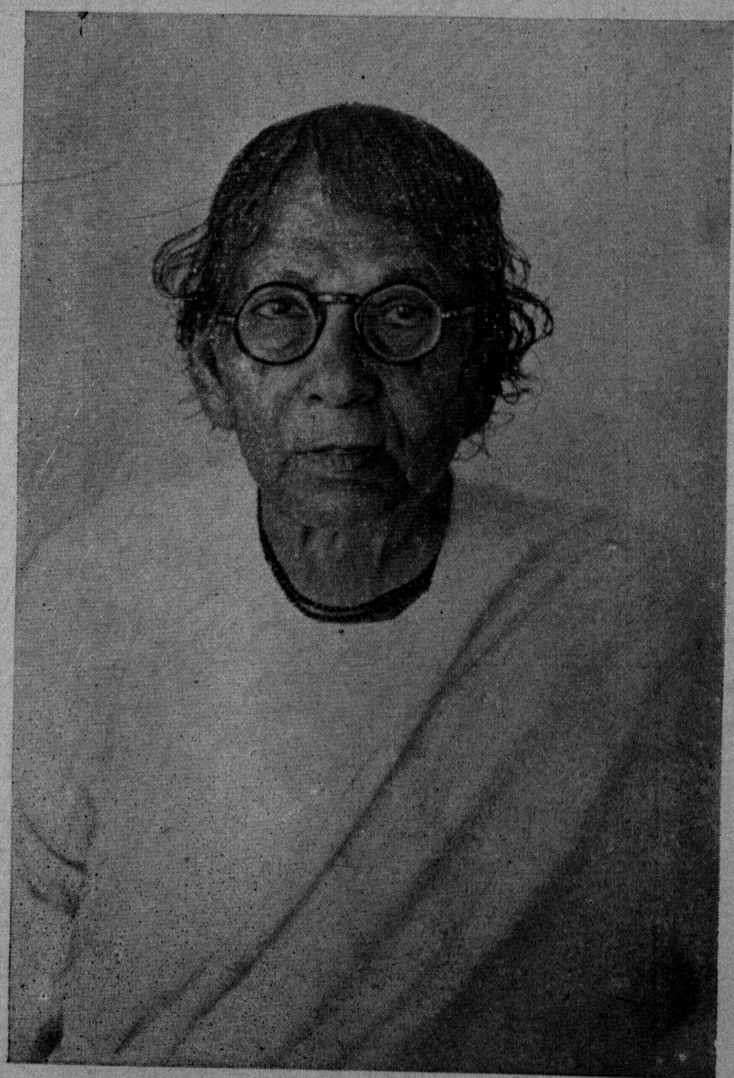
চর্যাপদ থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাংলা গানের বিচিত্র স্রোতে বহু গীতিকার জন্মেছেন এবং তাঁর পরবর্তীও গীতিকবি অনেকেই রয়েছেন। কুমুদরঞ্জনও গীতিকার। প্রসঙ্গতঃ কুমুদরঞ্জনের কতকগুলি গানের প্রথম কলির উল্লেখ করা চলে—'এসো গোটা এ বাগান আলো করা ফুল অনিমেষ পথ চাওয়া' (এসো), 'মোরা ভকত মহৎ পদরেণু পিয়াসী' (প্রণতি), 'আমার গ্রামের পথে আমার

ঘুরে বেড়ায় মন' (গ্রামের পথে), 'চোখ ফেটে মোর জল যে আসে হৃদয় ছোটে সুন্দর পানে' (বিদেশে), 'ঝাপসা হয়ে আসছে ক্রমে সেই আঁখি, তোর সেই আঁখি' (সেই আঁখি), 'নাইকো দেরি ছাড়বে তরী আঁখির পলকে' (দূরের যাত্রী), 'স্বপ্ন আমার নরক ওগো, স্বপ্ন আমার স্বর্গ' (স্বপ্ন), 'সবল পক্ষ ভেঙে দিলে যদি কেড়ে নিলে মোর কাকলি' (আশা ভঙ্গে), 'হঠাৎ ধরার বক্ষ ভেদী কে গো তুমি নয়ন মেল' (ভুঁই চাপা), 'চৌদিকে আজ ফুল ফুটেছে যেথায় ফিরাই দৃষ্টি' (উদ্যানে), 'আয়রে অলি, আয়রে অলি' (অলির নিমন্ত্রণ) প্রভৃতি।

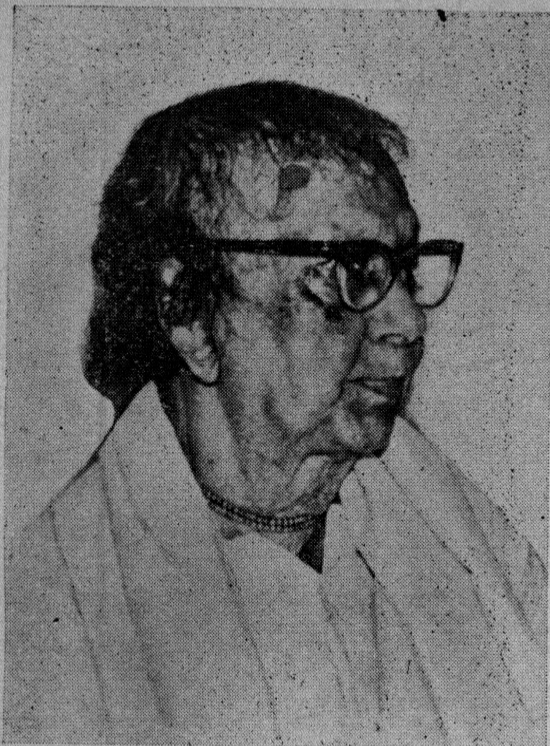
কুমুদরঞ্জন 'শতদল' নামে একটি কবিতা পুস্তিকা প্রকাশ করেন, সেই গ্রন্থ পাঠে রবীন্দ্রনাথ যে কথা লিখেছিলেন সেটির উল্লেখ করাই যথার্থ হবে বলেই পরিশেষে মনে করি। তিনি লিখেছেন—'আপনার শতদল পড়িয়া আনন্দিত হইলাম। ইহার ছোট ছোট কবিতাগুলি মৌচাকের ছোট ছোট কক্ষের মতো রসপূর্ণ হইয়াছে। কখনো কখনো মৌমাছির হুলেরও পরিচয় পাওয়া যায়।' পরে রবীন্দ্রনাথের অভিমত বিষয়ে কবি কুমুদরঞ্জন আবারো উল্লেখ করে 'রবীন্দ্র-স্নেহ কণিকা' প্রবন্ধে বলেছেন রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব উক্তিটি—'মাসিক পত্রে আপনার যে-কোনো কবিতা পড়িয়াছি তাহাতে বিশেষ আনন্দ পাইয়াছি। আপনার কবিতা আমাদের বঙ্গ সাহিত্যে অম্লান শোভায় বিরাজ করিবে।'

রবীন্দ্রনাথের এই আশীর্বাদবাণী শাশ্বত সত্য হোক।

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

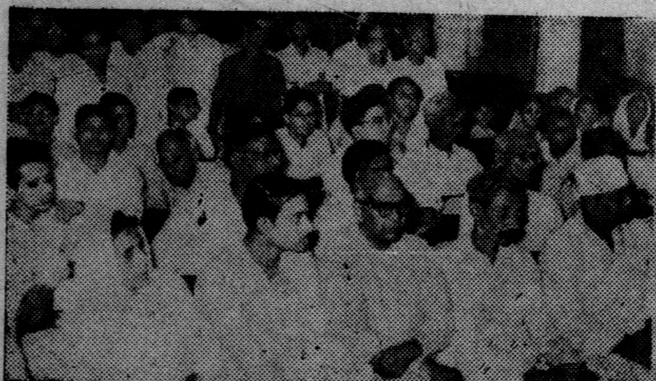


কুমুদরঞ্জন মল্লিক





অজয় নদীর তীরে কোগ্রামে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, রমেন্দ্রনাথ মল্লিক গ্রামবাসীসহ ১৯শে ফাল্গুন ১৩৬২ ভোরে





কবি অক্ষয়কুমার বড়াল জন্মশতবার্ষিকী বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ভবনে ভাষণ পাঠরত কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক। উপবিষ্ট জ্যোতির্ময়ী দেবী, রমেন্দ্রনাথ মল্লিক, কালীকিংকর সেনগুপ্ত, শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, হেমেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ



কোগ্রামে ১৯শে ফাল্গুন ১৩৬২ সাহিত্যতীর্থ প্রদত্ত সম্বর্ধনার পূর্বে উৎসবপতি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মাল্যদানের পর কুমুদরঞ্জনকে প্রণামরত

সাহিত্যতীর্থ দ্বিতীয় বার্ষিক কবিসম্মেলনে গোপাল ভৌমিক, হেমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন বসু, কবিতাপাঠরতা কবিতা সিংহ, যতীন্দ্র সেন, কুমারেশ ঘোষ, নরেন্দ্র দেব, মৃত্যুঞ্জয় মাইতি, রমেন্দ্রনাথ মল্লিক



সাহিত্যতীর্থ দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনের প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটনান্তে সমবেত তীর্থপতি কুমুদরঞ্জ
মল্লিকসহ মৃত্যুঞ্জয় মাইতি, কুমারেশ ঘোষ, অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, বাণী রায়, সজনীকান্ত দা
রমেন্দ্রনাথ মল্লিক, জগদীশ ভট্টাচার্য, রথীন্দ্রনাথ রায়

সাহিত্যতীর্থ দ্বিতীয় বার্ষিক কবিসম্মেলনের পর মল্লিকবাড়ির বৈঠকখানায় কবি কুমুদরঞ্জনসহ প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণ ধর, পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য, দিনেশ দাস, গোপাল ভৌমিক, রমেন্দ্রনাথ মল্লিক, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন বসু, অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, অঞ্জনকুমার দত্ত, রেবতীভূষণ ঘোষ, শান্তশীল দাস, কৌশিক বসু, কল্যাণ বসু। পশ্চাতে বীরেন্দ্র মল্লিক, মোহিত রায়, দুর্গাদাস সরকার, আশুতোষ লাহা, শরদিন্দু ঘোষ, শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়, কুমারেশ ঘোষ, মৃত্যুঞ্জয় মাইতি, অরুণ গোস্বামী, যতীন মল্লিক, রমেশ মজুমদার, সৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ



কোগ্রামে কুমুদরঞ্জন মল্লিকের ৭৪তম জন্মজয়ন্তী সম্বর্ধনা। উপবিষ্ট তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, কুমারেশ ঘোষ। দাঁড়িয়ে মৃত্যুঞ্জয় মাইতি, রমেন্দ্রনাথ মল্লিক, সৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোৎস্নানাথ মল্লিক, হেমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্যরা।

কোগ্রামে কুমুদরঞ্জনের ৭৬তম জন্মদিনে কবি ও কবিজায়াসহ সমবেত উদ্যোগতাবৃন্দ। চিত্রে দেখা যাচ্ছে সতীন্দ্রনাথ লাহা, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, রমেন্দ্রনাথ মল্লিক, কুমারেশ ঘোষ প্রমুখ অনেকেই

পত্রাবলী সাহিত্যতীর্থে রমেন্দ্রনাথ মল্লিককে লেখা

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

১) লেফাফাপত্র

শ্রীহরি শরণং

কোগ্রাম
নূতনহাট পোঃ
বর্দ্ধমান ২৮।১০।৫৪ [ইং]

প্রিয়বরেষু

আপনার পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। আপনারা শ্রীযুক্ত প্রাণতোষ[১] বাবুকে কেন্দ্র করিয়া একটী সাহিত্যের চক্রতীর্থ করিতেছেন ইহা বড়ই আশার কথা। আপনাদের প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হউক। শ্রীমান কল্যাণাক্ষ ও তাঁহার পিতা করুণাক্ষবাবুকে[২] খুবই ভাল লাগলো, দেখে উল্লসিত হইলাম। আপনাদের সাহিত্যতীর্থ সত্যকারের তীর্থই হউক।

যদি শরীর ভাল থাকে নিশ্চয়ই আপনাদের সম্মেলনে যাইব। আশা করি আপনার সব কুশল। ইতি

স্নেহধন্য
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

২) পোষ্টকার্ড

শ্রীহরি শরণং

কোগ্রাম
নূতনহাট পোঃ
বর্দ্ধমান ১০।২।৫৫ [ইং]

প্রিয়বরেষু

কবিবর করুণানিধান[৩] দাদার পরলোক গমনের সংবাদে আত্মীয় বিয়োগ বেদনা অনুভব করিতেছি। তিনি অসুখে ভুগিতেছিলেন, কষ্টও বহু পাইয়াছেন, তবু তিনি ছিলেন সদানন্দ পুরুষ। এক প্রথম শ্রেণীর শিল্পী কবি, তাঁর প্রতিভার প্রতি আপনারা শ্রদ্ধাশীল কিন্তু আধুনিক অনেকেই তাঁহার কবিতা পড়েন নাই এবং তাঁহারা তাঁকে মর্য্যাদা দেন নাই। অমন প্রাণখোলা কবি বিরল। তাঁর আশীর্ব্বাদ লাভ করুন। আপনার সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল কামনা করি। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১ প্রাণতোষ ঘটক। সম্পাদক 'মাসিক বসুমতী'

২ শ্রীকরুণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়

৩ করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

৩) পোষ্টকার্ড [১৩. ৩. ৫৫]

শ্রীহরি শরণং　　　　　　　　　　কোগ্রাম
২৮।১১।৬১

প্রিয়বরেষু

চিঠি পাইলাম, যদি বিশেষ বাধা না ঘটে তাহা হইলে, ১লা প্রাতে কলিকাতায় আমাদের বাসায় যাইব। 9 B, Mahendra Sircar Street. Cal.-12 সেখান হইতে সন্ধ্যায় আপনাদের ওখানে যাইব। একটী লোক উক্ত বাসা হইতে আমাকে লইয়া যাইবার জন্য সন্ধ্যায় পাঠাইবেন। ইতি

স্নেহধন্য
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

এই পত্রে শ্রীমান কল্যাণাক্ষ[১] আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। তোমাদের সঙ্গে মিলিতে আমি আনন্দই উপভোগ করি। যদি শরীর ভাল থাকে এবং কোন বিশেষ বাধা না উপস্থিত হয়, ১লা প্রাতে কলিকাতায় আমাদের বাসায় যাইব, সেখান হইতে তুমি আসিয়া লইয়া যাইবে। আশা করি সব কুশল। শ্রীভগবানের নিকট তোমাদের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি কামনা করি। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

৪) লেফাফাপত্র [২৩. ৩. ৫৫]

শ্রীহরি শরণং　　　　　　　　　　কোগ্রাম

শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ মল্লিক　　　　　　নূতনহাট পোঃ
সমীপেষু,　　　　　　বর্দ্ধমান ৮।১২।৬১
সাহিত্যতীর্থ, ৬৭ পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রিয়বরেষু

আপনার পত্র পাইয়া আহ্লাদিত হইলাম, কবিবরক রুণানিধান[২] আপনাদের সাহিত্যতীর্থের তীর্থপতি ছিলেন, তাঁহার পরলোক গমনে আমাকে তাঁহার শূন্য আসনে আপনারা বসিতে অনুরোধ করিতেছেন ইহা আমার পক্ষে খুবই গৌরবের কথা, আমি তাঁহার শ্রীপদে প্রণাম জানাইয়া, আমার দীনতা ও অযোগ্যতার কথা স্মরণ করিয়াও উহাতে সম্মত হইলাম। যেন তাঁহার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারি ইহাই শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি। ইতি

স্নেহধন্য
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১ শ্রীকল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়　　২ করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীহরি শরণং　　　　　　　　　　　　　　　　　　　কোগ্রাম
নূতনহাট পোঃ
বর্দ্ধমান ৮।১২।৬১

প্রিয়বরেষু,

আপনার পত্রে সমস্ত অবগত হইলাম, আমি সাধারণত সংক্রান্তি ও ১লা উভয় দিনই গ্রামে থাকি। কোথাও যাই না। শ্রীমান সজনীকান্ত[১] কিম্বা শ্রীমান জগদীশ ভট্টাচার্য্য আমার কবিতা সভাস্থলে পড়িলে চলিবে না কি? সজনীকান্ত কিম্বা কবিশেখর কালিদাস[২] সেদিন সভায় সভাপতিত্ব করিলে হইবে না কি? যদি নিতান্তই যাইতে হয় যাইব। তবে যদি না যাইতে হয় তাহা হইলে আমার পক্ষে সুবিধা হয়।

আমি করুণাদাদার শূন্য আসনে তীর্থপতি পদে অতি সঙ্কোচের সহিত বসিতেছি। তাঁহার সহিত আমার তুলনা হয় না। এক বয়স ছাড়া আমি অন্যসব বিষয়ে অন্যান্য কবি অপেক্ষা ছোট।

আমার ভালবাসা জানিবেন। ইতি　　　　　　　　　　　　স্নেহধন্য
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

৫) পোষ্টকার্ড

শ্রীহরি শরণং　　　　　　　　　　　　　　　　　　　কোগ্রাম
২।৪।৫৫ [ইং]

প্রিয়বরেষু,

কবি সম্মেলনে কবি শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা এম. এ. প্রবাসী আফিস ১২০-২ অপার সার্কুলার রোড কলিকাতা নিমন্ত্রণ করিয়াছেন কি? যদি না করিয়া থাকেন করিলে সুখী হইব। কালিদাস, সজনীকান্ত সাবিত্রীপ্রসন্ন[৩] তারাশঙ্কর[৪] অপূর্ব্ব[৫] প্রভৃতিকে বোধ হয় আগেই করিয়াছেন।

আশা করি আপনাদের সব কুশল। ইতি　　　　　　　　　　স্নেহধন্য
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

৬) লেফাফাপত্র [১৯. ৪. ৫৫]

শ্রীহরি শরণং　　　　　　　　　　　　　　　　　　　কোগ্রাম
নূতনহাট পোঃ
বর্দ্ধমান ৪।১।৬২

প্রিয়বরেষু

রমেন্দ্র আমি কল্য বৈকালে বাড়ী পঁহুছিয়াছি। "স্বাধীনচেতা বাগ্মী

১ সজনীকান্ত দাস　২ শ্রীকালিদাস রায়　৩ সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
৪ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়　৫ অপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

যদুলাল মল্লিকের জীবনকথা” খুব আগ্রহের সহিত পড়িলাম। এই পুস্তিকা-খানি[১] সুন্দরভাবে সংকলিত হইয়াছে, অল্প পরিসরে বহু জ্ঞাতব্য জিনিষে উহা পূর্ণ, আমার খুব ভাল লাগিয়াছে—তখনকার দিনের একটী মনোজ্ঞ চিত্র ইহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এরূপ পুস্তিকা সকলেরই পাঠ করা উচিত। ছাত্রদের সাহিত্য পুস্তকে এই সব জীবনীর স্থান পাওয়া উচিত। পরমহংস দেবের প্রসঙ্গও বড় ভাল লাগিল।

তোমার কাব্যকাকলি[২] এখনো পড়িতে আরম্ভ করি নাই ২/১ দিনের মধ্যেই পড়িয়া ফেলিব এবং অভিমত জানাইব। তোমার উৎসব ভালই হইয়াছে। এত নবীন প্রবীণ কবিকে একত্র সমাবেশ করা সহজ কৃতিত্বের কথা নহে, তোমার সূচনা খুবই আশাপ্রদ। এবার, জগদীশ ভট্টাচার্য এম. এ. প্রফেসার বঙ্গবাসী কলেজ ও (ইউনিভারসিটি সেনেটের সভ্য) ডক্টর শ্রীশিব-প্রসাদ ভট্টাচার্য্য অধ্যাপক বঙ্গবাসী কলেজ, শান্তশীল দাশ ৯৮ সাউথ সিঁথি রোড শ্রীযুক্তা ক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী, শ্রীমতী পুষ্প দেবী ১নং ডাঃ শ্যামদাস রো, প্রভৃতিকে তোমাদের তীর্থের সভ্য হইতে অনুরোধ করিবে। আমি বোধ হয় আগামী শনিবার কলিকাতা যাইতে পারি। কবিবর গোবিন্দচন্দ্র দাসের শতবার্ষিকী উৎসবে। সুবিধা হইলে দেখা করিবে। তুমি বলিয়া সম্বোধন করিতেছি ইহাতে দোষ লইবে না। ‘আপনার’ কথাটা একটু পর পর লাগে বিশেষতঃ আমাদের পল্লীবাসীর কাছে। তুমি দীর্ঘজীবী হও, উন্নতি লাভ কর। বিখ্যাত বংশের সুবিখ্যাত সন্তান হও। ইতি শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

পুঃ—করঞ্জাক্ষবাবুর উদারতা বিনয় ও মহত্ব আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে কল্যাণঙ্ককেও আমার কথা বলিবে। ইতি শ্রীকুমুদরঞ্জন

৭) লেফাফাপত্র [২২. ৪. ৫৫]

শ্রীহরি শরণং

কোগ্রাম
নূতনহাট পোঃ
বর্দ্ধমান ৬।১।৬২

প্রিয়বরেষু,

আগে চিঠি দিয়েছি, বোধ হয় পেয়েছ। তোমার বই পড়ে শেষ করলাম।

তোমার কাব্যকাকলিতে ভবিষ্যতের কুহুরব লুকিয়ে আছে। তোমার কমল কালকার এখনো ঘুম ভাঙেনি চোক মাজ্‌ছে। তোমার কাব্যজীবন সার্থক ও সুন্দর হবে। ইতি শুভাকাঙ্ক্ষী

কবি শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক
কলিকাতা

১ শ্রীরাসবিহারী মল্লিক প্রণীত ২ কবিতাগ্রন্থ

৮) লেফাফাপত্র [২৯. ৪. ৫৫]

শ্রীহরি শরণং

কোগ্রাম
নূতনহাট পোঃ
বর্দ্ধমান ১৫।১।৬২

প্রিয়বরেষু,

তোমার চিঠি পেয়ে আনন্দিত হইলাম, তোমাকে দেখে সুখী হই। সাহিত্যতীর্থকে তুমি এমন একটী প্রতিষ্ঠানে দাঁড় করাতে পারবে যাতে আধুনিক ও প্রাচীন কবি ও সাহিত্যিকগণ একত্র মিলিতে পারিবেন। কলিকাতা ও মফঃস্বলে কোনো সভাতেই এত সংখ্যক নবীন ও প্রবীণের সমাবেশ দেখি নাই। তোমরা বাছিয়াই সভ্য করিবে, তবে উদীয়মান প্রতিভাবান লেখকদিগকে লইবে, লইয়াছও দেখিলাম। ভারতবর্ষের সম্পাদক ও অন্যান্য সম্পাদককে সাহিত্যতীর্থে লইবে কিনা চিন্তা করিবে। কার্য্যকরী সমিতিতে। উহারা থাকিলে তোমাদের প্রচার কার্য্যে সুবিধা হইবে মনে হয়।

আমার জন্ম ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি, উহাতে কিছু নাই কিন্তু তোমরা সে সময় এখানে এলে সুখী হবো। এখানে তীর্থস্থানগুলি দেখিয়া যাইবে।

মধ্যে মধ্যে কুশল সংবাদ দিবে। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

৯) আন্তর্দেশীপত্র [১৪. ৫. ৫৫]

শ্রীহরি শরণং

কোগ্রাম
২৯।১।৬২

প্রিয়বরেষু,

তোমার চিঠি পেয়ে খুব আহ্লাদিত হইলাম। কয়দিন বাড়ী ছিলাম না। সিউড়ি গিয়েছিলাম। কাল ফিরিছি। শ্রীযুক্ত প্রবোধেন্দুবাবু[১] খুব পণ্ডিত ও গুণী লোক, তাঁর লেখা খুব ভাল লাগে। বোধহয় তিনি রূপশিল্পীও বটেন তাঁর আঁকা একখানি চিত্র যেন দেখেছি মনে হয়। তাঁকে ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্র জয়ন্তী সভায় সভাপতি পাওয়া খুবই তোমাদের সৌভাগ্য। ঐ সব গুণী ব্যক্তিকেই আহ্বান করিতে হয়। বলিবার প্রকৃত অধিকারীই তাঁহারা। জয়ন্তীর অর্থ[২] খুব চমৎকার লাগলো অথচ উহাই প্রকৃত অর্থ।

তোমাদের কথা প্রায়ই মনে হয়। কল্যাণাক্ষ কি করিতেছেন। তাঁর বাবার কথা আমার প্রায়ই মনে হয়, অমন নিরভিমান মহৎ ব্যক্তি কমই দেখিতে পাই। আশা করি তোমাদের সব কুশল। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১ প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর   ২ সাহিত্যতীর্থ ১৩৬৫ পঞ্চম বার্ষিকীতে প্রকাশিত

১০) পোষ্টকার্ড

শ্রীহরি শরণং কোগ্রাম

২২।৬।৫৫ [ইং]

প্রিয়বরেষু,

রমেন্দ্র তোমার চিঠি পেয়ে আনন্দিত হলাম। আমি Drama Committee র সভ্য বটি। জেলায় ঐ বিষয়ে উপযুক্ত Party কে উৎসাহ ও সাহায্য দেওয়া হইবে। প্রতি মহকুমা শাসক মহাশয়কে Party গুলির নাম পাঠাইবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তবে fund এখন খুবই কম। সরকার আবশ্যক হইলে আরও সাহায্য করিবেন। মনোনীত party কে অভিনয় করিবার সুযোগ সুবিধা দিয়া জেলায় আনা হইবে এবং তাঁহাদের অভিনয় বিচার করিবেন, কলিকাতার বিখ্যাত অভিনেতাগণ।

তোমাদের কুশল সংবাদে সুখী হইলাম মধ্যে মধ্যে সংবাদ লইবে শ্রীভগবান তোমার মঙ্গল করুন। ইতি আঃ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১১) লেফাফাপত্র

শ্রীহরি শরণং কোগ্রাম

নূতনহাট পোঃ

বর্দ্ধমান ১৫।৮।৫৫ [ইং]

প্রিয়বরেষু

চিঠি পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। আমি ২।১ দিনের জন্য কলিকাতা যাই, তোমাদিকে বিরক্ত করিনে তোমাদের স্নেহ ভালবাসায় আমি গৌরব করি। কবি কালীকিঙ্করবাবু[১] ভাল কবি এবং উচ্চদরের লোক, পণ্ডিত ও নিরভিমান। তোমরা আমার বাড়ীতে পদধূলি দিবে ইহাতে আমি পরম আনন্দবোধ করিব।

কবিবর দেবেন্দ্র সেনের আমি দীন ভক্ত তাঁর কবিত্বশক্তি অসাধারণ, তোমরা তাঁহার স্মরণোৎসব করিয়া খুবই ভাল করিয়াছ। আমার কোনো কাব্যগ্রন্থই নাই, একখানা আছে তোমাদের সাহিত্যতীর্থে দিব। কবিশেখর[২] একখানি সংকলন করিতেছেন ছাপা হইলেই তোমাদিকে দিব। সাহিত্যতীর্থের উন্নতি ও সাফল্য কামনা করি। তোমাদের উদ্যোগ উৎসাহ বিফলে যাইবে না। ইহারি মধ্যে সাহিত্যতীর্থ বেশ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১ ডাক্তার শ্রীকালীকিংকর সেনগুপ্ত ২ শ্রীকালিদাস রায়

১২) লেফাফাপত্র [৫. ৯. ৫৫]

শ্রীহরি শরণং

কোগ্রাম
২৯।৫।৬২

তীর্থতিলক শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক করকমলে

প্রিয়বরেষু,

অনেক দিন সংবাদ পাই নাই চিঠি পেয়ে আনন্দিত হলাম। তোমাদের কুশল জেনে সুখী হলাম। শরৎচন্দ্রের জন্মতিথি উৎসব করবে, খুব ভাল হবে। সজনীকান্তের সভাপতিত্বে গল্প ও কবিতার আসর হবে এও সুসংবাদ। ফণিবাবু[১], গোপালবাবু[২] প্রভৃতি শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধু তাঁহারা ভালই বলবেন। তুমি একটী মহৎ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছো, শ্রীভগবান তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন যশস্বী করুন। কুমারেশ[৩] প্রতিভাবান তাঁর দ্বারা দেশের বহুকাজই হবে। সাহিত্যতীর্থে তাঁকে পেয়ে তোমাদের শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। তীর্থ মাহাত্ম্য বাড়িবে। ইতি স্নেহধন্য

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

যখন কলকাতা যাব সংবাদ দেবো।

১৩) টেলিগ্রাম [১৭.৯.৫৫]

Ramendra mallik 67 Pathuria Ghata St. Calcutta.
unavoidably detained.

Kumudranjan.

১৪) লেফাফাপত্র [১৯. ১০. ৫৫]

শ্রীহরি শরণং

কোগ্রাম
৩১।৬।৬২

প্রিয়বরেষু,

চিঠি পাইয়া আনন্দিত হইলাম। শ্রীযুক্ত বিদ্যানিধি মহাশয়[৪] বাংলার গৌরব তাঁহাকে তোমরা সাহিত্যতীর্থের পক্ষে সম্বর্দ্ধনা দিতে যাইতেছ ইহা পরম সৌভাগ্যের কথা আমি তাঁকে গভীর ভক্তি করি। তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিবার এ সুযোগ আমাকে ছাড়িতে হইল তাহার কারণ বাড়ীতে শ্রীশ্রী৺পূজা। ষষ্ঠীর দিন কোথাও যাওয়া সম্ভব নহে, তাই যাইতে পারিলাম না। তোমাদের সঙ্গে আমার প্রণাম পাঠাইলাম। তাঁহার আশীর্ব্বাদের আকাঙ্ক্ষী হইয়া রহিলাম। বাঁকুড়ায় আমার ভগ্নীর বাড়ী আমার ভগ্নীপতি ডাঃ অনাথবন্ধু[৫] ও আমার ভগ্নী অন্নপূর্ণা বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রিয় ভক্ত, বহুদিন হইতেই যাইব যাইব করি কিন্তু ঘটিয়া উঠিতেছেনা। আমার অনুপস্থিতির ত্রুটি মার্জ্জনা করিবে। ইতি স্নেহধন্য

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১ শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। সম্পাদক ভারতবর্ষ ২ শ্রীগোপালচন্দ্র রায় ৩ শ্রীকুমারেশ ঘোষ। সম্পাদক যষ্টিমধু ৪ যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ৫ ডাক্তার অনাথবন্ধু রায়

১৫) লেফাফাপত্র [২. ১১. ৫৫]

শ্রীহরি শরণং

কোগ্রাম
১৬।৭।৬২

প্রিয়বরেষু,

তোমার চিঠি পাইয়া আনন্দিত হইলাম। তুমি ও তীর্থংকরগণকে আমার শ্রীশ্রী৺বিজয়ার সাদর সম্ভাষণ আলিঙ্গন ও আন্তরিক আশীর্ব্বাদ জানাই। তোমাদের জীবন পবিত্র সুন্দর কর্ম্মময় ও শুভংকর হউক।

বিদ্যানিধি মহাশয়ের সম্বর্দ্ধনা খুবই ভাল হইয়াছে মানপত্র সুন্দর হইয়াছে। তুমি দীর্ঘজীবী হও, সাহিত্যতীর্থকে জগতের তীর্থে পরিণত কর।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

পুঃ কোজাগরী পূর্ণিমার ছাপা নিমন্ত্রণ পাইয়া সুখী হইয়াছি, যাইতে পারিলাম না তজ্জন্য দুঃখিত, তাঁদিকে আমার ধন্যবাদ জানাই।

১৬) পোষ্টকার্ড [২২. ১১. ৫৫]

শ্রীহরি শরণং

কোগ্রাম
৪।৮।৬২

প্রিয়বরেষু

তোমার চিঠিতে সাহিত্যতীর্থে কবিবর দেবেন্দ্রনাথের বার্ষিকী পালন করবে জেনে বড়ই আনন্দিত হইলাম। মন্মথবাবু[১] সভাপতি হইবেন এবং রথী বাবু[২] ও সুপ্রসন্ন বাবু[৩] আলোচনায় যোগ দিবেন খুবই ভাল হবে। আমি কল্য সন্ধ্যায় বাড়ী এসে তোমার চিঠি পেলাম। কয়দিন বাহিরে ছিলাম। মোহিতলাল মজুমদার দেবেন্দ্রনাথের আত্মীয়। দেবেন্দ্রনাথের ভ্রাতা এলাহাবাদের হাইকোর্টের জজ ছিলেন, তিনিও কবিতা লিখিতেন। দেবেন্দ্রনাথ অসাধারণ কবি। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে তাঁর সোনার তরী উৎসর্গ করেন। দেবেন্দ্রনাথের কাব্যেই তাঁর পরিচয় আছে, তাঁর ভ্রাতাদের নাম, তাঁর স্ত্রীর নাম কন্যার নাম সব আছে। তুমি তাঁর সব রচনা পড়বে। করুণাদাদা তাঁর বিশেষ ভক্ত ছিলেন। আশা করি তোমাদের সব মঙ্গল। আমি ১৫।১৬।১৭ই কলিকাতায় ছিলাম। কল্যাণাক্ষ কেমন আছেন?

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১ শ্রীমন্মথনাথ সান্যাল। সম্পাদক রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা
২ ডক্টর রথীন্দ্রনাথ রায় ৩ শ্রীসুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

১৭) লেফাফাপত্র

শ্রীহরি শরণং   কোগ্রাম

১২।২।৫৬ [ইং]

প্রিয়বরেষু

তোমার চিঠি পাইয়া আহ্লাদিত হইলাম। আমি সামান্য ব্যক্তি আমার জন্মতিথি স্মরণীয় কিছু নয়। তোমরা আসিবে ইহা আমার পরম সৌভাগ্য, গ্রামবাসীও খুব উল্লসিত হইবে। তারাশঙ্কর[১] সজনীকান্ত[২] বা অচিন্ত্য কুমার[৩] সভাপতি হইলে ভাল হয়, বহুলোক তাঁহাদিগকে দেখিতে চায়। জেলার লোক ডাঃ সুকুমার[৪] বাবু তাঁকে দেখবার অনেকের সুবিধা হইয়াছে। কলিকাতা হইতে ঐ তিনজনের মধ্যে কেহ হইলে ভাল হয়। কবিশেখর[৫] বোধ হয় সময় পাইবেন না নতুবা তাঁর আসাও খুব অভিনন্দিত হইত। অন্য কেহ আসিতে না চাহিলে, কাটোয়ার মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটকে সভাপতি করাই ভাল। স্থানীয় হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ও অনেকে এ কার্য্যে তোমাদের সহকারী ও সাহায্যকারী হইতে খুবই ইচ্ছুক। কতগুলি লোক ওখান হইতে আসিবেন আগে হইতে জানাইবে। এখানকার নাম পরে পাঠাইলেই হইবে, কাটোয়া ও বর্দ্ধমান হইতে অনেকে আসিতে চান। ট্রেন ও বাসের কোন অসুবিধা হইবে না। এখানে সাহিত্যানুরাগীর সংখ্যা বেশী নহে তবে তোমাদিকে দেখিতে অনেক লোক আসিবে।

শ্রীরাধাশ্যাম দাস বি. এ, বি. টি

প্রধান শিক্ষক, মঙ্গলকোট হাইস্কুল নূতনহাট পোঃ বর্দ্ধমান

ডাঃ শ্রী সৌরেন্দ্রমোহন সরকার

নূতনহাট পোঃ বর্দ্ধমান

ডাঃ শ্রীতারাপদ চট্টোপাধ্যায়

কোগ্রাম নূতনহাট পোঃ বর্দ্ধমান

পত্রালাপ করিবে। তার পর অন্য নাম দিলেই হইবে।

প্রথমতঃ তোমরা যিনি সভাপতি হইবে তাহাই ঠিক করিবে।

তোমরা আমার বাড়ী অতিথি হইবে এই আমার বৃহৎ আনন্দের বিষয়। যে চারিজন বিশিষ্ট সাহিত্যিকের নাম দিলাম, সভাপতি হিসাবে, তাঁরা আমার আত্মীয় সুহৃদ, তাঁদের এই উপলক্ষ্যে শুভাগমন বড়ই স্পৃহনীয়।

তুমি পত্র লিখিলে অন্যান্য কথা লিখিব, এখানকার লোকেদের সঙ্গেও পরামর্শ করিব এবং সাহিত্যতীর্থের বসন্ত ঋতু উৎসবটি যাতে সাফল্য মণ্ডিত হয় তাহাই লক্ষ্য রাখিব। ইতি

স্নেহধন্য

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ২ সজনীকান্ত দাস ৩ শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
৪ ডক্টর সুকুমার সেন ৫ শ্রীকালিদাস রায়

১৮) লেফাফাপত্র

শ্রীহরি শরণং কোগ্রাম

২২।২।৫৬ [ইং]

প্রিয়বরেষু,

গত কল্য কাটোয়ার S. D. O বাহাদুর আসিয়াছিলেন। তিনি তোমাদিকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য যে সমিতি গঠিত হইয়াছে তাহার সভাপতি হইয়াছেন এবং শ্রীমান তারাশঙ্কর সজনীকান্ত শৈলজানন্দ[১] কুমারেশ ও তোমরা আসিবে জানিয়া অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করেছেন। মণ্ডপ তৈয়ার করাইতেছেন।

তারাশঙ্কর সজনীকান্ত শৈলজানন্দ আমার এখানে আসিবেন তোমরা আসিবে ইহা আমার পরম সৌভাগ্য আমি সত্যই বড় আনন্দিত হইয়াছি। তোমাদের সম্বর্দ্ধনাই মুখ্য ব্যাপার। জনগণ খুব উল্লসিত। তোমরা যদি ১৮ই বৈকালে আস বড় ভাল হয়, যদি একান্তই ও তারিখে না আসিতে পার ১৯শে আস সংবাদ দিবে, কারণ তোমাদিকে শোভাযাত্রা সহকারে ইহারা আনিবেন। সজনীকান্ত প্রভৃতি যেন তারাশঙ্করের সঙ্গে থাকেন নতুবা গ্রামবাসী দুঃখিত হইবে। কালিদাস প্রভৃতি আসিলে আরও ভাল হয়। শ্রীভগবান যেন তোমাদের আগমন সর্ব্ববিষয়ে শুভ করেন, তোমাদের যাত্রা যেন জয়যাত্রা হয়। নদীর তীরেই Pandal হইবে। তোমাদের অভ্যর্থনার জন্য নিমন্ত্রণ পত্র প্রচারিত হইবে। পত্র পাঠ উত্তর দিবে। ইতি স্নেহধন্য

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১৯) লেফাফাপত্র

শ্রীহরি শরণং কোগ্রাম

নূতনহাট পোঃ

বর্দ্ধমান ২১।২।৫৬ [ইং]

প্রিয়বরেষু

সোমবার বৈকালে তোমার চিঠি পেলাম, পাইয়া আহ্লাদিত হইলাম। আমার জন্ম তারিখ ১৯শেই বটে। সৌরেন্দ্র[২] জন্মতিথির কথা বোধ হয় লিখেছে। কলিকাতায় তোমাদের সঙ্গে আসিবার জন্য অন্য চিঠি দিলাম, আমি আগে আসিবার জন্য লিখিয়াছিলাম। বর্দ্ধমানে, বনগনায় লোক থাকিবে। দরকার হইলে বাসে special trip বনগনা হইতে নূতনহাট দিবার জন্য বলা হইয়াছে।

আমার কবিতা কি গানের কথা মনে নাই তোমরা আসিবে এই আনন্দেই ভোর। কবিতার বই আর কাছে কি বাজারে কোথাও নাই out of print.

১ শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ২ শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের পুত্র। মাসিক বসুমতীতে সাহিত্যসেবক মঞ্জুষা প্রকাশ করেন

তোমার চিঠিমত সব কার্য্যই হইবে। আশা করি সব কুশল। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

কল্যাণাক্ষ যেন আসে, তার পিতা কি আসিবেন না, এলে বড় ভাল হয়।

শ্রীকুমুদরঞ্জন

২০) লেফাফাপত্র

শ্রীহরি শরণং কোগ্রাম

১০।৩।৫৬ [ইং]

প্রিয়বরেষু

তোমার সুন্দর চিঠিখানি পাইয়া আনন্দিত হইলাম। এখানে শ্রীশ্রীরাম কৃষ্ণ সেবায়তনে শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যদেব স্বয়ং আশীর্ব্বাদ পাঠাইয়াছেন। স্বামী নির্ব্বেদানন্দ আশীর্ব্বাদ পাঠাইয়াছেন। কবি শান্তশীল দাস, শক্তিপদ দত্ত, কীর্ণাহার হইতে শ্রীভোলানাথ দত্ত, জলপাইগুড়ি হইতে ধীরেন্দ্র বসু ও অন্যান্যস্থান হইতে আরও ১০।১৫ জন শুভাকাঙ্ক্ষী পত্র দিয়াছেন তোমার কাছে পাঠাইব কি? আমি উহা তোমাদের জন্যই রাখিয়াছি। আব্দুস্ সত্তার এম, পি, তোমাদের সঙ্গে দেখা করিতে রবিবার বেলা ৮ টায় আসিয়া ছিলেন সঙ্গে ৪জন কংগ্রেস কর্ম্মীসহ। যুগান্তর জনসেবক হিন্দু সব পড়িয়াছি। 'লোক সেবক' পাইনে।

তোমাদের আগমনেই কৃতার্থ হইয়াছি, গ্রাম ও অঞ্চলবাসী উল্লসিত হইয়াছে। তারাশঙ্কর কেমন আছেন? তার জন্য মন কেমন করিতেছে। বাড়ী ফাঁকা ফাঁকা লাগিতেছে। নিতান্ত আত্মীয়ের মত তোমরা আসিয়াছিলে, কত ত্রুটি হয়েছে, সবই আনন্দে গ্রহণ করেছ। মিনু[১] তোমাদের তীর্থংকর হোক। রাধাশ্যাম বাবু তারাপদ বাবু সকলেই তোমাদের কথা বলিতেছেন। যাঁহারা ফটো তুলিয়াছিলেন পাঠাইয়া দিলে তোমাদিকে দিব। বাড়ীর সকলেই তোমাদের আত্মীয়তায় মুগ্ধ।

যদি এখনো এক বৎসর বাঁচি, তোমরা আবার আসিবে। সে তো ভগবানের ইচ্ছা, যদি তাঁর ইচ্ছা হয় সবই হইবে। তবে দুই দিন খুবই আনন্দ পাওয়া গিয়াছে এবং জনসাধারণের মধ্যে তোমরা একটা ছাপ রেখে গিয়াছ। রান্না ভাল লাগিয়াছে শুনিয়া গৃহ পরিজনেরা খুবই সুখী। তারাশঙ্করের চিঠি পাই নাই। তাহার শরীর কেমন আছে জানাইবে, চিন্তিত থাকি। আমাকে সে যে কি ভক্তি করে আর আমি যে কি স্নেহ তাহাকে করি, তাহা আমরাই জানি।

তোমাদের সকলের কুশল কামনা করি। ইতি

স্নেহধন্য

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১ পৌত্র শ্রীসুখেন্দু মল্লিক। শ্রীজ্যোৎস্নানাথ মল্লিকের কনিষ্ঠ পুত্র

২১) লেফাফাপত্র

শ্রীহরি শরণং কোগ্রাম

১৭।৩।৫৬ [ইং]

প্রিয় রমেন্দ্রনাথ,

তোমার পত্র পাইয়া আহ্লাদিত হইলাম। অনেকগুলি ছবি পাইয়াছি ফটোগুলি[১] সব সুন্দর হইয়াছে, বহু ছবি তোলা হইয়াছিল। তোমরা আসায় এখানে একটা বড়ই আনন্দের সাড়া পড়িয়াছিল। তোমরা নিজ গুণে সবই সুন্দর ও উৎকর্ষ বলিতেছ ইহাতে গ্রামবাসীরা উল্লসিত।

আমি ১লা পর্য্যন্ত কলিকাতা থাকিতে চেষ্টা করিব। ২রা বাড়ী ফিরিতে হইবে। শিশু সাহিত্য সম্রাটকে[২] অভিনন্দিত করা হবে জেনে খুবই আহ্লাদিত হইলাম, উহা চৈত্রসংক্রান্তির দিন করা হইলে ভালই হয় না কি? ২রা থাকিতে পারিব মনে হয় না।

তারাশঙ্করের পত্র পাই নাই, আশা করি ভাল আছেন তাহার জন্য বাড়ীর সকলেই চিন্তিত থাকেন। এখনো বহু চিঠি আসিতেছে। ফটোগুলি লয়ে যাবো দেখিবে।

তোমাদের কুশল সংবাদ দিবে। অচিন্ত্যকুমারকে বার্ষিক অধিবেশনে গত বৎসরের ন্যায় নিমন্ত্রণ করিবে নিশ্চয়ই। ইতি আঃ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

২২) পোষ্টকার্ড [২৪. ৪. ৫৬]

শ্রীহরি শরণং কোগ্রাম

৮।১।৬৩

প্রিয়বরেষু,

চিঠি পাইয়া আনন্দিত হইলাম। দক্ষিণারঞ্জন বাবুর সম্বর্দ্ধনা সুচারু ভাবে হইয়াছে জানিয়া বড়ই সুখী হইলাম। আমি থাকিতে না পারায় খুবই লজ্জিত। থাকিবার কোনো উপায় ছিল না, বাড়ীতে বহু কাজ ছিল।

তোমাকে একা বহু পরিশ্রম করিতে হয়, আমার কোনো অসুবিধা হয় নাই তবে এবার কবি সমাগম কিছু কম হইয়াছিল। কল্যাণাক্ষ ও করুণাক্ষ বাবু এদিন আসেন নাই অথচ উহারা খুবই উদ্যোগী। কুমারেশ দক্ষিণা-রঞ্জন বসু মহাশয় এবার খুব পরিশ্রম করিয়াছেন। অতগুলি মনীষীকে সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য কিন্তু তুমি উহা কর। শ্রীভগবান তোমার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি করুন। ইতি শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১ কোগ্রামে অনুষ্ঠিত ৭৪তম জন্মোৎসব ১৯শে ফাল্গুন ১৩৬২

২ দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার। ২রা বৈশাখ জন্মদিন

২৩) আন্তর্দেশীপত্র [১৪. ৯. ৫৬]

শ্রীহরি শরণং — কোগ্রাম

৩০.৫।৬৩

প্রিয়বরেষু

তোমার চিঠি পাইয়া আনন্দিত হইলাম। সৌরীন্দ্রমোহন[১] বাবুকে ঐ সভার[২] সভাপতি করিয়া বড় ভাল কাজ করিয়াছ। তিনি প্রসিদ্ধ সম্পাদক সাহিত্যিক ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার। তাঁহাকে উপযুক্ত মর্য্যাদা দিবার কোনো চেষ্টাই করা হয় নাই। বরং তাঁহাকে দাবাইয়া রাখিবার চেষ্টাই দেখি। মনে যে কি ব্যথা পাই কাহাকে বলিব? তোমরা অতঃপর রবীন্দ্র নাথ সম্বন্ধে প্রত্যেক সভাতেই তাঁকে সভাপতি করিবে। এটা তোমাদের কর্ত্তব্য মনে করিবে। তাঁহাকে আহ্বান করায় আমি যে কতদূর সুখী তাহা প্রকাশ করিতে পারিনে।

আমার সকলন কালিদাস[৩] করিতেছেন এবং লিখিতেছেন দ্রুত ছাপা হইতেছে। খণ্ড খণ্ড ভাবে পৃথক বই ছাপার সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে পরামর্শ করিব। আশা করি তোমার সব কুশল। মাঝে আমার শরীর ভাল ছিলনা। এখন ভাল আছি। এখন কলিকাতা যাইবার কোনো কথা নাই। শ্রীভগবান তোমার সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল করুন। ইতি — শুভাকাঙ্ক্ষী

২৪) পোষ্টকার্ড [১০. ১০. ৫৬]

শ্রীহরি শরণং — কোগ্রাম

২৩।৬।৬৩

প্রিয়বরেষু

বন্যা ভয়াবহ ও অভাবনীয়, বাড়ী গাছগুলি ছাড়া ঘর দুয়ারের কিছু খাড়া নাই। তাম্বুতে বাস করিতেছি কোথাও যাই নাই, সকলে সমান ভাবে দুঃখ কষ্ট আনন্দেই সহিতেছি, তেমন অসুবিধা বোধ হইতেছে না। গ্রামবাসীদের তোমার চিঠির কথা বলিলাম, তাঁরা খুব খুশী। শ্রীভগবানের উপর নির্ভর করিয়া দিন ভালই যাইতেছে। ইতি — শুভকাঙ্ক্ষী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

২৫) পোষ্টকার্ড [২৩. ১০. ৫৬]

শ্রীহরি শরণং — কোগ্রাম

৫।৭।৬৩

প্রিয়বরেষু

আমার শ্রীশ্রী৺বিজয়ার ভালবাসা আলিঙ্গন ও আশীর্ব্বাদ জানিবে।

১ সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ২ শরৎ জন্মোৎসব ৩ শ্রীকালিদাস রায়

বন্যা বড়ই বিব্রত করিয়াছে। তাম্বুতে বাস করিতেছি। বিশেষ অসুবিধা নাই।

তোমার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি প্রার্থনা করি। আ:

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

২৬) লেফাফাপত্র

শ্রীহরি শরণং

কোগ্রাম
নূতনহাট পো:
বর্দ্ধমান ৫।৩।৫৭
২১।১১।৬৩

প্রিয়বরেষু

আপনার ও সাহিত্যতীর্থের সব তীর্থংকরগণের ভালবাসা ও প্রীতি প্রণতি আমার জন্মদিনে পাইয়া ধন্য হইলাম। আপনারা সকলে আমার ভালবাসা আশীর্ব্বাদ ও নমস্কার গ্রহণ করুন। ইতি স্নেহধন্য

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

২৭) লেফাফাপত্র [৭. ৫. ৫৭]

শ্রীহরি শরণং

কোগ্রাম
২৩।১।৬৪

প্রিয়বরেষু

তোমার চিঠি পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম এবং আনন্দিত হইলাম। শ্রীভগবান যদি সুস্থ রাখেন নিশ্চয়ই যাইব। মাঝে শরীর বড় খারাপ হইয়াছিল। বাড়ীঘর তৈয়ারী লইয়াও বড় ব্যস্ত আছি। রাজমিস্ত্রি ইট কাঠ সিমেন্ট আমাকে বিরক্ত করিতেছে। গান ভুলিয়া বাবুই পাখীর মত বাসা রচনা করিতেছি।

চার দিন থাকিতে পারিব মনে হয় না। যে দুইদিন খুব দরকারী সেই দুদিন থাকিব। তোমাদের স্নেহ অপরিমেয় কিন্তু শরীর আর ভার সহিতে পারিতেছে না। মধ্যে মধ্যে কুশল সংবাদ দিবে। ইতি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

২৮) পোষ্টকার্ড [৯. ৫. ৫৭]

শ্রীহরি শরণং

কোগ্রাম
২৬।১।৬৪

প্রিয়বরেষু

চিঠি বোধ হয় পাইয়াছ। তোমার আদেশ মত যে দু দিন বলিবে

উপস্থিত থাকিব। শরীর ভাল নয় তবু তোমাদিগকে দেখিবার ও তোমাদের সঙ্গে মিলিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিনে। আশা করি সব কুশল। ইতি
আঃ
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

২৯) লেফাফাপত্র

শ্রীহরি শরণং
কোগ্রাম
১৮।৮।৫৭ [ইং]

প্রিয়বরেষু

ভাই রমেন্দ্র তোমার পত্র পেয়ে বড়ই সুখী হইলাম, আমি তোমাদের কাছে অপরাধী, নিতান্ত নিরুপায় হইয়া বাড়ীতে আবদ্ধ ছিলাম, কলিকাতা যাইতে পারি নাই, শরীর হঠাৎ অসুস্থ হয়। তোমাদের স্নেহ ভালবাসা কখনো ভুলিবার নয়। একটা বাড়ী তৈয়ার হইতেছে, আমি পাকা বাড়ী পক্ষপাতী কোনো দিন নই, তবু তাহাই করিতে হইল। বাড়ী ভালই হইয়াছে তোমরা দেখিয়া আহ্লাদিত হইবে। কারণ তোমাদের সেই সভাস্থলেই buildingটা উঠিয়াছে।

কালিদাস ও শৈলজানন্দ এবার সম্বর্দ্ধনা পাইয়াছেন ইহা পরম আনন্দের বিষয় আমি বড়ই উল্লসিত হইয়াছি।

ভাই সমস্ত সাহিত্যিক ও তীর্থংকরগণকে আমার অবস্থার কথা বলিও এবং আমার দোষ মার্জ্জনা করিতে বলিও।

আশ্বিনের প্রথমে যাইতে পারিব মনে হয় না। যদি পারি জানাইব। খুবই ব্যস্ত আছি অনেক মিস্ত্রি মজুর, যা পছন্দ করিনে ভগবান তাই করাইতেছেন। ইতি
স্নেহধন্য
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

৩০) পোষ্টকার্ড

শ্রীহরি শরণং
কোগ্রাম
১২।১০।৫৭ [ইং]

ভাই রমেন্দ্র,

তুমি আমার ৺বিজয়ার ভালবাসা ও আলিঙ্গন গ্রহণ কর। আমি কবে কলিকাতা যাইব বলিতে পারিনে। যাইবার আগে সংবাদ দিব। বাড়ীটি শেষ হয় নাই তবে কোনোরূপে ব্যবহার উপযোগী করা হইয়াছে।

তোমার বইখানি Book Post এ পাঠাইবে না, উহা খোয়া যাইবে, আমি কলিকাতা গিয়া লইব। ইতি
স্নেহধন্য
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

৩১) লেফাফাপত্র

শ্রীহরি শরণং — কোগ্রাম

২১।১০।৫৭ [ইং]

প্রিয়বরেষু

তোমার চিঠি পেয়ে আনন্দিত হলাম। আমি ২রা মাঘই কলিকাতা পহুঁছাই এবং ৪ঠা ভোর চলে আসি, দেখা হয় নাই তজ্জন্য বড়ই দুঃখ হইতেছে। ভারতবর্ষের কবিতাটি ভাল লেগেছে জেনে সুখী হলাম। তোমার যে চিঠি যখন পাই তক্ষুনি উত্তর দিই। কেন পাও নাই বলিতে পারিনে।

বাড়ীতে এখন কেবল বাসা বাঁধবার আয়োজন চলেছে। তাম্বুতে বাস করছি। তবে কষ্টে নাই। তোমাদের জন্য মন কেমন করে। এবার আর জন্মতিথি উৎসব হইবার সম্ভাবনা নাই। থাকিবার স্থান নাই। গ্রাম ভাঙ্গা ভগ্ন।

কবিশেখরকে সাহিত্যতীর্থে আনিয়া ভাল করিয়াছ, তোমার তো সব দিকেই দৃষ্টি আছে। কুমারেশ প্রায়ই পত্র দেন। তাঁর আত্মীয়তা আমাকে মুগ্ধ করে। এবার বৈশাখের প্রথমে অধিবেশন না করিয়া অন্য সময় করবার স্থির করিয়া ভালই করিয়াছ। উহাতে নানা অসুবিধা। আশা করি সব কুশল। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

৩২) পোষ্টকার্ড [২৭. ১১. ৫৭]

শ্রীহরি শরণং — কোগ্রাম

১১।৮।৬৪

প্রিয়বরেষু

তোমার চিঠি পেয়ে বড়ই আনন্দিত হইলাম। জগত্তারিণী পদক পাওয়ায় আনন্দিত হইয়াছ জেনে আমিও আনন্দিত হইলাম। ছাত্রজীবনে বঙ্কিমচন্দ্র সুবর্ণ পদক পেয়ে বড়ই আহ্লাদিত হইয়াছিলাম। এখন রাঙা পদের চিন্তাই করি সোনার পদকের নয়। তাই গুণীজনের দেওয়া মহীয়সী মহিলার নামাঙ্কিত পদক খুবই সম্মানের, তবে এ বয়সে উহার আনন্দ পূর্ণ ভাবে অনুভব করিবার শক্তি নাই।

আমি ১৫ই শ্রীরামপুর যাইব কলিকাতা হয়ে যদি যাই তোমায় সংবাদ দিব। কলিকাতা যখন যাবো আগে সংবাদ দেবো। তোমার বই গিয়া লইব। কবিশেখর নিজ জীবনী লিখেছেন আমি ভারতবর্ষে গ্রামের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধে যা লিখেছি তাই পড়ো। উহার বেশী এ সামান্য জীবনের জানাবার কিছু নাই।

বাড়ীটি তৈয়ার প্রায় হইয়াছে। উহাতেই বসবাস করিতেছি তোমরা

দেখে সুখী হবে। তারাশঙ্কর, তুমি, শৈলজানন্দ কুমারেশ প্রভৃতি সকলে একবার এলে সুখী হবো। স্থানের আর অকুলান নাই। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

৩৩) লেফাফাপত্র

শ্রীহরি শরণং

কোগ্রাম

নূতনহাট পোঃ

বর্দ্ধমান ৪।৩।৫৮ [ইং]

প্রিয়বরেষু

ভাই রমেন, তোমার চিঠি পেয়ে বড়ই আনন্দিত হইলাম, তুমি ও সাহিত্যতীর্থের সব সভ্যবৃন্দকে আমার ভালবাসা আলিঙ্গন ও নমস্কার দিবে। আমি কৃতার্থ হইয়াছি।

এবার এখানকার Block officer গণ একটী জন্মতিথি উৎসব করিতেছেন তাঁহারা আমার বাড়ীতেই করিবেন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাদের সভাপতি। আমার একান্ত আকাঙ্ক্ষা তোমরা তাহাতে আমার বাড়ীতে পদধূলি দাও। নূতন বাড়ীতে তোমাদের সবাইকে দেখিতে চাই। তারাশঙ্কর শৈলজানন্দ তুমি কুমারেশ আসা চাইই। প্রেমেন্দ্র[১] ও প্রমথ বিশি[২] মহাশয়ও আসিলে আরও ভাল হয়। বার্ত্তা সম্পাদক দক্ষিণাবাবু[৩] ও মহলানবিশ[৪] মহাশয়ও অনুগ্রহ করিয়া আসিবেন বলিয়াছেন কুমারেশকে। ভাই তাঁহারা কে কে ঠিক আসবেন আমাকে সত্বর জানাইবে আমি বর্দ্ধমানে লোক রাখিব। তাঁহারা শিয়ালদহ হইতে ছাড়ে Upper India Expressএ আসিলে বর্দ্ধমানে ১১॥০টায় পহুছিবেন সঙ্গে সঙ্গে বনগনা আসার ট্রেণ আছে যদি না থাকে বা না পাও Taxi র ব্যবস্থা করিব। সজনা অসুস্থ কবিশেখর অসুস্থ শুনিয়াছি। তবে গতবারের তুমি তারাশঙ্কর শৈলজানন্দ ও কুমারেশ যেন এক সঙ্গে এসো। ১৩ই মার্চ্চ তারিখে ঐ সভাটি হইবে। পরে তোমার পত্র পাইলে সব লিখিব। ইতি স্নেহধন্য

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

৩৪) লেফাফপত্র

শ্রীহরি শরণং

কোগ্রাম

নূতনহাট পোঃ

বর্দ্ধমান ১৫।৩।৫৮ [ইং]

প্রিয়বরেষু

তোমার 'মিষ্টিমনের'[৫] পরিচয় পেলাম। বেশ একটা আলো ছায়ার

১ শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র ২ শ্রীপ্রমথনাথ বিশী ৩ শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু। বার্ত্তাসম্পাদক যুগান্তর
৪ শ্রীহরিপদ মহলানবিশ। বার্ত্তাসম্পাদক আনন্দবাজার পত্রিকা ৫ কবিতাগ্রন্থ

খেলা চলেছে—যে আবছায়ায় কোথাও ফুলের মৃদুগন্ধ কোথাও কাকলী কোথাও ঝিরঝিরে হাওয়ার স্পর্শ পাওয়া যায়।

তোমরা আসায়[১] সুখী হইয়াছি তবে বড় কম ক্ষণের জন্য। ইতি

স্নেহধন্য
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

৩৫) পোষ্টকার্ড

শ্রীহরি শরণং

কোগ্রাম
৫।৬।৫৮ [ইং]

প্রিয় রমেন্দ্রনাথ

ভাই তোমার চিঠি পেয়ে আনন্দিত হইলাম। শ্রীমান প্রেমেন্দ্র হর-প্রসাদ[২] সঞ্জয়[৩] ও শুদ্ধসত্ত্ব বাবু[৪] ১লা আষাঢ় আসিবেন জানিয়া আনন্দিত হইলাম। আমি যাইতে পারিলে বড়ই সুখী হইতাম। তবে এখন যাইতে পারিব না। তাঁদিকে সব আমার কথা বলিবে।

আশা করি সব কুশল। ইতি

স্নেহধন্য
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

তুমি আমার একটী কবিতা বাছিয়া লইবে।

৩৬) লেফাফাপত্র

শ্রীহরি শরণং

কোগ্রাম
নূতনহাট পোঃ
বর্দ্ধমান ১৭।৯।৫৮ [ইং]

প্রিয়বরেষু

তোমার চিঠি পাইয়া আনন্দিত হইলাম। আমি ৩রা অক্টোবর যাইব এবং ৪।৫ই কি ৬ই পর্য্যন্ত থাকিব। শ্রীভগবান যেন শরীর ভাল রাখেন। ৬নং ফার্ণ রোড কলিকাতা ১৯ আমার বড় ছেলের[৫] বাসায় থাকিব। সাহিত্যতীর্থকে আরো সজাগ ও কার্য্যকরী করিতে হইবে। তোমাকে একাই বড় পরিশ্রম করিতে হয়, কুমারেশ খুব উদ্যোগী তাকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে সভ্য করিবে। তোমার কর্ম্মশক্তি ও কৃতিত্ব যথেষ্ট, ভগবান আরও ক্ষমতা দান করিবেন।

৩রা অক্টোবর আমার সঙ্গে বিকালে দেখা করিবে তাহার পূর্ব্বে কি লিখিতে বলিতে হইবে একটু আভাস এখানে পত্রে দিবে। কবীর সাহেব[৬] কবে আসিবেন, আসিবেন কিনা সঠিক জানাইবে এবং আসার কোনো অদল বদল হইলে জানাইলে সুখী হইব। কারণ এ সময় বাড়ী ছাড়িয়া

১ কবির জন্মোৎসবের দিন দুপুরে গিয়ে বিকেলের সময় চলে আসা হয় সেখান।

২ ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্র ৩ সঞ্জয় ভটাচার্য ৪ শ্রীশুদ্ধসত্ত্ব বসু

৫ শ্রীজ্যোৎস্নানাথ মল্লিক ৬ হুমায়ুন কবির

যাওয়ায় অসুবিধা আছে। নিতান্ত আবশ্যকের জন্যই যাইব। অন্য কোনো কাজ নাই। ইতি

স্নেহধন্য

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

৬৭) লেফাফাপত্র [১৯৬৮]

শ্রীহরি শরণং

কোগ্রাম

১৩।৬।৬৫

প্রিয়বরেষু,

আমি হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছি। চক্ষু উঠিয়া কাতর আছি। রোগটা ছোঁয়াচে, কেবল কষ্টকরই নয়। কাজেই যাইতে পারিলাম না ক্ষমা করিবে। হুমায়ুন কবীর সাহেবকে, শ্রীযুক্ত রাজশেখরবাবুকে এই সঙ্গে পত্র দিলাম, তাঁহাদিগকে শুনাইবে।

শিশু সাহিত্যিক সম্মেলনে, কথা সাহিত্যিক সম্মেলনে, কবি সম্মেলনে আমার সবিনয় সকাতর নিবেদন জানাইবে। আমার অপরিহার্য্য ত্রুটি মার্জ্জনা ভিক্ষা করি। তোমাকেও বড় অসুবিধায় ফেলিলাম ভাই অপটু শরীর ভার দুর্ব্বহ হইতেছে।

প্রত্যেক সমবেত ভদ্রমহোদয়গণের কাছে প্রত্যেক সাহিত্যিকগণের কাছে কবিগণের কাছে আমি করজোড়ে আমার অনুপস্থিতির ত্রুটি ও অপরাধের মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি। ইতি

স্নেহধন্য

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

শ্রীহরি শরণং

কোগ্রাম

১৩।৬।৬৫

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সাংস্কৃতিক মন্ত্রী মাননীয় হুমায়ুন কবীর সাহেবের কলিকাতা সাহিত্যতীর্থে শুভাগমন উপলক্ষে

সবিনয় নিবেদন,

আমি সহসা অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছি একান্ত বাঞ্ছিত আপনার সন্দর্শন লাভ ও অভ্যর্থনা করিবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইলাম, তজ্জন্য গভীর বেদনা অনুভব করিতেছি। আপনার শুভাগমনে আমাদের সাহিত্যতীর্থ ধন্য হইল—উল্লসিত হইল। আপনাকে কৃতজ্ঞতা ও অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আপনার জীবন সুদীর্ঘ, কীর্ত্তিঘন কল্যাণকৃৎ ও শান্তিময় হউক। ইতি

তীর্থঙ্করগণের পক্ষে

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

মাননীয় হুমায়ুন কবীর সাহেব

কেন্দ্রীয় সরকারের সাংস্কৃতিক মন্ত্রী

৩৮) লেফাফাপত্র [২৮. ১০. ৫৮]

শ্রীহরি শরণং কোগ্রাম
৯।৭।৬৫

প্রিয়বরেষু

শ্রীশ্রী৺বিজয়ার ভালবাসা আলিঙ্গন জানিবে। চোখ উঠায় বড় কষ্ট পেয়েছি ও পাচ্ছি, বারম্বারই অনুপস্থিত হইতেছি লজ্জা হয়। কেবল একটা মর্য্যাদার স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছি। তোমরা যদি সম্মত হও তাহা হইলে কবিশেখর[1] কিম্বা উপেন্দ্র বাবুকে[2] তীর্থপতি করার আমার ইচ্ছা। আমি কিছুই করিতে পারিতেছি না। অকর্ম্মা ছিলাম এখন অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছি।

তুমিই একাই সব কাজ করিতেছ, সুষ্ঠুভাবে করিতেছ! একাই একটী প্রতিষ্ঠান।

উল্লেখযোগ্য কোনো চিঠি পাই নাই পাইলে পাঠাইয়া দিব।

বইখানি ভাল হইয়াছে।

তোমার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি হউক। ইতি স্নেহধন্য

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

৩৯) পোষ্টকার্ড

শ্রীহরি শরণং কোগ্রাম
২০।১২।৫৮ [ইং]

প্রিয়বরেষু

তোমার চিঠি পেয়ে আহ্লাদিত হইলাম। আমার নূতন কবিতা বার্ষিকীতে দেওয়া খাপছাড়া হইবে মনে হয়। তুমি তার চেয়ে একটী কবিতা বরং বাছিয়া লইবে। আশা করি তুমি বেশ ভাল আছ। আমি একদিনের জন্য কলিকাতা গিয়াছিলাম তাই সংবাদ দিতে পারি নাই। যখন যাইব জানাইব। আশা করি তোমাদের সব মঙ্গল। ইতি

স্নেহধন্য

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

৪০) পোষ্টকার্ড [২৬.১.৫৯]

শ্রীহরি শরণং কোগ্রাম
১০।১০।৬৫

প্রিয়বরেষু

নিমন্ত্রণ চিঠি পাইয়া আনন্দিত হইলাম। শরীর এখন বেশ ভাল নাই, তজ্জন্য উপস্থিত হইতে পারিলাম না। সভাপতি মহাশয় এবং সমাগত সুধা-বৃন্দকে আমার অনুপস্থিতির ত্রুটি মার্জ্জনা করিতে অনুরোধ করিবে।

১ শ্রীকালিদাস রায় ২ উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

দক্ষিণাবাবু[১] অবধূত[২] জয়াসন্ধ[৩] সন্তোষ ঘোষ[৪] নরেন্দ্র[৫] গৌরীশঙ্কর[৬], কুমারেশ[৭] স্বরাজ বন্দ্যো,[৮] শিবনারায়ণ[৯] এবং সর্ব্বশেষ সভাপতি সরোজ বাবুর[১০] কাছে আমি অপরাধী—ক্ষমা ভিক্ষা চাহিতেছি। ইতি স্নেহধন্য

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

৪১) পোষ্টকার্ড [১০.২.৫৯]

শ্রীহরি শরণং

কোগ্রাম
২৩।১০।৬৫

প্রিয়বরেষু

চিঠি পেয়ে আনন্দিত হইলাম, অধিবেশন খুব ভাল হয়েছিল জেনে সুখী হইলাম। সবাই এসেছিলেন এটি খুবই প্রয়োজনীয়।

আবেদন[১১] প্রচার করবে। আমার সম্মতি আছেই।

আশা করি তোমরা সকলে ভাল আছ। স্নেহধন্য

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

৪২) লেফাফাপত্র

শ্রীহরি শরণং

কোগ্রাম
৬।৩।৫৯ [ইং]

প্রিয়বরেষু

চিঠি পাইয়া আনন্দিত হইলাম; সকল তীর্থংকরগণকে আমার ভালবাসা আশীর্ব্বাদ ও প্রণতি জানাই।

আনন্দ বাজারের যে কবিতা বাহির হইয়াছে লিখিয়াছ তাহা আমি পাই নাই ও দেখি নাই। যদি সম্ভব হয় একটি Cutting পাঠাইয়া দিলে সুখী হইব।

আশা করি তোমাদের সব কুশল। ইতি স্নেহধন্য

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

শ্রীহরি শরণং

কোগ্রাম
৬।৩।৫৯ [ইং]

প্রিয়বরেষু

আপনার ও সাহিত্যতীর্থের তীর্থঙ্করগণের আমার জন্মদিনের আশীর্ব্বাদ ও আনন্দ অভিনন্দন পাইয়া কৃতার্থ হইলাম। আমি সামান্য লোক আপনাদের আকৃত্রিম স্নেহ ভালবাসাই আমার পরম সম্পদ। আপনাদিকে প্রত্যভিবাদনকৃতজ্ঞতা ও নমস্কার জানাই।

শ্রীভগবান প্রীত হউন। ইতি স্নেহধন্য

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১ শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু ২ শ্রীকালিকানন্দ অবধূত ৩ শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্তী
৪ শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ ৫ শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র ৬ শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য
৭ শ্রীকুমারেশ ঘোষ ৮ স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ৯ শ্রীশিবনারায়ণ রায়
১০ শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী ১১ সাহিত্যিকদের অভিনয় বিষয়ে

৪৩) পোষ্টকার্ড

শ্রীহরি শরণং কোগ্রাম

৪।৫।৫৯ [ইং]

প্রিয়বরেষু

যদুনাথ মল্লিক[১] জন্মতিথি নিমন্ত্রণ পাইয়া আনন্দিত হইলাম। মহাপুরুষের স্মরণ জাতীয় জীবনের একটী একান্ত করণীয় কর্ম্ম। আশা করি অনুষ্ঠান খুব ভালই হইয়াছিল।

আমি অনেক দিন কলিকাতা যাই নাই। একটু বৃষ্টি হওয়ার পর যাইব এখন বড় গরম। মহাজাতি সদনে তোমাদের অভিনয়[২] সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে জানিয়া বিশেষ সুখী হইলাম। ইতি স্নেহধন্য

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

৪৪) লেফাফাপত্র [১৯৫৯]

প্রিয়বরেষু

চিঠি পেয়ে আনন্দিত হইলাম। এই কবিতাটি[৩] পাঠাইলাম, ভাল লাগিলে ছাপিবে। বাড়ীতে বড় ব্যস্ত আছি। শ্রীশ্রী৺লোচনদাস ঠাকুরের মন্দিরের ছাদ ঢালাই হইয়াছে, কাজের প্রায় তিন ভাগ হইয়া গেল। যদি পারি তোমাদের অনুষ্ঠানে যাইব। তবে শরীরের অবস্থা মোটেই ভাল যাইতেছে না। আশা করি তোমাদের সব কুশল। ইতি স্নেহধন্য

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

৪৫) লেফাফাপত্র [২২.৯.৫৯]

শ্রীহরি শরণং কোগ্রাম

নূতনহাট পোঃ

বর্দ্ধমান ২।৬।৬৬

প্রিয়বরেষু

চিঠি পাইয়া আনন্দিত হইলাম। বহুদিন সব বন্ধু বান্ধব ও তোমাদিকে দেখি নাই। দেখিতে ইচ্ছা হয়, একে একে দেহ অপটু হইতেছে। আমি ৩রা ৪ঠা যেদিন হয় একদিন যাইবই। অচিন্ত্যকুমার, রথীন[৪], রাণা[৫] এঁরা বোধ হয় আসবেন। তারাশঙ্কর ও সজনীকান্ত সময় পাবে কিনা জানিনা। প্রেমেন্দ্র হরপ্রসাদ বহু কাজে থাকেন। শুদ্ধসত্ত্ব, দুর্গাদাস[৬], কুমারেশ এরা আসবেন। রথীন লেখে বলে দুই ভাল। অচিন্ত্যকুমারকে বিশেষ করে আসতে বলো ভাই। অরুণকুমার[৭], দ্বিজেন্দ্র[৮], রেবতী[৯] (শিল্পী) সৌম্যেন

১ যদুলাল মল্লিক ২ উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'উটরোগ' নাটক 'সাহিত্যতীর্থে'র প্রযোজনায় বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যিকবৃন্দ অভিনয় করেন ৯ই বৈশাখ ১৩৬৬

৩ 'সাহিত্যতীর্থ' ষষ্ঠ বার্ষিকী ১৩৬৬ দ্রষ্টব্য ৪ ডক্টর রথীন্দ্রনাথ রায় ৫ শ্রীরাণা বসু

৬ শ্রীদুর্গাদাস সরকার ৭ ডক্টর অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ৮ শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

৯ শ্রীরেবতীভূষণ ঘোষ

ঠাকুর[১] আর আগে যাঁরা আসতেন তাঁদিকে কাউকে বাদ দিও না, বড় দেখতে ইচ্ছা হয়, সঞ্জয় [২] কি আসতে পারবে না?

আশা করি তোমার সব কুশল যদি আমি প্রথম দিনই যেতে চেষ্টা করবো তা হলে দুদিন থাকবো। ইতি

স্নেহধন্য

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

কালিদাসকে[৩] এবারও বলো বিশেষ করে। গঙ্গোপাধ্যায়[৪] মহাশয়ই সভাপতিত্ব করিবেন।

৪৬) পোষ্টকার্ড

শ্রীহরি শরণং

কোগ্রাম

২৯।৯।৫৯ [ইং]

সবিনয় নিবেদন

চিঠি পেয়ে আহ্লাদিত হইলাম। আমি ৩রা মনে করছি রওনা হইব বেলা ১টায় কলিকাতা পঁহুছিব। কালিদাস চিঠি দিয়েছেন যদি আমি যাই তাঁকে যেন সঙ্গে লই। ৪ঠা সকালেই অধিবেশনে যাইব মনে করিতেছি। ইতি

স্নেহের

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

৪৭) লেফাফাপত্র [১৭.১০.৫৯]

শ্রীহরি শরণং

কোগ্রাম

৩০।৬।৬৬

প্রিয়বরেষু

আমার শ্রীশ্রী৺বিজয়ার শুভেচ্ছা ও আলিঙ্গন জানিবে। 'সাহিত্যতীর্থ' পত্র কি বাহির হইয়াছে? আমি দেখি নাই।

বন্যা ভয়াবহ, বড় দুর্দ্দিন কাটিয়া গিয়াছে শঙ্কায় ও দুশ্চিন্তায়। এখন মায়ের প্রসন্ন মুখ।

তোমাদের কুশল প্রার্থনা করি। আমি ভাই এখন যাইতে পারিব না বড় ব্যস্ত। ইতি

স্নেহধন্য

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

৪৮) লেফাফাপত্র

শ্রীহরি শরণং

কোগ্রাম

১১।১১।৫৯ [ইং]

প্রিয়বরেষু,

তোমার প্রেরিত তোমার কাকাবাবুর[৫] দান সাহিত্যতীর্থের মারফৎ যাহা প্রেরিত হইয়াছে তাহার বিস্তৃত বিলির হিসাব পাঠাইব। এখানকার

১ শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২ সঞ্জয় ভট্টাচার্য ৩ শ্রীকালিদাস রায়
৪ উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৫ শ্রীবৃন্দাবনবিহারী মল্লিক

B. D. O office এর এবং গ্রামের কর্ম্মীগণের প্রচুর সাহায্য পাইতেছি বিলির বিষয়ে কোনো অসুবিধা হইবে না বিলি অন্তে হিসাব পাঠাইয়া দিব। Muster Rolls. গ্রামবাসী সাহিত্যতীর্থের এই দানে বড়ই সুখী হইয়াছেন। প্রদেশ কংগ্রেস, জেলা কংগ্রেস ও গভরমেন্ট সাহায্য দিতেছেন, কিন্তু এ দান তাহা অপেক্ষা বহু মূল্যবান। দাতা শতং জীবতু। তিনি গ্রামের অধীশ্বর মহাপীঠের দেবীর আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করুন এবং তাহার সঙ্গে গ্রাম-বাসীর ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। ইতি

স্নেহধন্য

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

পূজনীয় উপেন্দ্রবাবুর জন্মজয়ন্তীতে[১] লেখা ২/৪ দিন পর পাঠাবো। এখন বড় ব্যস্ত। সব জিনিস পাঠাইলাম।

৪৯) লেফাফাপত্র [১৯.১১.৫৯]

শ্রীহরি শরণং

কোগ্রাম

৩০।৭।৬৬

প্রিয়বরেষু

সাহিত্যতীর্থ মারফৎ প্রেরিত তোমার ছোট কাকা শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন বিহারী মল্লিক মহাশয়ের প্রদত্ত মহৎ দান পাইয়াছি ২১৬টী বস্ত্রাদি সবই বেশ উচ্চ শ্রেণীর অতি দরিদ্র ও অতি সম্ভ্রান্ত পরিবারও উহা আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। অসময়ে বড়ই উপকার করা হইয়াছে। দাতা শতং জীবতু। Muster Rolls পৃথক খাতায় Book Post এ পাঠানো হইল। Under Certificate of Posting.

সাহিত্যতীর্থ ভাল কাগজ হইয়াছে। প্রবন্ধটি[২] সুলিখিত। অশেষ ধন্যবাদ জানাইবে। ইতি

স্নেহধন্য

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

৫০) পোষ্টকার্ড

শ্রীহরি শরণং

কোগ্রাম

৪।২।৬০ [ইং]

সবিনয় নিবেদন

প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় দাদার মৃত্যু সংবাদে বড়ই ব্যথিত হইলাম। কত কার্য্যই করিতেছিলেন, যুবকের ন্যায় তাঁর উৎসাহ। তাঁর শোক সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া আমি সত্যই দারুণ বেদনা অনুভব করিতেছি।

১ উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৭৯তম জন্মোৎসব

২ ডক্টর রথীন্দ্রনাথ রায় রচিত 'কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক' প্রবন্ধ 'সাহিত্যতীর্থ' ১৩৬৯ ষষ্ঠবার্ষিকী দ্রষ্টব্য

বলাই[১] সভাপতিত্ব করিলেন জানিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। আমার ভালবাসা তাহাকে জানাইবে। ইতি

স্নেহধন্য

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

৫১) লেফাফাপত্র

শ্রীহরি শরণং

কোগ্রাম

৫।৩।৬০ [ইং]

প্রিয় ভাই রমেন্দ্রনাথ

আমার জন্মতিথিতে তোমার ও তোমাদের ভালবাসার মাধবীস্তবক উপহার পেয়ে ধন্য হলাম। তোমাদের দেওয়া মূল্যবান মানপত্রখানি[২] 'অজয়' কাড়িয়া লইয়াছে পূর্ব্ব বন্যায়, ছাপাটি রাখিয়া দিব। পূর্ব্বের সে লেখা বড় যত্নেই রক্ষিত ছিল।

অক্ষয়কুমার[৩] বড় কবি তাঁর সম্বন্ধে কিছু করিতেই হইবে। তুমিই সে বিষয়ে অগ্রণী হও। তাঁহাদিগের পূজায় ব্যতিক্রম কোনো ক্রমেই করা হইবে না। উপেন দাদা সম্বন্ধে একটী কবিতা সত্বর পাঠাইতেছি। সাহিত্যতীর্থের জন্য একটী নূতন কবিতা[৪] অদ্যই লিখিলাম ও পাঠাইলাম। তুমি স্বর্গবাসী মনীষীদের তর্পণ করিতেছ পূজা আয়োজন করিতেছ। দীর্ঘজীবী যশস্বী ও সুখী হইবে। তাঁদের আশীর্ব্বাদ অমোঘ ও দুর্লভ। আমিও তোমাদের সঙ্গে মিশিবার জন্য সদাই উদ্‌গ্রীব কিন্তু সময় করিতে পারিনে। ছেলেরাও বারবার যাইতে লেখে। কোগ্রাম তোমাদের কাছে ঋণী, এবার বন্যায় তোমাদের দানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও অত্যন্ত আন্তরিকতা পূর্ণ। সকলেই মুগ্ধ হইয়াছে।

শ্রীভগবান তোমার মঙ্গল করুন। তীর্থঙ্করগণকে আমার ভালবাসা কৃতজ্ঞতা ও আলিঙ্গন পাঠাই। ইতি

স্নেহধন্য

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

৫২) লেফাফাপত্র

শ্রীহরি শরণং

কোগ্রাম

২২।৩।৬০ [ইং]

প্রিয়বরেষু

তোমার চিঠি পাইয়া আনন্দিত হইলাম। ডাঃ সুশীল দের[৫] ন্যায় মহাপণ্ডিত ও মনীষী ব্যক্তি আমাকে সভাপতি হইতে বলেন ইহা আমার খুবই গৌরবের বিষয়। আমি তো মূর্খ, সমালোচনার কিছুই জানিনে শুধু

১ ডাক্তার বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) ২ কবিকে ৭৪তম জন্মজয়ন্তীতে কোগ্রামে গিয়ে প্রদত্ত ৩ অক্ষয়কুমার বড়াল ৪ সাহিত্যতীর্থ ১৩৬৭ সপ্তমবার্ষিকী দ্রষ্টব্য ৫ কবি অক্ষয়কুমার বড়াল জন্মশতবর্ষ উৎসবে সভাপতি হতে অনুরোধ পত্র পাঠানো হয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের তৎকালীন সভাপতির স্বাক্ষরে

কবিকে১ ভক্তি শ্রদ্ধা করি। অভিরূপ ভূয়িষ্ঠ পরিষদে যদি কিছু বলিতে হয় নির্বোধের মত বলিলে তো চলিবেনা একবার কবিবরের গ্রন্থরাজি পুনরায় পড়িয়া লইব মনে করিতেছি। ছাত্রাবস্থায় পড়া আর এখন পড়া একটু পৃথক। তুমি অনুগ্রহ করে তাঁর সম্বন্ধে যা জানো আমাকে সত্বর লিখিয়া পাঠাইবে যেন বলিতে গিয়া অপ্রস্তুত না হই। কালিদাসের প্রচুর পড়াশুনা আমি সে তুলনায় মূর্খ। তুমি সব জানাইবে তাঁর সম্বন্ধে কে ভাল ভাবে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন তাহা পড়িতে চাই জানিতে চাই।

আমি ১লা কলিকাতা যাইব তার আগে কোগ্রামের ঠিকানায় আমাকে বিষয়টি জানাইবে। তোমাদের মধ্যে থাকিতে পারিলে তো সুখী হই। তবে যেন ভগবান বাঞ্ছা পূর্ণ করেন। ইতি

স্নেহধন্য

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

৫৩) লেফাফাপত্র

শ্রীহরি শরণং

কোগ্রাম

২১।৪।৬০ [ইং]

প্রিয়বরেষু

তোমার কাছ থেকে নিরাপদে বাড়ী পঁহুছিয়াছি। ২ দিন খুব ঘুরে এলাম। বৈঞ্চবচকে সাহিত্য সন্মিলনে[২] তুমি গিয়েছিলে কি? আশা করি সব কুশল। এসে শরীর তত ভাল ছিল না।

তোমার 'আকাশ পিপাসা' পড়লাম ভাল লাগলো, সুদূরের পিয়াসা কবিতাগুলিকে মনোজ্ঞ করিয়াছে প্রচ্ছদপট সুন্দর ছাপা কাগজ সুন্দর। সব সুন্দর।

মধ্যে মধ্যে কুশল সংবাদ দিবে। ইতি

স্নেহধন্য

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

৫৪) লেফাফাপত্র

শ্রীহরি শরণং

কোগ্রাম

১৩।৬।৬০ [ইং]

প্রিয়বরেষু

তোমার চিঠি পাইয়া খুব আনন্দিত হইলাম। কবিবর অক্ষয়কুমারের১ আমি অনুরাগী ভক্ত, তাঁর জন্মশতবার্ষিকী পালিত না হওয়া আমাদের পূজ্যপূজা ব্যতিক্রম করা হইবে। সজনীকান্ত কেবল কবি ও বড় মনীষী নহে সে কথনো পূজ্যপূজা ব্যতিক্রম করে না। তাহার এই শ্রদ্ধা ভক্তির তুলনা

১ কবি অক্ষয়কুমার বড়াল

২ মেদিনীপুরে বৈষ্ণবচকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের নবপর্যায়ের প্রথম অধিবেশন

নাই। আমিও ঐ ব্যতিক্রমে বড় কষ্ট পাই। আমার শক্তি কম, কাজেই চুপ করিয়া থাকি মনে মনে তাঁদিকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করি প্রণাম করি। এই কবিবরের জন্মবার্ষিকী হবে জেনে বড় সুখী হইলাম।

আমার পড়াশুনা কম, সজনীকান্ত সভাপতি হইলেই ভাল হয়। আমি নিশ্চয়ই যাইব এবং সভাতে কিছু বলিব, যদিও বলার শক্তি নাই। কালিদাস নিশ্চয়ই যাবে তার যাওয়া উচিত। রবীন্দ্রনাথ দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমার গোবিন্দচন্দ্র দাস এঁদের আমরা শিষ্য। এঁদের সম্মান দিয়া নিজেরাই ধন্য হব।

আমার কাব্যসংকলন যদি বাহির করিতে হয় কে Edit করবেন তাই ভাবি। কালিদাস তো একটা সংকলন করেছেন। অন্যলোক কে আছে। রথীন রায় মহাশয়ের লেখা আমার ভাল লাগে তিনি রাজি হবেন কি? রথীন তুমি এবং তোমাদের পছন্দ মত আর একজনকে লইয়া ঠিক করিবে কি? তোমার মত জানিতে চাই।

উপেন দাদার জন্য একটী কবিতা অপর পৃষ্ঠায় পাঠাইলাম। বড় ব্যস্ত তাই তাড়াতাড়ি এই কবিতাটি লিখিয়া দিলাম। লইবে।[১]

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিয়োগে।

চিররস-নিস্যন্দী-প্রতিভা জানে নাক কভু ক্ষয়—
বয়সে কমে নি আনন্দ তব—সদা আনন্দময়।
গুণী গুণজ্ঞ রসিক মনীষী সবাকার আত্মীয়
হে অমৃত পথযাত্রী সুহৃদ প্রণাম আমার নিয়ো।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

মধ্যে মধ্যে কুশল সংবাদদানে সুখী করিবে। ইতি

স্নেহধন্য
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

৫৫) লেফাফাপত্র

শ্রীহরি শরণং

কোগ্রাম
১।৮।৬০ [ইং]

ভাই রমেন,

তোমার পত্র পাইলাম, আমি এখনো বড় দুর্ব্বল, কলিকাতা যাওয়া সম্ভব হইবে না। তোমরা আমাকে যে সংবর্ধনা দিতে চাহিয়াছ তাহা এখন অকারণ এবং উহাতে আমি সঙ্কোচ বোধ করিতেছি। বাঙালীর আজ বড় দুর্দ্দিন আসামে বাঙালীদের উপর যে নির্য্যাতন ও লাঞ্ছনা হইয়াছে তাহার তুলনা নাই।

তোমরা আমার সংবর্ধনার জন্য যদি কিছু সংগ্রহ করিয়া থাক, আসামের

১ উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় স্মারক গ্রন্থের জন্যে

উৎপীড়িত ও ক্ষতিগ্রস্থ বাঙালীদের জন্য দান করিলে আমি অধিক সুখী ও পরিতৃপ্ত হইব। তোমাদের ভালবাসাই আমার শ্রেষ্ঠ সংবর্ধনা। ইতি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

৫৬) লেক.ফাপত্র [:৫.৯.৬০]

শ্রীহরি শরণং

কোগ্রাম
২৯।৫।৬৭

প্রিয় রমেন্দ্র

তোমার পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। আমি এবার অনেকদিন ধরিয়া ভুগিয়াছি এখনো সারিয়া উঠিতে পারি নাই। কলিকাতা যাওয়া এখন সম্ভব হইবে না। শ্রীমান জ্যোৎস্নাও একবার যাইতে লিখিয়াছিল কিন্তু তাহাকেও এই কথাই লিখিলাম।

তোমাদের সঙ্গে মিলিবার আমার আকাঙ্ক্ষা একান্ত কিন্তু স্বাস্থ্যে কুলাইতেছে না। সমস্ত কথাসাহিত্যিক কবি ও সমাগত সুধীবৃন্দকে আমার কথা বলিবে আমি ত্রুটি মার্জ্জনা চাহিতেছি।

সকলের সঙ্গে দেখা করিবার এমন সুযোগ বারবার হারাইতে হইতেছে। আশা করি তোমার সব কুশল। ইতি

স্নেহের
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

৫৭) আন্তর্দেশীপত্র [৬.১০.৬০]

শ্রীহরি শরণং

কোগ্রাম
২০।৬।৬৭

প্রিয়বরেষু

চিঠি পাইয়া আনন্দিত হইলাম আমার শ্রীশ্রী৺বিজয়ার আলিঙ্গন আশীর্ব্বাদ ও ভালবাসা জানিবে। দীর্ঘজীবী আরও যশস্বী ও নিরাময় হও।

সাহিত্যতীর্থে অধিবেশনের সংবাদ পাইয়া সুখী হইলাম। তুমি একটী প্রতিষ্ঠানকে নিজ চেষ্টায় ও আগ্রহে বড় করিয়া তুলিতেছ। আমি না যাইতে পারায় লজ্জিত। সমবেত সাহিত্যিকগণের নিকট তজ্জন্য আগেই ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছি ও করিতেছি। এবার বন্যা অধিক হয় নাই। তবে আমি খুব ভুগিয়াছি। তোমার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি কামনা করিতেছি। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

সুখী হও, সব শুভ হোক

৫৮) পোষ্টকাড [২২.১১.৬০]

শ্রীহরি শরণং কোগ্রাম
২.৮।৬১

প্রিয়বরেষু

তোমার চিঠি পাইয়া প্রত্যয়িত হইলাম। আমি এখনো ঠিক সারিতে পারি নাই। যদি ভাল থাকি শুভ বৈশাখে যাইব তোমাদের অধিবেশনে। একটী প্রবন্ধ লিখিয়া দিব। পরিচারিকায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখার একটী বিবরণ প্রায় ত্রিশ বৎসর আগে দিয়াছিলাম, তাহা কাছে নাই তবে একটী লিখিয়া দিব।

তোমার চিঠি পেলেই আমি উত্তর দিই জানিবে। কেন পাও নাই বলিতে পারিনে। আমি ৩০শে নভেম্বর কলিকাতা যাইতে পারি আমার বড় নাতি[১] F.R.C.S. পড়িতে বিলাত যাইতেছে তাই আশীর্ব্বাদ দিবার জন্য কলিকাতা গেলে তোমাকে টেলিফোন করিব। আশা করি কুশলে আছ। ইতি

স্নেহধন্য
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

৫৯) পোষ্টকার্ড

শ্রীহরি শরণং কোগ্রাম
২৭।১।৬১ [ইং]

প্রিয়বরেষু

তোমার চিঠি পাইয়া আনন্দিত হইলাম। আমি কুচবিহার হইতে প্রকাশিত রাণীর সম্পাদিত "পরিচারিকা" পত্রিকায় যে প্রবন্ধটি লিখি, তারিখ সন মনে নাই। আমি একটী প্রবন্ধ শীঘ্রই তোমার কাগজের জন্য লিখিয়া পাঠাইতেছি, যদি সেটি (পরিচারিকায়) প্রবন্ধ পাও ভালই নতুবা যেটি পাঠাইব সেইটীই ছাপিও, আজই আরম্ভ করিব ৪।৫ দিনের মধ্যেই পাঠাইব। আশা করি সব কুশল। ইতি

স্নেহধন্য
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

৬০) পোষ্টকার্ড

শ্রীহরি শরণং কোগ্রাম
৫।৪।৬১ [ইং]

প্রিয়বরেষু

চিঠি পেয়ে বড়ই আনন্দিত হইলাম। রবীন্দ্র স্নেহ কণিকা[২] তোমাদের

১ শ্রীজ্যোৎস্নানাথ মল্লিকের জ্যেষ্ঠপুত্র

২ সাহিত্যতীর্থ ১৩৬৮ অষ্টম বার্ষিকী রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

ভাল লেগেছে জেনে সুখী হয়েছি। যদি সম্ভব হয় উহার ছাপা প্রবন্ধটির অনুগ্রহ করে এক কাপি মাত্র পাতা দুটী পাঠালে উপকৃত হবো। একটু দরকার আছে। ১লা শুভ বৈশাখে যাইবার ইচ্ছা আছে তবে প্রতিবন্ধক অনেক। ১লা বাড়ীতে দেবার্চ্চনা প্রভৃতি হয়। তবে চেষ্টা করিব। তোমাদের স্নেহ ভালবাসা আমার জীবনের একটা সম্পদ। আশা করি সব মঙ্গল। ইতি

স্নেহধন্য
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

৬১) পোষ্টকার্ড [২৪. ৪. ৬১]

শ্রীহরি শরণং

কোগ্রাম
১৩।১।৬৮

প্রিয়বরেষু

তোমার চিঠি পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। আমি বাধ্য হইয়া একটু কাজে দূরে গিয়াছিলাম। পত্র লিখিতে পারি নাই। বড়ই লজ্জিত আছি। তোমরা আমাকে কত ভালবাস তাই ভাবি আর ভগবানের কাছে তোমাদের দীর্ঘজীবন ও উন্নতি কামনা করি। প্রবন্ধটি[১] তুমিই লেখাইয়াছ, আমি সাধারণতঃ প্রবন্ধ লিখিতে ভয় পাই। ইহার পর আর একটী লিখিয়া দিব। তোমার সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল প্রার্থনা করি। ইতি

স্নেহধন্য
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

৬২) পোষ্টকার্ড

শ্রীহরি শরণং

কোগ্রাম
২৪।১০।৬১ [ইং]

ভাই রমেন,

আমার শ্রীশ্রী৺বিজয়ার আশীর্ব্বাদ আলিঙ্গন ও ভালবাসা গ্রহণ কর। ২৩শে ডিসেম্বর তুমি যখন বলিতেছ তখন যাইব। শ্রীভগবান যেন শরীর ভাল রাখেন। তোমার দীর্ঘজীবন শান্তিময় কীর্ত্তিঘন জীবন কামনা করি। ইতি

আঃ
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১ 'রবীন্দ্র-স্নেহকণিকা' রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষ সংখ্যা ১৩৬৮ অষ্টম বার্ষিকী 'সাহিত্যতীর্থ' দ্রষ্টব্য

৬৩) পোষ্টকার্ড

শ্রীহরি শরণং কোগ্রাম
৮।৪।৬২ [ইং]

ভাই রমেন্দ্রনাথ

তোমার চিঠি পেয়ে বড়ই আনন্দিত হইলাম। ঐ তারিখে ভাই আমার যাওয়া সম্ভব হবে না। সকলকে দেখবার অমন সুযোগ আমাকে প্রতি বছরই প্রায় হারাতে হয়। তুমি যে ব্যবস্থা করবে তাতেই আমি সম্মত। আরম্ভ শুভ হোক আমি সর্ব্বদাই ঐ প্রতিষ্ঠানটির শুভ কামনা করি। যে সব কবি সাহিত্যিক আসেন তাঁদের সম্বর্দ্ধনায় আমার থাকা উচিত; তাঁরা নিজগুণে যেন আমার এ ত্রুটি মার্জ্জনা করেন। আমি করজোড়ে প্রার্থনা করিতেছি।

তুমি শ্রীমান জ্যোৎস্নার সঙ্গে দেখা করবে, তোমায় আমার ছেলেরা খুবই ভালবাসেন এবং আত্মীয়ের ন্যায় ভাবেন। তোমাকে পরিচয় পত্র কি দিব? আশা করি তোমার সব কুশল। আমি ভাল আছি। মধ্যে মধ্যে কুশল সংবাদ দিবে। ইতি শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

৬৪) পোষ্টকার্ড

শ্রীহরি শরণং কোগ্রাম
১৭।৭।৬২ [ইং]

ভাই রমেন্দ্র

তোমার চিঠি পেয়ে বড়ই আনন্দিত হইলাম। আমি অসুস্থ। সেইজন্য প্রবন্ধ লিখিবার সময় ও শক্তি নাই; সেইজন্য লিখিব লিখিব করিয়া পাঠাইতে পারি নাই। যদি দরকার হয় একটি কবিতা পাঠাইয়া দিব। তোমার সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল কামনা করি। ইতি শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

৬৫) পোষ্টকার্ড

শ্রীহরি শরণং কোগ্রাম
১৬।১১।৬২ [ইং]

প্রিয়বরেষু

তোমার প্রেরিত তোমার শ্রীমতী বৌদিদি[1] শ্রীশ্রী৺মা মঙ্গলচণ্ডীর পূজার জন্য যে ৫ টাকা দিয়াছেন তাহা পাইলাম। পূজারিকে বলিয়াছি, শুভদিনে পূজা দিয়া নির্মাল্য তোমার কাছে তাঁর জন্য পাঠাইয়া দিবেন।

১ শ্রীযুক্তা কল্পনা মল্লিক

আমি কলিকাতায় গিয়া বেশ ভাল ছিলাম। কিন্তু বড় দুর্ব্বল বোধ করিতেছিলাম বলিয়া বাহির হইতে পারি নাই। আশা করি কুশলে আছ। ইতি
শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

৬৬) লেফাফাপত্র [১৯৬২]

ভাই রমেন্দ্র,

এই কবিতাটি[১] সাহিত্যতীর্থের জন্যে পাঠাইলাম, যদি পছন্দ হয় লইব। ইতি
স্নেহধন্য
শ্রীকুমুদরঞ্জন

৬৭) পোষ্টকার্ড

শ্রীহরি শরণং
কোগ্রাম
৫।১।৬৩ [ইং]

প্রিয়বরেষু

চিঠি পাইলাম, শরীর বড় দুর্ব্বল সভায় উপস্থিত হইতে পারিলাম না তজ্জন্য দুঃখিত। বিবাহের সংবাদে বড় সুখী হইয়াছি। শুভ দিনে শ্রীশ্রীঙমা মঙ্গলচণ্ডী মাতার সিন্দুর পঁহুছিয়াছে। ইহা খুবই সুলক্ষণ, নববধূ[২] ভাগ্যবতী হইবেন। তোমার মত সরল সুন্দর চরিত্রের অমায়িক যুবকের জীবন ধন্য পুণ্য হোক। দাম্পত্য জীবন মধুময় শান্তিময় শুচি সুন্দর হোক। বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। ইতি
শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

৬৮) পোষ্টকার্ড

শ্রীহরি শরণং
কোগ্রাম
২৫।৭।৬৩ [ইং]

প্রিয়বরেষু

চিঠি পাইয়া আনন্দিত হইলাম। একটী প্রবন্ধ স্মৃতিচিত্র দিব মনে করিতেছি। তারাশঙ্করের বাড়ী[৩] সাহিত্যতীর্থ বার্ষিক সভা হইলে, নিশ্চয়ই যাইব। তবে যদি শরীর ভাল থাকে। এখন তো বয়স হইয়াছে কবে ভাল থাকি অসুস্থ হই ঠিক নাই।

কোগ্রামে যে সময়ে আমার জন্ম বার্ষিকীর সভা হইবার আয়োজন হইয়াছিল কিন্তু আমি হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ি এবং দীর্ঘকাল ভুগিয়াছি এবং এখানে স্থানেরও বেশ সুবিধা করিতে পারি নাই।

তোমার চিঠি অনেক দিন পাই নাই। আশা করি সব কুশল। ইতি
স্নেহধন্য
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১ তীর্থ। 'সাহিত্যতীর্থ' ১৩৬৯ নবম বার্ষিকী দ্রষ্টব্য

২ শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মল্লিক ৩ জন্মস্থান বীরভূমের লাভপুরে

৬৯) লেফাফাপত্র [১৯৬৩]

ভাই রমেন্দ্র

চিঠি পাইয়া সুখী হইলাম। স্মৃতিচিত্র লিখিবার অবসর হইল না, তাই কবিতাটি[১] পাঠাইলাম। পছন্দ হইলে নিয়ো। ভাই কার্ত্তিক মাসে পুজা এখন যাওয়া সম্ভব হইবে না ক্ষমা করো। ২২শে ২৩শে সেপ্টেম্বর কলিকাতা যেতে পারি গেলে জানাইব। ইতি

স্নেহধন্য

শ্রীকুমুদরঞ্জন

৭০) লেফাফাপত্র

শ্রীহরি শরণং

কোগ্রাম

৪ঠা নভেম্বর। ১৩৬৩

প্রিয়বরেষু,

তোমার চিঠি পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। আমার শ্রীশ্রী৺ বিজয়ার আশীর্ব্বাদ আলিঙ্গন ও ভালবাসা গ্রহণ কর। আমি কলিকাতা ২।৩ দিন ছিলাম, বৃষ্টি ও ধর্ম্মঘটের মধ্যে সেইজন্য সংবাদ দিই নাই। এবার যখন যাইব নিশ্চয়ই দেখা করিব।

ভাই কবিতাটি[১]যার cutting দিয়াছ বহু ভুল ও ছন্দপতনে পরিপূর্ণ, বোধহয় প্রুফ এবার তুমি দেখ নাই। কালীকিঙ্কর বাবুর কবিতাটি বড়ই সুন্দর হইয়াছে যদিও উহা পাইবার যোগ্য পাত্র আমি নহি।

তোমার ভালবাসা সুদীর্ঘকাল পাইতেছি। তুমি দীর্ঘজীবী আরও যশস্বী ও সর্ব্বরকমে বড় হও। কালীকিঙ্কর বাবুকে আমার গভীর ভালবাসা ও বহু আশীর্ব্বাদ পাঠাইয়া দিবে। তোমার জন্য বড়ই মন কেমন করে। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

৭১) পোষ্টকার্ড

শ্রীহরি শরণং

কোগ্রাম

২৮।৩।৬৪ [ইং]

কল্যাণবরেষু

চিঠি পাইয়া আনন্দিত হইলাম। শ্রীমতী বধুমাতাকে দেখি নাই। তাঁকে দেখিতে ইচ্ছা হয়। সকল সময়ই তোমাদের উভয়ের কল্যাণ ও বিপুল শ্রীর আকাঙ্ক্ষা করি।

আমি এবার ১৪ই এপ্রিল[২] তোমার ওখানে যাইব। ১৩ই কলানবগ্রাম

১ টডের রাজস্থান ও রাজস্থানের টড্। 'সাহিত্যতীর্থ' ১৩৭০ দশম বার্ষিকী দ্রষ্টব্য। এতে ৫ম ছত্রে 'অনেক', ৬ষ্ঠ ছত্রে 'জানি', ৭ম ছত্রে 'মরুর' ও ১৪শ ছত্রে 'দাল' শব্দের ছাড় যায়

২ সাহিত্যতীর্থ একাদশ বর্ষে নববর্ষ বরণোৎসব

শিক্ষা নিকেতনে যাইব, সেখান হইতে কলিকাতা যাইব। বহুদিন তোমাদের সঙ্গে দেখা হয় নাই, শরীর সুস্থ না থাকায় কোথায় যাইতে পারি নাই। শ্রীভগবানের কৃপায় যেন ইচ্ছা পূর্ণ হয়। শ্রীমতী বৌমাকে আমার আশীর্ব্বাদ দিলাম। শ্রীশ্রী৺ মা মঙ্গলচণ্ডীকে দেখিতে তিনি যেন একবার আসেন। এ গ্রাম বড় তীর্থ ও মহাপীঠ। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

৭২) লেফাফাপত্র ।১৬.৪.৬৪

শ্রীহরি শরণং — কোগ্রাম
১।১।৭১

প্রিয়বরেষু

আমি এখানে ছোট বৌমার[২] অসুখের জন্য বর্দ্ধমান হইতে ফিরিয়া আসিলাম। সাহিত্যতীর্থে যাওয়া হইল না। তজ্জন্য বড়ই দুঃখিত।

নববর্ষের শ্রীশ্রী৺ মা মঙ্গলচণ্ডীর আশীর্ব্বাদী নির্ম্মাল্য শ্রীমতী বধূমাতার জন্য এই সঙ্গে পাঠাইলাম উভয়ে লইবেন। বাঙ্গলা নববর্ষ সকল রকমে আপনাদের শুভ হউক। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

শ্রীমতী বৌমাকে পুনরায় আশীর্ব্বাদ জানাই। আপনাদের জীবন মধুময় আনন্দময় ও সৌভাগ্যময় হউক। ইতি

৭৩) লেফাফাপত্রে

শ্রীহরি শরণং — কোগ্রাম
৩০।৮।৬৪ [ইং]

প্রিয়বরেষু

চিঠি পাইয়া আহ্লাদিত হইলাম। এই সনেটটি[১] পাঠাইলাম। পছন্দ হইলে লইবে। আমার শরীর এখনো বেশ সুস্থ নয়। যাইতে পারিব কি না বলিতে পারিনে। দেখিবার খুবই ইচ্ছা হয়। আশা করি সব মঙ্গল। শ্রীমান জ্যোৎস্না ও বৌমার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল জানিয়া সুখী হইলাম। ইতি

স্নেহধন্য
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

শরীর ভালো থাকলে যাবার বড়ই ইচ্ছা রহিল।

১ কবির কনিষ্ঠপুত্র অধ্যাপক শ্রীকৌশাম্বীনাথ মল্লিকের স্ত্রী

২ সুরশিল্পী। 'সাহিত্যতীর্থ' ১৩৭১ একাদশ বার্ষিকী দ্রষ্টব্য

৭৪) লেফাফাপত্র

শ্রীহরি শরণং কোগ্রাম

২.১১.৬৪ [ইং]

প্রিয়বরেষু,

আমি গুরুতর অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলাম শ্রীশ্রী পূজার সময় সকলে বাড়ী আসিয়াছিলেন কিন্তু আমি সে আনন্দ সম্পূর্ণ উপভোগ করিতে পারি নাই। এখন একটু সুস্থ আছি।

আমার শ্রীশ্রী৺ বিজয়ার আলিঙ্গন শুভেচ্ছা ও ভালবাসা গ্রহণ কর। দীর্ঘজীবী যশস্বী ও নিরাময় হও।

আমি যাইতে পারি নাই অসুস্থতার জন্য। তুমিই তো সব কর, আমি নাম মাত্র। আমাকে তুমিই খাড়া করিয়া রাখিয়াছ, তোমার শ্রদ্ধা ভক্তি ভালবাসা আমি সুদীর্ঘকাল ভোগ করিতেছি।

সভার সব বিবরণ পড়িয়া সুখী হইলাম। সাহিত্যতীর্থ পত্রিকা এখনো বোধহয় বাহির হয় নাই, পাই নাই। cutting পাইলাম। আশা করি সব মঙ্গল। ইতি স্নেহধন্য

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

৭৫) আন্তর্দেশীপত্র

শ্রীহরি শরণং কোগ্রাম

৭।৩।৬৫ [ইং]

প্রিয়বরেষু

তোমার চিঠি, শুভেচ্ছা ও ভক্তিপূর্ণ আনন্দ পাইয়া সুখী হইলাম। সুদীর্ঘকাল তোমার ভালবাসার অধিকারী হইয়া ধন্য হইয়াছি। তোমার সুদীর্ঘ কর্ম্মময় আনন্দময় জীবন ও সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি প্রার্থনা করি।

আমি ঐ দুই তারিখে[১] নিশ্চয়ই শরীর ভাল থাকিলে যাইব এবং তোমাদের সঙ্গে যোগ দিয়া কৃতার্থ হইব। আমি সাহিত্যতীর্থকে ভালবাসি। একটা প্রবন্ধ যত সত্বর পারি পাঠাইব। ইতি শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

৭৬) লেফাফাপত্র

শ্রীহরি শরণং কোগ্রাম

৯।৪।৬৫ [ইং]

প্রিয় রমেন্দ্রনাথ,

তোমার ছাপা চিঠি পাইয়া পরম প্রীত হইলাম। শ্রীমান তারাশঙ্কর শ্রীযুক্ত সুনীতি কুমার বাবু[২], মাননীয় সত্যেন্দ্রনাথ বাবু[৩] উৎসবে যোগদান

১ সাহিত্যতীর্থ যুগজয়ন্তী উৎসব। পয়লা বৈশাখ ১৩৭২

২ ভাষাচার্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ৩ বিজ্ঞানাচার্য শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু

করিবেন। হিরণ্ময় বাবু[১] যুগজয়ন্তী উৎসবের সভাপতি এমন সুময় কবা তোমার বাহাদুরী ও কৃতিত্ব তাহাতে সন্দেহ নাই। আমার শরীর উপস্থিত থাকিবার যোগ্য নাই। তাই দূর হইতে তাঁহাদিগকে আহ্বান সমাদর ও আলিঙ্গন করিয়া ধন্য হইতেছি। আমার কথা তাঁহাদিগকে জানাইবে এবং আমার ক্ষমা ভিক্ষার কথা বলিবে। ইতি

স্নেহধন্য শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

৭৭) পোষ্টকার্ড

শ্রীহরি শরণং

কোগ্রাম
১৬।৭।৬৫ [ইং]

প্রিয়বরেষু

চিঠি পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। শ্রীমান তারাশঙ্করের জন্মজয়ন্তী ও সম্বর্ধনায় আমি নিশ্চয় যাইব। একটী কবিতা শীঘ্রই পাঠাইতেছি। একটী ভাল কাজে হাত দিয়াছ। শ্রীভগবানের কৃপায় যেন আমি সুস্থ থাকি এবং সভায় উপস্থিত হইতে পারি। ইতি

স্নেহধন্য
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

৭৮) পোষ্টকার্ড

শ্রীহরি শরণং

কোগ্রাম
২৫।৭।৬৫ [ইং]

প্রিয়বরেষু

চিঠি পাইয়া আনন্দিত হইলাম। এখানে কাগজে দেখিলাম তারাশঙ্করের সম্বর্দ্ধনা হইয়া গিয়াছে। ভাল হইয়াছে। এখন আর যাইব না সময়ান্তরে যাইব। কয়েকটি অতিথি আসিয়াছেন এখন বাড়ী ছাড়িয়া যাওয়া উপযুক্ত হইবে না। শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় আই, সি, এস অতি উদার ও মহৎ লোক, তিনি জয়ন্তী উৎসবের সভাপতি হওয়ায় সাহিত্যতীর্থের গৌরব বৃদ্ধি হইল। ইতি

স্নেহধন্য
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

৭৯) লেফাফাপত্র

শ্রীহরি শরণং

কোগ্রাম
১০।১০।৬৫ [ইং]

প্রিয়বরেষু

আমার শ্রীশ্রী৺বিজয়ার আলিঙ্গন আশীর্ব্বাদ ও গভীর ভালবাসা গ্রহণ কর। সর্ব্বারিষ্ট প্রশমন হোক সর্ব্বাভিষ্ট পূর্ণ হউক। শরীর তত ভাল নাই। পূজার মধ্যেই অসুস্থ হইয়া পড়িয়া ছিলেম। তারকবাবুর[২] বিয়োগে

১ উপাচার্য শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

২ তারকনাথ রায়

বড়ই ব্যথিত আছি। তিনি আমার অগ্রজতুল্য বন্ধু ছিলেন। তিনি বড় দার্শনিক ছিলেন। নামজাদা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও রায় বাহাদুর ছিলেন, আমার সঙ্গে তাঁর ৫২ বৎসরের বন্ধুত্বে ছেদ পড়িল।

সাহিত্যতীর্থকে তুমি বড় করিতেছ, তোমার নিষ্কলঙ্ক অনিন্দ্য সুন্দর চরিত্রের আমি গৌরব করি। দীর্ঘজীবী যশস্বী হও। ইতি শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

৮০) আন্তর্দেশীপত্র

শ্রীহরি শরণং কোগ্রাম

২৮।৩।৬৬ [ইং]

প্রিয়বরেষু

তোমার চিঠি পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। সস্ত্রীক সব হিন্দুতীর্থ ঘুরিয়া আসিয়াছ জানিয়া পরম প্রীত হইলাম।

সাহিত্যতীর্থ তোমার চেষ্টাতেই দিন দিন উন্নতি লাভ করিতেছে। আমি তো আছি নাম মাত্র। আমি সাধারণতঃ এখন যাইতেই পারিনা, তবে সাহিত্যতীর্থের শুভকামনা আমার সর্ব্বদাই মনে জাগরুক। শ্রীযুক্ত হিরণ্ময়বাবু গুণী লোক মহৎলোক তিনিই তীর্থপতি হইবার একান্ত যোগ্য ব্যক্তি।

আমি যাইবার জন্য চেষ্টা করিব। যদি শরীর ভাল থাকে। আমাকে সম্বর্দ্ধনা দিবার ইচ্ছা করিয়াছ কিন্তু আমি উহাতে লজ্জা বোধ করিতেছি। আমি উহার যোগ্য কিনা ভাবিতেছি।

তোমাদের সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল কামনা করি। শুভ বৈশাখের ২।৩ দিন আগেই যাইবার চেষ্টা করিব। একবার সবার জন্য দেখা করিবার ইচ্ছা যে—আর তো সময় হইয়া আসিতেছে। ইতি স্নেহধন্য

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

৮১) পোষ্টকার্ড

শ্রীহরি শরণং কোগ্রাম

২১।৭।৬৬ [ইং]

ভাই রমেন,

আমি চোখের পীড়ায় ভুগিতেছি। লেখা পড়ার কাজ প্রায় বন্ধ। শ্রীমান নরেন দেবকে সম্বর্দ্ধনা দেওয়ায় বড়ই আনন্দিত হইলাম। শ্রীমান বনফুলকেও সম্বর্দ্ধনা দেওয়া বড়ই সুন্দর হইয়াছে। আহ্লাদিত হইলাম খুবই। আশা করি সব কুশল। ইতি স্নেহধন্য

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

৮২) পোষ্টকার্ড[১]

শ্রীহরি শরণং　　　　　　　　　　কোগ্রাম

১.১১.৬৬ [ইং]

কল্যাণবরেষু,

ভাই রমেন তুমি আমার শ্রীশ্রী৺ বিজয়ার আলিঙ্গন ও আশীর্বাদ জানিবে। দীর্ঘজীবি ও আরো যশস্বী হও। কুলপ্রদীপ হও। আমি চোখের পীড়ায় ভুগিতেছি। লেখাপড়া প্রায় বন্ধ। তোমার সর্বাঙ্গীণ কুশল ও উন্নতি প্রার্থনা করি। ইতি　　　　　　　　　　শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

৮৩) লেফাফাপত্র

শ্রীহরি শরণং　　　　　　　　　　কোগ্রাম

১২।৪।৬৭ [ইং]

প্রিয়বরেষু

চিঠি পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। শ্রীমান কালিদাস রায় কবিশেখরকে সম্বর্দ্ধনা দেওয়া সাহিত্যতীর্থের পক্ষে বড়ই সমীচীন ও মহৎ কার্য্য হইতেছে। আমার উপস্থিত থাকা একান্ত কর্ত্তব্য ছিল, উহাতে আমি গৌরব বোধ করি। কিন্তু এত শীঘ্র যাওয়া সম্ভব হইবে না। উপস্থিত সব কবি ও সাহিত্যিক বন্ধুদিগকে আমি তজ্জন্য ক্ষমা ভিক্ষা চাহিতেছি। মনে আমি সেখানে উপস্থিত থাকিব।

প্রবাসীতে একটী সুন্দর কবিতা কবিশেখরের উপর কয়েক বৎসর আগে লিখিয়াছিলাম[২] যদি সন্ধান করিতে পার সেটি পাঠ করিলে কৃতার্থ হইব। ইতি　　　　　　　　　　শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১ পত্রটির হস্তাক্ষর অপরের নিচের স্বাক্ষরটি কবির স্বহস্তের

২ "কবিশেখরের" প্রতি শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

সত্য বটে বদলে গেছ, অনেকখানি বদলে গেছ—
তবু পাণ্ডু চন্দ্রিকাতে হে সুধাকর ভালই আছ।
আমি নূতন দেউল চেয়ে—　ভালবাসি প্রাচীন যে হে,
মন্দিরই আজ দেবতা হয়ে মহিমাতে বেশ বিরাজো।

২

কেটে গেছে অভিনবের অভিনয়ের উজল পালা—
টাট্‌কা না হও—খুলনবাতের তুমি বাসি গুঞ্জমালা।
নিবেদিত ঐ প্রসাদী　মালার আমি কৃপাই সাধি'
জয়মালা আজ জপমালা—পুণ্য প্রভায় কুঞ্জ আলা।

৮৪) লেফাফাপত্র [১৩. ৭. ৬৭]

প্রিয়বরেষু

শ্রীমান রমেন্দ্র ভাই সাহিত্যতীর্থের জন্য এই কবিতাটি৩ পাঠাইলাম। উপযুক্ত বিবেচনা করিলে ছাপিবে। আশীর্ব্বাদ জানিবে। নিরাময় ও নিরাপদ থাকো আমি তো আর অকর্ম্মণ্য হইয়াছি। নূতন তীর্থপতি শ্রীযুক্ত হিরণ্ময়- বাবুকেই করিলে সুখী হইব। ইতি শুভাকাঙ্খী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

২৮।৩।৭৪

৮৫) আন্তর্দেশীপত্র [২৭.১০.৬৭]

শ্রীহরি শরণং

কোগ্রাম

৭।৭।৭৪

প্রিয়বরেষু

তোমার চিঠি পেয়ে বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম। আমার শ্রীশ্রী৺ শুভ বিজয়ার আলিঙ্গন আশীর্ব্বাদ ও ভালবাসা গ্রহণ করিবে। দীর্ঘজীবী নিরাময় নিরাপদ হইয়া পরম সুখে থাকো। আমাকে এতই ভালবাস যে এখনো সাহিত্যতীর্থের President রেখেছ। তোমার তুলনা হয় না। যদি পারি, কলিকাতা গেলে একদিন সাহিত্যতীর্থে যাইব। তোমার একান্ত চেষ্টাতেই সাহিত্যতীর্থ মহিমাময় হইয়াছে। তোমার সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল প্রার্থনা করি। ইতি স্নেহধন্য

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

সাহিত্যতীর্থের কবিতাটি পাইলাম। ইতি

৩

যুগের রসের কস লেগেছে, বল্‌ছি তোমায় চুপে চুপে—
রূপ গিয়ে যে ধীরে ধীরে মিশছে আহা অপরূপে।
আঁধার এখন, হয়ে ভূষা—, গড়ছে তোমার 'কেন্দ্র উষা'—
ভাব-দেহ যে যায় মিলায়ে আনন্দ সৎ-চিৎ-স্বরূপে।

৪

সুদীন বেশে দাঁড়িয়ে আছ, বিশ্বজিতের অবসানে
হোমের ধূমে খিন্ন তনু, দেখে সবাই ধন্য মানে।
সাধকের ওই জীর্ণ দেহ— জাগায় জগন্মাতার স্নেহ,
দেন কপালে হলুদ ফোঁটা, আশীষ করেন দূর্বাধানে।

(প্রবাসী। পৌষ ১৩৬৮। ৪৩৪ পৃষ্ঠা)

৩ 'সাহিত্যতীর্থ' ১৩৭৪ চতুর্দশবার্ষিকী দ্রষ্টব্য

৮৬) লেফাফা°ন্ন

শ্রীহরি শরণং কোগ্রাম

২০।২।৬৮ [ইং]

প্রিয়বরেষু

তুমি নার্সিংহোমে[১] ১৫ দিনের জন্য যাইতেছ জানিয়া আমি বড় চিন্তিত হইলাম। শীঘ্র নিরাময় ও নিরাপদ হইয়া ফিরে এসো। তোমার জন্য বড় মন কেমন করে। তুমি দীর্ঘজীবী হও, তুমি তোমার উজ্জ্বল কুল উজ্জ্বলতর কর। তোমার জন্য আমি প্রার্থনা করি।

আমার জন্মদিনে যাহারা আসিবেন তাঁহারা পত্র দিয়েছেন ও দিতেছেন। আমি তোমাকে আসিবার জন্য লিখিব মনে করিতেছি এমন সময় তোমার চিঠি পাইয়া চিন্তিত হইলাম। শত বার এ বাড়ী আসিবে তোমাকে আমি বড়ই ভালবাসি। আবার লিখি দীর্ঘজীবী হও নিরাময় নিরাপদ হও। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

পুঃ আগামী কল্য ২১শে ফেব্রুয়ারী শান্তিনিকেতন হইতে অধ্যাপক অধ্যাপিকা ও ছাত্রে ছাত্রীতে ২১।২২ জন আমার বাড়ী আসিতেছেন লিখিয়াছেন।

৮৭) আন্তর্দেশীপত্র

শ্রীহরি শরণং কোগ্রাম

১০।৩।৬৮ [ইং]

সবিনয় নিবেদন,

ভাই তোমার চিঠিখানি পেয়ে বড়ই আনন্দ পেলাম। শান্তিনিকেতনের দল খুবই আনন্দ করে গিয়েছেন তাহারা ১৮ জন ছিলেন। এ তেসরা মার্চে প্রায় ৯০ নব্বই জন সাহিত্যিক আসিয়াছিলেন অধিকাংশই বর্দ্ধমান হইতে। কলিকাতা হইতেও ১০।১২ জন হইবে। ডাঃ মুরারী মোহন মুখার্জ্জি আসিয়াছিলেন তিনি যখন ছাত্র ছিলেন তখন (১৯২১ হিন্দু স্কুলের ছাত্র) আমার 'চণ্ডালী' কবিতা আবৃত্তি করিয়া recitationএ প্রথম Prize পান। সকলের অনুরোধে তিনি এখানে উৎসব সভায় সেটি পাঠ করেন। দুটি ৩টি প্রতিষ্ঠান হইতে মানপত্রাদি দেন। খুব সুষ্ঠু সুন্দর অনুষ্ঠান অধিকাংশই প্রফেসার ও সাহিত্যিক। তোমার উপস্থিতির কথা বারবার মনে হচ্ছিল। সেবার তারাশঙ্কর এসেছিলেন।

সাহিত্যতীর্থ তোমার কীর্ত্তি তোমার একান্ত চেষ্টাতেই উহার সাফল্য। আমি তো এখন অকর্ম্মণ্য এবার তোমরা শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় বাবুকে তীর্থপতি করিবে। তিনি যেমন গুণী তেমনি মহৎ, খুবই উপযুক্ততর লোক হইবেন।

১ শারীরিক কারণে কলকাতার হ্যারিংটন নার্সিংহোমে

তোমার শরীর ভাল আছে জেনে বড়ই আনন্দিত হইলাম। ইতি

স্নেহধন্য

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

৮৮) লেফাফাপত্র [২৫. ৭. ৬৮]

শ্রীহরি শরণং — কোগ্রাম

৯।৪।৭৫

প্রিয়বরেষু

ভাই রমেন্দ্র,

আমি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে তাঁর ৭৫তম জন্মদিবস উপলক্ষে আমার দুখানি[১] কাব্যগ্রন্থ উপহার দিতে চাই। তুমি শ্রীমান গজেন্দ্র মিত্রের নিকট হইতে মিত্র ও ঘোষ কোম্পানী ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা-১২ হইতে বই দুখানি লইয়া শ্রীযুক্ত সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী সম্পাদক মহাশয়কে দিবে। ইতি

শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক — আঃ

সাহিত্যতীর্থ কলিকাতা — শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

৮৯) লেফাফাপত্র

ভাই রমেন

তুমি সস্ত্রীক আমাকে দেখিতে আসায় উল্লসিত হইয়াছি। নিরাময় নিরাপদ ও উভয়ে পরম সুখী হও। শ্রীশ্রীমা মঙ্গলা তোমাদের সব অভিষ্ট পূর্ণ করুন। পূজার সাহিত্যতীর্থের জন্য এই কবিতাটি[২] পাঠাইলাম। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

২।৮।৬৮ [ইং]

৯০) আন্তর্দেশীপত্র

শ্রীহরি শরণং — কোগ্রাম

১৭।১০।৬৮ [ইং]

প্রিয়বরেষু

আমার শ্রীশ্রী৺ বিজয়ার আশীর্ব্বাদ আলিঙ্গন ও ভালবাসা জানিবে। দীর্ঘজীবী নিরাময় নিরাপদ হও। সাহিত্যতীর্থের এ নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়া আহ্লাদিত হইলাম। তুমি আমাকে কি ভালবাস তা প্রতি পত্রেই প্রমাণ পাই। সপরিবারে কুশলে শান্তিতে সুখে থাকো। ইতি — আঃ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক.

১ 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' ও 'কুমুদরঞ্জন কাব্যসম্ভার'

২ পূজা পূজার ব্যতিক্রম। 'সাহিত্যতীর্থ' ১৩৭৫ পঞ্চদশ বার্ষিকী দ্রষ্টব্য

৯১) আন্তর্দেশীপত্র [২৩.৮.৬৯]

কল্যাণবরেষু

এই কবিতাটি[১] পাঠাইলাম। উপযুক্ত বিবেচনা করিলে লইবে। তোমার চিঠি পেলে বড় আনন্দিত হই। দীর্ঘজীবী ও নিরাময় হও। তোমার সহধর্ম্মিণী ও তুমি আমার শতসহস্র আশীর্ব্বাদ জানিবে। তোমাদের গুণী সন্তান সন্ততি হোক, ইহাই প্রার্থনা করি। তোমাদিকে বড় আপনার লাগে। ইতি

আঃ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

৯২) পোষ্টকার্ড [২৯. ১০. ৬৯]

শ্রীহরি শরণং

কোগ্রাম

১০।৭।৭৬

প্রিয়বরেষু,

আমার শ্রীশ্রী৺ বিজয়ার আশীর্ব্বাদ জানিবে। বেনারস গিয়াছ জানিয়া বড় সুখী হইলাম। আমি ৪।৫ বার গিয়াছি তবু খেদ মিটে নাই এক অতি বড় তীর্থ।

এখানকার সব মঙ্গল। ইতি

আঃ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

৯৩) পোষ্টকার্ড

শ্রীহরি শরণং

কোগ্রাম

৬।৩।৭০ [ইং]

কল্যাণবরেষু

ভাই রামেন্দ্র তোমার চিঠি পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। পদ্মশ্রী পাওয়ায় তোমরা আনন্দিত হইয়াছ ইহাইতে আমি সুখী। উপাধির চেয়ে উহা বেশী মূল্যবান। বহুদিন তোমার চিঠি না পাইয়া চিন্তিত ছিলাম। এখানে ৩রা[২] ফাল্গুন জন্মদিনে উৎসবটি খুব মনোজ্ঞ হইয়াছিল। রাণীগঞ্জ কলেজ হইতে অনেকগুলি অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রী জয়দেব কেন্দুলী হইতে অনেকগুলি বন্ধু ও বিশিষ্ট লোক এসেছিলেন। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

৯৪) লেফাফাপত্র [১৫. ৮. ৭০]

কোগ্রাম

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

ভাই রমেন্দ্র,

১ • 'সাহিত্যতীর্থ' ১৩৭৬ ষোড়শ বার্ষিকী দ্রষ্টব্য   ২ জন্মতারিখ ১৯৮৮

কবিতাটি[১] এখনই লিখিয়া তোমাকে পাঠাইলাম প্রকাশ যোগ্য হইলে ছাপিবে। ইতি আঃ শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

৯৫) আন্তর্দেশীপত্র

শ্রীহরি শরণং কোগ্রাম ২৩।১১।৭০ [ইং].

কল্যাণবরেষু

শ্রীমান রমেন্দ্র তোমার আমার প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা ও ভক্তি স্নেহ দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছি, অভিভূত হইয়াছি। আমি এখন প্রায় অকর্ম্মণ্য, তুমি সব কাজ সাহিত্যতীর্থের করিয়াছ আমার নামটি রাখিয়াছ, আমি কি বলিয়া তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাইব বলিতে পারিনে। তুমি দীর্ঘজীবী হও যশস্বী হও আমাকে তীর্থপতি করিয়া তুমি আনন্দ পাও। আবার বলি তুমি দীর্ঘজীবী যশস্বী ও স্বনামধন্য হও। এবার কলিকাতা গেলে তোমার কাছে যাইব। সাহিত্যতীর্থেও যাইব। অগ্রহায়ণের শেষাশেষি যাইতে পারি। তোমার ভালবাসা ও ভক্তির জন্য বহু আশীর্ব্বাদ করিতেছি। শ্রীভগবান প্রসন্ন হউন। ইতি আঃ শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১ সাহিত্যতীর্থ। ১৩৭৭ সপ্তদশ বার্ষিকী 'সাহিত্যতীর্থ' দ্রষ্টব্য

জগতের যত সাহিত্যতীর্থে জানাই নমস্কার
করি ভূমিষ্ট প্রণাম—জীবন-সার্থক আজ আমার।
ভারতীর এ যে অমূল্য দান জুড়ায় তাপিত দেহমন প্রাণ
ব্যথার এ দান সারাইয়া দেয় সব বেদনার ভার।
২
দেবদেবীদের মহামঙ্গল পরশ আনে যে বহি
বৈজয়ন্ত ধামের পুলক পাই যে এখানে রহি।
গরুড়ের পাখা পায় প্রাণ পাখি পাইতে কিছুই থাকে না কো বাকি,
সলিল বিন্দু সুধা সাগরের সাথে এক হয়ে রহি।
৩
এক হয়ে যায় এভন শিপ্রা স্ট্রাটফোর্ট উজ্জয়িনী
বোখারণ সিরাজ সমরখন্দ সবারেই আমি চিনি,
ডাকে কুহু কেকা, ডাকে বুলবুল, গোটা ধরা এক বলে হয় ভুল,
বিশ্বনাথের বিপুল বিশ্বে সবাই সমান ধনী।
৪
মনকে এমন অমৃতসিক্ত সমৃদ্ধ করা তাই,
দিব্য আলোর এমন অলকা ভুবনে যে আর নাই।
দেবতা নরের অমৃত সৃষ্টি কি যে সুধা করে সতত বৃষ্টি,
অমর মধুপ ফুল গুঞ্জন চলিয়াছে এক নাই।
৫
এই তীর্থের এক কোণে আমি একটুকু ঠাঁই মাগি।
ভালোবাসি আমি তাঁহাদিকে বড় একান্ত অনুরাগী।
তাঁদের সঙ্গ এক সাথে বাসই স্বর্গবাসের চেয়ে ভালোবাসি,
দিব্যজীবনে যেন তাঁহাদের এক সাথে উঠি, জাগি।

পত্রোত্তর মনোজিৎ বসুকে লেখা

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

কোগ্রাম নূতনহাট—পোঃ
১১।১।৪৬

প্রিয় মনোজিৎ,

তোমাকে দেখিয়া বড় সুখী হইয়াছি—তোমরা এমন একটা মহৎ কার্য্য করিয়া ফেলিলে যা তোমাদিগকে দেশবাসীর ও ভগবানের প্রিয় করিবে। করুণানিধান সম্বর্দ্ধনায় একটা নূতন আদর্শ তোমরা স্থাপন করিলে। এখন তোমার জেরার উত্তর দিই—

১। ১২৮৯ সালে ফাল্গুন মাসের ১৮ই[১] আমার জন্ম—কোগ্রাম মাতুলালয়ে।

২। বাবার নাম পূর্ণচন্দ্র মল্লিক—কাশ্মীর মহারাজার প্রধান মন্ত্রীর দপ্তরে সুপারিন্‌টেনডেন্ট ছিলেন—৫০ বৎসর কাশ্মীরে ছিলেন। বাড়ী আসিয়া ১৩৪৪ সালের দশহরার দিন মারা যান—আমার মাতৃদেবীর মৃত্যুর দুই বৎসর পরে। আমার পিতৃকুল পাণ্ডিত্য তেজস্বিতা ও অমিতব্যয়িতার জন্য প্রসিদ্ধ।

ছেলেবেলায় মানুষ হইয়াছি মাতুলালয়ে—মাতামহীর স্নেহে, মাসীমাদের কাছে।

আমাকে ভালবাসিতেন বাবাই বেশী কিন্তু আমি মা বলিতেই অজ্ঞান। তেমন পুণ্যময়ী ভক্তিমতা স্নেহময়ী জননী পাওয়া সত্যই দুর্লভ—লিখিয়াছিলাম—

মাগো আমার পুণ্যময়ি
তুমিই আমার জগন্মাতা,
জনম জনম পেলাম তোমার
এই করুণা এই মমতা।
জনম জনম যা হয়েছে
জনম জনম হবেও মা,
ডাকবে আমায় স্তন্য তোমার
তোমার কাজল, তোমার চুমা।

৩। ছেলেবেলায় শান্তশিষ্ট ছিলাম না। দুর্ব্বল হইলেও গাছ হইতে দুই বার পড়িয়া এবং সাঁতার দিতে গিয়া ডুবিয়া যমরাজের সঙ্গে প্রায় চোখোচোখি করিয়া আসিয়াছি।

পড়াশুনো করিতে বিশেষ ভাল লাগিত মনে হয় না—পাটিগণিত, জ্যামিতি নামেই ভয় পাইতাম। চৌবাচ্চার নল ও জলের অঙ্ক অত্যন্ত বিরক্তিজনক মনে হইত—কেন এসব অঙ্ক কষায় বুঝিতে পারিতাম না।

১ সঠিক তারিখ ১৯শে। পত্রাবলী ১৯ দ্রষ্টব্য

খেলা অনেক রকম করিতাম এবং সঙ্গীও ছিল বহু।

ছেলেবেলায় আমি গল্পের বই পড়িবার মত পাই নাই। ছিলও কম। মহাভারতের শ্রীবৎস উপাখ্যান ইত্যাদি বাড়ীতে পাঠ হইত, তাহাই শুনিতাম, বাড়ীতে অনেক সময়ই হরিকথা হইত, সেই সব শুনিতাম। ভক্তমালের গল্প, বীর দ্রোণের গল্প এসব শুনিয়া মুগ্ধ হইতাম। বাউল গান, যাত্রা, কথকতা, খেপার গান প্রভৃতি প্রায়ই হইত, তাহাই আমার ভাল লাগিত। মেঠো গান যা রাখালেরা গাহিত, তা খুবই ভাল লাগিত—চণ্ডীর পালা—রামপ্রসাদের গান ঐ পালায় যাহা গাহিত তাহা বড় সুন্দর। একটু বড় হইয়া আরব্যোপন্যাসের গল্পগুলি শুনিয়াছিলাম। উহা মন্দ লাগে নাই।

বাবা মা দুজনের কাছেই মার খাইতাম, কারণ মাতামহী ও মাসীমারা অতিমাত্রায় আদর দিতেন—একেবারে 'আদুরে গোপাল' ছিলাম। সর্ব্বদা ১০।১১ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাঁদের কোলে কোলে ফিরিতাম—মাটিতে নামিতাম না—সেইজন্য দুষ্টামি করিতাম ও মার খাইতাম।

শৈশবে আমি গ্রামের প্রায় সমস্ত লোকের প্রিয় ছিলাম, বহু লোকের গভীর স্নেহধারায় আমি পুষ্ট—এত আশীর্ব্বাদ—এত শুভেচ্ছা কম লোকের ভাগ্যেই জোটে।

৪। আমি প্রথম গ্রামের পাঠশালে হাতেখড়ির পর পড়া শুরু করি, পণ্ডিত মহাশয় খুব ভালবাসিতেন। তারপর বাড়ীতে আমাকে পড়াইতেন আমার মায়ের জ্ঞাতিভ্রাতা যতীন্দ্রনাথ মল্লিক যিনি বিখ্যাত এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার পরে হইয়াছিলেন—তিনিই আমাকে কবিতা লিখিতে শেখান ও উৎসাহ দেন—তাঁর কাছেই ইংরাজী পড়িতে শিখি। আমি ১১।১২ বৎসর বয়সে কলিকাতায় Century School-এ ভর্ত্তি হই. এখানে আমি ২।৩ বার প্রথম প্রাইজ পাই—এখনকার তৃতীয় শ্রেণীতে 3rd classএ উষানাথ সেন (পরে Sir হন) আমার সহপাঠী ছিলেন। আমি বয়সে ছোট ও দেখিতে আরও ছোট বলিয়া ক্লাসের সকলে আমায় স্নেহ করিত। F. A. পাশ করি Ripon College হইতে, B. A. পাশ করি City College হইতে। বি-এ পরীক্ষায় বঙ্কিমচন্দ্র সুবর্ণ পদক পাই ১৯০৫ সালে। ভাল ছাত্র ছিলাম না, তবে অধ্যাপকগণ খুবই স্নেহ করিতেন। হেরম্ব মৈত্রেয়কে আমি বড় ভয় করিতাম, তিনি বড্ড পড়া জিজ্ঞাসা করিতেন, ক্লাসের যেখানেই বসি এড়াইতে পারিতাম না—সেইজন্য অনেকে আমাকে কাছে বসিতে দিতেন না পাছে তাহাদিগকেও পড়া ধরেন। এফ. এ. পড়ার সময় ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গণিত পড়াইতেন —তেমন অসম্ভব শক্তি-সম্পন্ন অধ্যাপক দেখি নাই—তিনিই অঙ্কশাস্ত্রকে কাব্যের ন্যায় মধুর করিয়া দিলেন, আমাকে বাক্যবাণে দিন দিন জর্জ্জরিত করিয়া অঙ্ক শিখাইলেন, অনুরাগী করিলেন—এমন অদ্ভুত ক্ষমতা আমি দেখি নাই। অধ্যাপক ললিতকুমার, অধ্যাপক সুরেশ ঘটক (পরে জেলা-

ম্যাজিস্ট্রেট) আমায় অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। আমাকে দীর্ঘকাল চিঠিপত্র দিতেন।

৫। বাবাকে ৫ বৎসরের ছেলে রাখিয়া আমার পিতামহী মারা যান। শুনিতে পাই তিনি অসাধারণ রূপবতী ছিলেন। মরিবার সময় ভাবী পুত্রবধূর জন্য আপনার সমস্ত গহনা, বস্ত্রাদি, খেলনা, পুতুলের বাক্স, এক খেলাইবার কড়ি সাজাইয়া রাখিয়া যান। উহা আমার মাতৃদেবী সব পাইয়াছিলেন। দিদিমার আমিই সর্ব্বস্ব ছিলাম, ত্রিবেণী গঙ্গা স্নান করিতে গিয়া তিনি আমাকে ৮৷৷৭ টাকার কেবল মাটির পুতুল কিনিয়া দিয়াছিলেন। আমি যাহা চাইতাম, তিনি তাহাই দিতেন এবং নানা অন্যায় আবদারের জন্য মায়ের কাছে মার খাইতাম।

৬। কবিতা লিখিতে আরম্ভ করি ১০।১২ বৎসর বয়সে—কোগ্রামে আমার সেই ছেলেমানুষী কবিতাই আদর করিতেন আমার মাসিমারা এবং গ্রাম্য গৃহিণীরা। আমি পাঠ্যপুস্তকের কবিতা ছাড়া তখন আর কোন কবিতার খবরই জানিতাম না। পল্লীগ্রামে যাত্রা, বাউল, ফকিরদের গীত ও রাখালদের গানই আমার প্রিয় ছিল।

কলেজ-জীবনে প্রথমে Wordsworthএর কবিতাই আমাকে কবিতার প্রকৃত রূপ যেন দেখাইল। ইংরাজী অন্য কবিতা বিশ্রী লাগিত, সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্রী লাগিত—Rule Britannia, rule the waves, এবং Britannia needs no bulwork. তারপর ইংরেজ বড় কবিদের সঙ্গে পরিচিত হই। Kipling-এর সহস্র দোষ সত্ত্বেও আমার ভাল লাগিত—বেশ বলিষ্ঠ কবিতা, স্থানে স্থানে ভক্তির ক্ষীণ ইঙ্গিত আমাকে মুগ্ধ করিত। তাঁর Proseও ভালবাসিতাম। ইংরেজী সাহিত্যের তিনটি মেয়েকে আমি ভালবাসি—Ophalia, Little Nell, আর Lucy Grey.

রবীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে দেরিতে পরিচয় হয়। তার আগে বৈষ্ণব কবিদের কবিতা পড়িতাম, চক্ষু জলে ভরিয়া যাইত। কীর্ত্তন গান প্রথম যেদিন শুনি—আমার মনে হইল ভগবান ঠিক এই সুরেই বাঁশী বাজাইতেন। তাহারি কিছু মধুরতা কীর্ত্তন গান আত্মসাৎ করিয়াছে। দেবেন্দ্র সেনের 'মলিন হাসি', 'নীরব বিদায়', 'বিজয়ী' প্রভৃতি কবিতা আমায় মুগ্ধ করিত, গোবিন্দ দাসের কবিতা খুব আগ্রহের সহিত পড়িয়াছি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার আত্মীয় শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ও শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের সৌহার্দ্য ছিল। রবীন্দ্রনাথ একদিন বোধ হয় আদর করিয়াই কবি কুমুদরঞ্জন বলেন, তখন সবে কবিতা লিখিতেছি—ইহা আমার জীবনকে যেন রঞ্জিত করিয়া দেয়, মনে হইল তবে সত্যসত্যই কবি হইব।[২]

২ 'রবীন্দ্র-স্নেহকণিকা' ১৩৬৮ অষ্টম বার্ষিকী 'সাহিত্যতীর্থ' রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

তারপর যখনই রবীন্দ্রনাথকে দেখিয়াছি, পরিতৃপ্ত হইয়াছি, এবং স্নেহে ও প্রসংসায় ধন্য হইয়াছি। আমি 'ভক্তমাল', 'চৈতন্যচরিতামৃত', 'পদকল্পতরু' ভক্তির সহিত পড়ি ও অত্যন্ত ভালবাসি। দাশরথি রায়ের পাঁচালী ভাল লাগে। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের উপদেশ ও জীবনী পড়ি—ভগবানকে দেখিতে পাওয়া যায় এই ধারণা আমার বাল্যাবধি ছিল, রামকৃষ্ণের কথায় সে বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়াছে—একটা বড় অভয়ের বাণী, আশার আলো, আশ্বাসের কথা সেখানে পাইয়াছি।

'নব্যভারতে' যখন আমার প্রথম কবিতা বাহির হয়, তখন আমি সেকেণ্ড ক্লাসে (class IX) পড়ি। আমার সর্ব্বপ্রথম বই 'শতদল' তারপর 'বন-তুলসী', তারপর 'উজানি' 'একতারা' 'বীথি' 'বনমল্লিকা' 'নূপুর' 'তূণীর' 'অজয়'। আর ছাপা হয় নাই। ৬।৭ বৎসরের কবিতা জমা আছে—ছাপা হইবে।[৩] সালগুলি মনে নাই, অনেক বই out of print। বৈষ্ণব কবিদের কবিতায় আমি সব রসই পাইয়াছি। ভগবান 'রসো বৈ সঃ' এটা যেন জানিতে পারিয়াছি। 'অজয়'কে আমার ভাল লাগে কেন জানি না, বোধ হয় জন্মান্তরের সৌহার্দ্য। তার ধূসর চর, তার বন্যা সবই আমায় আকর্ষণ করে। পল্লী মাঠ ঘাট বাট, বৃহৎ বনস্পতি, ফল ও ছায়াতরু, এমন কি তৃণ গুল্ম আমার পরিচিত গ্রামবাসী বলিয়া মনে হয়। গাছ কাটিলেই মাঠ যখন ফাঁকা হয়, আমার ব্যথা লাগে। বর্ষাকালে মেঘলা আকাশ, দুর্যোগ রাত্রি, জ্যোৎস্না রাত্রি, ভোরের আকাশ ও মাঠ ভালবাসি, গ্রামের পাখিগুলিকেও ভালবাসি।

কবিতা আমি লিখিব বলিয়া লিখি না, লিখিবার জন্য নির্জ্জনতার দরকার হয় না। সহস্র গোলের মধ্যে কবিতা লিখি। নদীতে বন্যা বা জোয়ার আসার মত কবিতা লেখার সময় একটা মাঝে মাঝে আসে। আমি কবিতা গড়ি না। তারা রূপগন্ধহীন হইলেও ফুলের মত ফোটে।

তোমার জেরার উত্তর যতটা পারিলাম দিলাম। যা দরকার জানিবার, লিখিবে। শরীরটা তত ভাল নাই—তোমাকে আবার দেখিতে পাব ভাবিয়াছিলাম। গজেনকে[৪] বহুদিন পরে দেখিয়া সুখী হইয়াছি। তোমার ও গজেনের লেখায় বড় মিঠা হাত—তোমরা যশস্বী হইয়াছ—আরও হইবে। ভগবান সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি করুন। শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক.

৩ 'স্বর্ণসন্ধ্যা', 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' ও 'কুমুদরঞ্জন-কাব্যসম্ভার' প্রকাশিত হয়

৪ শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

কবি কুমুদরঞ্জন

নরেন্দ্র দেব

বয়সে বছর কয়েকের বড় হলেও 'দাদা' বলে ডাকি নি কোনো দিন। ভারতী পত্রিকার অফিসে যে সাহিত্যিকদের আড্ডা বসতো তার কড়া নিষেধ ছিল কেউ কাউকে 'দাদা' বলবে না। বন্ধুরা পরস্পরকে নাম ধরে ডাকবে। স্বর্গীয় সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় আমাদের অনেকের চেয়ে বয়সে বেশ বড় ছিলেন কিন্তু কেউ আমরা কখনো তাঁকে 'সৌরীনদা' বলি নি। কুমুদরঞ্জন যদিও ভারতীর আড্ডার সদস্য ছিলেন না, কিন্তু যেহেতু তিনি কবি ও সাহিত্যিক অতএব বয়স তাঁর যাই হোক আমরা তাঁকে কুমুদরঞ্জন ছাড়া আর কিছু বলি নি কোনও দিন।

কুমুদরঞ্জন গ্রামের ছেলে হলেও কলেজে পড়বার সময় দীর্ঘকাল কলকাতায় কাটিয়েছিলেন। কবি তিনি ছাত্রাবস্থা থেকেই। অবশ্য শুধু 'কবি' বললে সঠিক পরিচয় দেওয়া হল না, 'সুকবি' বলে খ্যাতি তাঁর ছাত্রাবস্থা থেকেই ছিল এবং সে খ্যাতি তিনি বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুকাল পর্যন্ত অক্ষয় রেখে যেতে পেয়েছেন।

কুমুদরঞ্জনের কাব্যের মধ্যে কোনও রচনা চাতুর্য দেখাবার প্রচেষ্টা নেই। প্রত্যেকটি কবিতা সহজ সরল স্বাভাবিক তাই অনায়াসেই শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলের অন্তর স্পর্শ করে। এ গুণ সহজসাধ্য নয়। স্বভাব কবি ভিন্ন অন্য কারুর পক্ষে সর্বজনচিত্ত স্পর্শ করা সম্ভব নয়। কুমুদরঞ্জন এই অসাধ্য সাধন করতে পেরেছিলেন। তিনি ছিলেন গ্রামের মানুষ। ছাত্রাবস্থায় বহুকাল এই কলকাতা শহরে কাটালেও কলকাতা কুমুদের 'কোগ্রাম'কে ভোলাতে পারে নি। পড়া শেষ করে 'গ্রাজুয়েট' হয়ে দেশে চলে গেলেন এবং দেশের কাছে স্কুলে মাস্টারীর কাজ নিয়েই সারা জীবন কাটিয়ে দিলেন। কবিতা লেখার ঝোঁক তাঁর শুনেছি স্কুলের-ছাত্রাবস্থা থেকেই ছিল। বয়স তখন তাঁর দশ বছরের বেশি নয়। সেই কিশোর বয়সের সহজ সরল রচনার ধারা কুমুদরঞ্জন তাঁর পরিণত বয়স পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরে-ছিলেন। কখনও কোনো দিন দুরূহ দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করে আভিধানিক ভাষায় কবিতা রচনার চেষ্টা করেন নি। কুমুদরঞ্জনের প্রত্যেকটি রচনা সহজ সরল অথচ মর্মস্পর্শী।

বিংশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষায় নতুন ধরনের কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল কুমুদরঞ্জন মল্লিকের। তাঁর কবিতাগুলি যেমন ছোট-ছোট, কবিতার বইগুলিও তেমনি বেশ ছোট-ছোট। একখানি ফুলস্কেপ কাগজের চার পাট করলে যে আকার হয় কুমুদরঞ্জনের কাব্যগ্রন্থগুলিই আমরা

সর্বপ্রথম সেই আকারেই পেয়েছিলুম। কয়েকখানি বইয়ের নাম করলে হয়ত অনেকের মনে পড়বে—তেমন ছোট আকারের কাব্যগ্রন্থ ইতিপূর্বে আর কোনও কবি ছাপান নি। কুমুদরঞ্জনের রচিত কবিতাগুলির মধ্যে কবি তাঁর রচনার আকৃতিতে নূতনত্ব দেবার চেষ্টা না করলেও তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে নূতনত্ব এনেছিলেন। কয়েকখানির নাম করলেই বইগুলির কথা অনেকের মনে পড়বে। যেমন 'শতদল', 'বনতুলসী,' 'একতারা', 'বীথি' ইত্যাদি তাঁর ৮।৯ খানি কাব্যগ্রন্থ।

বলা বাহুল্য যে, এত বেশি সংখ্যক কাব্যগ্রন্থ আর কোনও বাংলা কবির প্রকাশিত হয় নি। অবশ্য এ কাব্যগ্রন্থগুলি যেমন আকারে ছোট তেমনি মুদ্রিত কবিতাগুলিও সংখ্যায় অল্প। শিশু বালক ও কিশোরদের উপযোগী অসংখ্য কবিতা ইনি রচনা করেছিলেন। এই কবিতাগুলির মধ্য থেকে বিদ্যালয়ের পাঠ্য হবার উপযোগী কতকগুলি কবিতা নির্বাচিত করে নিয়ে কবিশেখর কালিদাস রায় একখানি স্কুলপাঠ্য কাব্যগ্রন্থ সম্পাদন করেছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে গ্রন্থখানি পাঠ্যপুস্তকরূপে গৃহীত হয়েছে।

কুমুদরঞ্জনের একখানি নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ কবিতা সংগ্রহ প্রকাশ করেছেন বিশিষ্ট পুস্তক প্রকাশক মিত্র-ঘোষ কোম্পানি। এই বইখানি প্রকাশের অনেক বৎসর আগে একদিন কুমুদরঞ্জন আমাকে ডেকে ছিলেন তাঁর কাছে। তিনি তখন কলকাতায় এসে পটলডাঙ্গায় সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের পরিত্যক্ত বাড়িতে উঠেছেন। সে বাড়িটি তখন একটি 'মেসে' রূপান্তরিত হয়েছিল। কবিবন্ধুর ডাকে সেই দিনই বিকেলে গিয়ে হাজির হলুম কবির কাছে। আমি তখন ঠনঠনে কালীবাড়ির সামনে ৩ নং মুক্তারাম রোডে আমাদের পৈতৃক ভবনে বাস করি। পটলডাঙ্গা ওখান থেকে খুবই কাছে।

কুমুদ আমাকে পেয়ে খুবই খুশি। বার করলে তার মস্ত মোটা এক কবিতার ফাইল। বললে একখানা নির্বাচিত কবিতার বই বার করতে চাই। সেই বইয়ের জন্য এই কবিতাগুলো বেছে রেখেছি। তুমি একটু শোন, এগুলো সব দেওয়া চলবে কিনা। পড়তে শুরু করে দিলেন কবি তাঁর নির্বাচিত কবিতাগুলি। কাব্যপ্রিয় কবি তাঁর স্বরচিত কবিতাগুলি সন্তানের তুল্য ভালোবাসতেন। তাঁর নির্বাচন শুনে বুঝলুম মা যেমন তাঁর অক্ষম সন্তানের প্রতি একটু অধিক মমতা বোধ করেন, কুমুদরঞ্জনও তেমনি তাঁর একাধিক দুর্বল রচনাকেও ফেলতে পারেন নি। বললুম নির্বাচিত কাব্যগ্রন্থে এগুলি দেওয়া ঠিক হবে না, এ সব বাদ দাও। কবি নিতান্ত অনিচ্ছুক মনে সেগুলি বাদ দিয়ে রাখলেন বটে, কিন্তু বুঝলুম কবির মন সেগুলির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে।

কবিশেখর কালিদাস রায় কুমুদের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট হলেও

কবির ছিলেন অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু। শেষ পর্যন্ত কবিতা নির্বাচনের ভার নিজের উপর না রেখে কালিদাসের উপরই ছেড়ে দিয়েছিলেন। ফলে কুমুদরঞ্জনের 'স্বনির্বাচিত কবিতা' কবিশেখর কালিদাসের দ্বারা শেষ পর্যন্ত নির্বাচিত হয়ে প্রকাশিত হল। যেমন হয়েছে তাঁর শিশুপাঠ্য বা স্কুলপাঠ্য কবিতাগুলি।

কোনও কবিই নিজের রচনার সুবিচারক হতে পারেন না। তাঁর কাছে নিজের সব রচনাই ভালো লাগে। একমাত্র রবীন্দ্রনাথকেই দেখা গেছে স্বরচিত কবিতার শ্রেষ্ঠ অপকৃষ্ট বিচার করে গ্রন্থাকারে ছাপার সময় নির্বাচন করে ও বাদ দিয়ে ছাপা। কবি কুমুদরঞ্জন তাই কবিবন্ধু কালিদাস রায়ের সাহায্য নিয়ে ভালো করেছিলেন। কবি কুমুদরঞ্জনের সঙ্গে যাঁদের পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন এমন বিনীত নম্র সহজ সরল মানুষ তাঁরা এ যুগে দ্বিতীয় কাউকে দেখেন নি।

অজয় ও কুনুর নদীর সংযোগস্থলে কোগ্রামে কবির জন্ম এবং সারা জীবন তিনি এই গ্রামকে ভালোবেসে এরই কোলে সামান্য স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাজ নিয়েই স্বচ্ছন্দ জীবন কাটিয়েছেন। কিন্তু শেষ বিদায় নিতে হল তাঁকে এই কলকাতাতেই তাঁর সন্তানের স্বরচিত নবগৃহে[১]।

বাংলা দেশের কাব্যাকাশ হতে একটি সুস্নিগ্ধ তারা নিভে গেল।

১ শান্তিপুকুরে গৃহপ্রবেশের পূজায় যোগদান করেন তার পর দ্বিতীয় পুত্র ডাক্তার সরিৎনাথ মল্লিকের বালিগঞ্জ প্লেসের বাসায় পরলোক গমন করেন।

আমার উপগুরু কুমুদরঞ্জন

কালিদাস রায়

বাংলার যে অঞ্চলে একদিন নরহরি সরকার ঠাকুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ, লোচনদাস ঠাকুর, কাশীরাম দাস, জ্ঞান দাস, দাশরথি রায় ইত্যাদি কবিগণের আবির্ভাব ঘটেছিল সেই অঞ্চলকে আমরা বঙ্গ সংস্কৃতির শ্রীখণ্ড মণ্ডল নামে অভিহিত করে থাকি। বর্তমান যুগ পর্যন্ত এই শ্রীখণ্ড মণ্ডলের সংস্কৃতির শুচিসুন্দর ভাবধারা সগৌরবে প্রবাহিত হয়ে এসেছে যে কবির রচনায় সে কবি তিরোহিত হলেন। আশংকা হয় বোধ হয় এ ভাবধারার প্রবাহ এখানেই শেষ। বিরাট মহীরুহের ঝঞ্ঝাবার্তের পতনে যেমন একটা দিক শূন্য হয়ে যায়, গঙ্গা ও অজয়তীরের একটা দিক তেমনি আজ খাঁ খাঁ করছে।

অকপটে আমি স্বীকার করি রবীন্দ্রনাথ যদি আমার গুরু হন, তা হলে কুমুদরঞ্জনকে উপগুরু বলা যেতে পারে। আমি তাঁরই অনুজ এবং তাঁর অনুবর্তী হয়ে সমস্ত জীবন কাব্য রচনা করেছি এবং যখনই যেখানে আমার নাম উচ্চারিত হয়েছে তখনই তাঁর নামের সঙ্গে যুগলবন্ধরূপেই আমারও নাম থেকে গেছে। এতে আমি যে গৌরব অনুভব করেছি তাই প্রাণভরে আজ স্বীকার করবার দিন। আমার মনে হয় কবি কুমুদরঞ্জনের রচনা অক্ষয় হয়ে থাকবে। সেই সঙ্গে আমি আশা ও ভরসা করি সে নামের সঙ্গে আমার নাম কখনও কখনও উচ্চারিত হতে পারে। আমি তাতেই যথেষ্ট মনে করে স্বর্গত উপগুরুর উদ্দেশে শত শত প্রণাম জানাই।

আমরা দুজনেই এক অঞ্চলের ও এক সমাজের মানুষ। স্বভাবতই দুজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটেছে। এবং আরও নানাভাবে আলাপ পরিচয় ঘটেছে। প্রথম পরিচয় হয় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের কাশিমবাজার রাজবাড়ির অধিবেশনে ১৯০৭ সালে। সম্মানিত অতিথিরূপে কুমুদরঞ্জন উপস্থিত ছিলেন। আর তখন তিনি বি.এ. পাশ করে শিক্ষকতা শুরু করেছেন। স্বেচ্ছাসেবক রূপে আমি তাঁকে দু'দিন সেবা করবার সুযোগ পেয়েছিলাম।

এই সুযোগে আমি তাঁর স্নেহের পাত্র হয়ে উঠেছিলাম এবং দেখা-সাক্ষাৎ খুব কম হলেও ক্রমেই ঘনিষ্ঠতা দিনের পর দিন গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে উঠেছিল। তখন থেকে ষাট বছর ধরে তাঁর সঙ্গে নিয়মিতরূপে পত্রালাপ চলে এবং অধিকাংশ পত্র ছিল সাহিত্যালোচনা ও বঙ্গানুবাদ প্রসঙ্গে পূর্ণ। তাঁর প্রেরিত চিঠিতে আমার একটি বাক্স ভরে রয়েছে। তিনি শেষ চিঠি দেন মৃত্যুর দু'দিন আগে। মাঝে মাঝেই চিঠিগুলি খুলে দেখি এবং ছেলেদের পড়ে শোনাই। তাঁরা কুমুদরঞ্জনকে জ্যাঠামশাইরূপে পেয়ে ধন্য হয়েছে।

কুমুদরঞ্জনকে দেশের জনসাধারণ ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে শিরোধার্য করে নিয়েছে। চেষ্টা করে তাঁর রচনাকে পাঠকের মনে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়োজন হয় নি, হবেও না।

তাঁর কবিতাবলীর দুটি সংকলন হয়েছে। এই দুটি সংকলনের সম্পাদকতা করেছি আমি ও নানা পত্রিকায় আলোচনা প্রকাশিতও করেছি এবং তাঁর সাত আটটি কবিতা পুস্তক। আমি সে সম্বন্ধে নতুন করে তাঁর তিরোধানের পর কিছু বলতে চাই না।

এই কবিকে পাঠক সাধারণ পল্লীকবি বলে অভিহিত করেছেন। পল্লীর জীবনযাত্রা সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা তাঁর অধিকাংশ কবিতার বিষয়ীভূত হয়েছে বটে। এই বিষয়বস্তু প্রাধান্য লাভ করেছে বলে তাঁকে বিদায় দিলে তাঁর প্রতি অবিচার করাই হয়।

বর্তমান যুগের ঘাতপ্রতিঘাত তাঁর চিত্তকে আন্দোলিত করে নি তা নয়। পল্লীকবি এই অভিধা না দিয়ে বিশ্বপ্রকৃতির উপাসক বললে যথার্থ আখ্যা দেওয়া হয়। প্রকৃতির কবি বললে অধিকতর সমীচীন হয়।

যে যুগের কবিরা রবীন্দ্রনাথের প্রভাব বর্জন করতে পারবেন না সেই যুগের এই কবি পরম রবীন্দ্র-ভক্ত হয়েও নিজের স্বাতন্ত্র্যে বৈশিষ্ট্য লাভ করেছিলেন।

প্রারম্ভে যে সকল প্রাচীন কবির নাম করেছি, তাঁদের প্রভাব কুমুদরঞ্জনের মধ্যে পরাগের মতো বিরাজ করছে। তাঁদের প্রতি গভীর ভক্তি কুমুদের সৌরভের মতো রচনার সরণী আমোদিত করেছে।

প্রকৃতির উপাসনার জন্য যেমন নগর ছেড়ে পল্লীতে যেতে হয়, পল্লী-লক্ষ্মীর উপাসনা করতে গেলে দীন-দুঃখীদের কুটিরে কুটিরে বিচরণ করতে হয়। সেই হিসাবে কুমুদরঞ্জন দীন-দুঃখীদের কবি। কাজেই যে কবি সারাজীবন পল্লীলক্ষ্মীর উপাসনা করেছেন, দীন-দুঃখীদের কুটিরে অতিথি হয়েছেন তাঁর দিন ফুরিয়ে গেছে, তিনি সেকেলে; অতএব অপাংক্তেয়—এ কথা কি করে নব্যপাঠকরা বলেন।

কি অফুরন্ত রসভাণ্ডার নিয়ে জন্মেছিলেন এই কবি, যে আশির কোঠায় পৌঁছেও তাঁর বাঁশির গান ফুরোয় নি। গত ষাট বছরের বেশি কাল ধরে অক্লান্তভাবে কাব্যলক্ষ্মীর সেবা করলেও কাব্যক্ষেত্র থেকে তাঁকে বিদায় দেওয়ার জন্য কোনো কোনো অঞ্চলে প্রাণপণ চেষ্টার ত্রুটিও হয় নি। তবু তিনি বাঁশি বাজাতে বাজাতে বৈতরণী পার হয়ে চলে গেলেন।

আজকাল অনেকেই দীর্ঘায়ু লাভ করছেন। কিন্তু তার আগে দীর্ঘতরকাল মহাদুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে নিজেও কষ্টভোগ করছেন, আত্মীয়-বন্ধু ও সেবকদের কষ্টও দিচ্ছেন। আজকের এই শোকের মধ্যে এইটুকু সান্ত্বনা যে, এই কবি নিজে শয্যাশায়ী হয়ে কোনো কষ্ট পান নি এবং

অপরকে একদিনের জন্যও কষ্ট দেন নি। ধর্মপ্রাণ মহাপুরুষরা যেভাবে মহাপ্রয়াণ করেন কুমুদরঞ্জনও সেইভাবে চলে গেলেন।

আমি বিশেষ অসুস্থ এ সংবাদ পেয়ে চণ্ডীর পুজো দিয়ে প্রসাদী বিল্বপত্র কবি খামের ভিতর পাঠিয়েছিলেন, লিখেছিলন—'চিন্তা নেই এতেই নিরাময় হয়ে যাবে।'

বসে বসে ভাবিতেছি এই দুনিয়ায়
স্নেহ করিবার আর কেউ নেই হায়।
আসে যায় কতজন দেয় উপদেশ
থাকে না তাহাতে স্নেহ-দরদের লেশ।
বেড়েছে শোণিত চাপ আসে কতজন
কেউ বলে বিশ্রামই বড় প্রয়োজন।
মাঝে মাঝে ডাক্তার দেয় দেহে হানা
জঠরে জমিয়া গেল প্রতিকার নানা।
কেহ বলে—নুন ছাড়ো, একবেলা খাও,
কেউ বলে—দুইবেলা পার্কে বেড়াও।
যে যা বলে করি তাই। একখানা খামে
ভক্ত কবির চিঠি এল মোর নামে,
খুলে দেখি রহিয়াছে ভিতরে চিঠির
প্রসাদী বিল্বদল মাতা চণ্ডীর।
লেখা আছে—'পাঠালাম প্রসাদী মাতার
নিরাময় হয়ে যাবে ভয় নেই আর।
মাথায় ঠেকানু তায় চোখে এল জল
কবির গভীর স্নেহে বুকে এল বল।
মনে হল পিতামহ যারে দেখি নাই,
তাঁহার আশিস যেন এত দিনে পাই।
মনে হল পিতামহী দেখিনিক যায়
হরিনাম-ঝোল মোরে ছোঁয়াল মাথায়।
স্নেহের কাঙাল আমি করেছিনু শোক
এখনো রয়েছে স্নেহ করিবার লোক।
এ যুগের কবিরা তো হেসে হবে খুন
বলিব এ কবি নাকি? নামটা বলুন।
কি হবে শুনিয়া নাম না-বলাই শ্রেয়ঃ
তাঁহার আশিস মোর পথের পাথেয়।
এ যুগে হৃদয় হেন পাবে কোন জন?
এ মানুষ এ যুগের কবিকঙ্কণ।

পল্লীর কবি কুমুদরঞ্জন

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

হে সাহিত্যক্ষেত্রের অগ্রজ, বাংলাদেশের সংস্কৃতির ধারক ও বাহক, তোমাকে তোমার জন্মদিনে আজ অন্তরের প্রণাম জানাই।

কবির পরিচয় এখানে দেবার প্রয়োজন নাই। এখানের পথ-ঘাট, হাট-মাঠ, নদী-নালা, গাছপালা, তৃণ-গুল্ম, ফুল-ফল সবাই তাঁর পরিচয় জানে। কবি কুমুদরঞ্জনের পায়ের ধ্বনি, গায়ের গন্ধ, হাতের স্পর্শ, কণ্ঠের স্বর সবই তারা চেনে, হয়তো আলোর স্পর্শের মতো, জলের স্বাদের মতো চেনে; তাদের বড় চেনা মানুষ কুমুদরঞ্জন। কিন্তু কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের পরিচয় দিতে হবে নগরবাসীর কাছে—যেখানে প্রতিনিয়ত চলেছে বুদ্ধির খেলা।

রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাংলাসাহিত্যে ভারতীয় ঐতিহ্যের যে ধারা বয়ে এসেছে, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে ভারতবর্ষ নূতন ক'রে বেঁচে উঠেছে, দেড়শ বছর আগে—বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পূর্বে সাম্রাজ্যবাদের পথ ধরে পশ্চিম এসে তার বিরুদ্ধে বিজয়ীর দম্ভে যুদ্ধ ঘোষণা করল। সে বিস্তৃত আলোচনা সাপেক্ষ—শুধু একটি উদাহরণে তাকে প্রকাশ করতে পারব কিনা জানি না। ধরা যাক আমাদের ধর্মের ক্ষেত্রে পূজা আরাধনার বিরুদ্ধে তাদের নিরীশ্বরবাদী অভিযানের কথা। তারা বলল—'তোমার বিগ্রহকে যুক্তি দিয়ে প্রমাণ কর।' আমরা সে প্রমাণ দিতে পারি নি। জাতি যখন মূক—পরাজয় মানে মানে, তখন রবীন্দ্রনাথ এলেন তাঁর পূজা ও প্রার্থনা সংগীতের মধ্যে অমোঘ প্রমাণ নিয়ে। রবীন্দ্রনাথের দেবতার নাম নাই, কিন্তু পূজা আছে, সে পূজা জীবনদেবতার উদ্দেশ্যে। কুমুদরঞ্জনও এই দেবতাকে অন্তরে ও কাব্যে সারা জীবন পূজা করেছেন।

কুমুদরঞ্জন এরই মধ্যে এলেন বিচিত্র বার্তা নিয়ে। এলেন গ্রামজীবনের সরল ভগবদ্ বিশ্বাস নিয়ে। যেখানে যুক্তি বড় নয় কিন্তু বিশ্বাস অলঙ্ঘনীয়। একটি বিচিত্র উপমা মনে আসে আমার। ওদের নাস্তিকতার যুক্তি পাহাড়ের মতো উঁচু এবং কঠিন। কুমুদরঞ্জনের ভগবদ্ বিশ্বাস উঁচুও নয়, কঠিনও নয়—সে অনন্তমূল দূর্বাদলের মতো নমনীয় সবুজ কিন্তু ওই পাহাড়কে আচ্ছন্ন করে জন্মাতে তাকে বেগ পেতে হয় না। ওই জন্মাতে যে সময়টুকু লাগে ততটুকু সময়ই শুধু তার প্রয়োজন।

এই সময়টা বাংলাদেশে আধুনিকতা উগ্রভাবে মাথাচাড়া দিয়েছে। তখন কুমুদরঞ্জনের সমকালীন আধুনিকপন্থী কবিদের কাছে তাঁর কাব্য নিষ্প্রভ হয়ে গেছল বলে মনে হয়েছিল। সেদিন কুমুদরঞ্জনের কবিতা

সকলের কাছে পৌঁছায় নি। কিন্তু আজ আশ্চর্যভাবে তাঁর সত্তাকে ফিরে পেয়েছে ; কুমুদরঞ্জনের কবিতার নূতনরূপ আজ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

এই দেশের গ্রামীন মানুষ বড় সহজ, সরল, তারা মানুষকে দেবতা ভাবে। সত্যকে তারা জানে, এই সত্য ভালোবাসার মধ্য দিয়ে রূপায়িত। এই সত্যের জীবনদর্শন এদের মনের পটভূমিকায় প্রতিফলিত। এদের প্রাচুর্য নাই, কিন্তু আনন্দ আছে। আমরা জীবনে শান্তি পাই না ; কিন্তু এরাই শান্তি পেয়েছে দুঃখে এবং দুর্যোগের অন্ধকারে। এইসব মানুষের কবি কুমুদরঞ্জন। এদের কাছে তাঁকে পরিচিত করার, পূজ্য ক'রে তোলার প্রয়োজন নাই।

একদিন আমরা কুমুদরঞ্জনকে স্বীকার করি নি। বুদ্ধকেও আমরা একদিন স্বীকার করেছিলাম না। আজ নূতনভাবে তাঁকে পেয়েছি। সারা পৃথিবীও পেয়েছে। আজ আড়াই হাজার বছরের আগেকার মানুষকে আমরা নূতনভাবে স্মরণ করছি। কুমুদরঞ্জনকে তেমনি করে আজ নূতনভাবে স্মরণ করছি।

কুমুদরঞ্জন অন্যতম শেষ প্রাচীন কবি। তাঁর কাছে আজ ক্ষমা চাইব, প্রার্থনা করব এই জন্যে যে, আমরা একদিন যে সম্বিত হারিয়েছিলাম তিনি যেন তা ক্ষমা করেন। বাংলার কাব্য পুরাণ বাংলার লোকেরা জানে না। তাই আজ দুর্বোধ্য সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে। কুমুদরঞ্জন কিন্তু প্রাচীনতায় আস্থাশীল এবং কুমুদরঞ্জনের কবিতা সহজ সুন্দর সুষমায় মণ্ডিত। তাঁর কবিতার নূতন রূপ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে দেশের গ্রামীন মানুষ ও প্রকৃতি প্রীতির মধ্যেই।

ভারতবর্ষ কাউকে ফিরায় না, সকলকেই গ্রহণ করে কিন্তু তাই বলে নিজেকে ভুলে যেতে যেতে, এ কথা ঠিক নয়। কুমুদরঞ্জন কখনও নিজের দেশকে, সংস্কৃতিকে, ঐতিহ্যকে ভুলে যান নি। আজ বাংলাদেশের গ্রামের কবি লোকজীবনের কবির কথা মনে করতে হলে কুমুদরঞ্জনের নাম মুহূর্তে মনে পড়ে যায়।

কুমুদরঞ্জনের কাব্যের সাধনা এবং ভগবানের সাধনায় প্রভেদ নেই। তাঁর জীবন সাধকের জীবন। তিনি তাঁর জীবনদেবতার সন্ধান পেয়েছেন তাঁর কবিতায়। তাঁর উত্তরাধিকার যেন আমরা বহন করতে সক্ষম হই, আজ শুধু এইটুকুই প্রার্থনা।*

* কবির ৯৫তম জন্মজয়ন্তী সম্বর্ধনায় সভাপতির অভিভাষণ
'সাহিত্যতীর্থ' ১৩৮৫ পঞ্চম বার্ষিকী দ্রষ্টব্য

আমাদের কুমুদ-দা

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

শ্রীমান রমেন মল্লিকের সঙ্গে আমার অনেক দিনের পরিচয়। সেই সূত্রে তার প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান সাহিত্যতীর্থের সঙ্গেও।

এই সাহিত্যতীর্থের প্রথম তীর্থপতি আমার যতদূর মনে পড়ে কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি লোকান্তরিত হবার পরে কবি কুমুদ রঞ্জন মল্লিকই হলেন দ্বিতীয় তীর্থপতি। তিনি আমরণ এই প্রতিষ্ঠানকে সেবা করে গেলেন।

কবি কুমুদরঞ্জনের সঙ্গে আমার পরিচয় শুধু সাহিত্যতীর্থের তীর্থপতি ছিলেন বলেই নয়। সেও আজ অনেককাল আগেকার কথা। কবি নজরুল ইসলাম যখন ইস্কুলের ছাত্র তখন আমি ছিলাম তার সহপাঠী। অকস্মাৎ আমি তাঁর কাছে ছোট একখানি কবিতার বই দেখলাম। লেখক কুমুদরঞ্জন মল্লিক। ইস্কুলের ছাত্র হলে কি হবে, আমরা তখন একান্ত সঙ্গোপনে সাহিত্য চর্চা করি। নজরুল লেখে গল্প, আমি লিখি কবিতা। কাজেই কুমুদরঞ্জন মল্লিক নামটির সঙ্গে আমার আগে থেকেই পরিচয় ছিল। কবিতার বইটি আমি নিয়ে নিলাম, 'তুমি কবিতার বই নিয়ে কি করবে?' নজরুল বললে—'আমি ও'র মাথরুন ইস্কুলের কয়েক মাসের ছাত্র ছিলাম, একদিক দিয়ে ধরতে গেলে উনি আমার গুরুদেব। রাত্রে লুকিয়ে লুকিয়ে তোমাকে না জানিয়ে আমিও কবিতা লিখছি।'

'কই দেখি তোমার কবিতা?'

দেখলাম তার অঙ্কের খাতায় একটি কবিতা সে লিখছে—"গুরু প্রণাম"—কবি কুমুদরঞ্জনের উদ্দেশ্যে অজস্র প্রণাম নিবেদন। এইটিই বোধ হয় তার প্রথম কবিতা।

নজরুল গল্প লেখক নয় আসলে সে একজন কবি তা আমি আগেই জানতাম। আর জানতাম আমি কবি নই, আমি আসলে একজন গল্প লেখক।

আমরা কিছুদিন পরেই নিজেদের সাহিত্যকর্মের রূপ বদল করে নিয়েছিলাম। নজরুল তার পরবর্তী জীবনে গল্প ছেড়ে কবিতা লিখলে, কবিতা লিখে খ্যাতি অর্জ্জন করলে তখন যে সে এমন একটা কাণ্ড করে বসবে তা আমিও জানতাম না। আমাকেও না জানিয়ে গোপনে সে কবি কুমুদরঞ্জনকে একখানি চিঠি লিখে বসেছিল। চিঠিতে কি লেখা ছিল আমি জানি না, সেই চিঠি পাওয়া মাত্র কবি কুমুদরঞ্জন একদিন একটি ব্যাগ হাতে নিয়ে আমাদের ৩২ কলেজ স্ট্রীটের দোতলার আস্তানায় স্বয়ং এসে হাজির।

কবির সঙ্গে নজরুলের এবং আমার দুজনেরই এই প্রথম পরিচয়। নজরুলকে তিনি ইস্কুলে দেখেছেন মাত্র কিন্তু বিশেষ পরিচয় কিন্তু হয় নি। তাঁর-ই একজন ছাত্র যে এমন কবিখ্যাতি অর্জ্জন করবে তা তিনি ভাবতেও পারেন নি। নজরুলকে দু-হাত দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। নজরুল পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে।

আমার পরিচয় আমি দিতে চাই নি, আমি শুধু সেই প্রিয় দর্শন গৌরবর্ণ খর্বাকৃতি নিরহঙ্কার খ্যাতিমান কবিকে দেখেই খুশি। নজরুল কিন্তু ছাড়লেন না। একজন খ্যাতিমান গল্প লেখক বলে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

কবি তাঁর আর এক প্রিয়-শিষ্য কবিকে কত আশীর্বাদ যে করলেন সে সব কথা আজ আমার মনে নেই। শুধু এইটুকু মনে আছে তিনি বলেছিলেন, 'তোমার কবিতা পড়ে তোমার প্রতিভা যে কত বিরাট তা আমি বুঝতে পেরেছি। তোমাকে পেয়ে সারা দেশ একদিন গর্ব অনুভব করবে এই আমি বলে গেলাম তুমি দেখে নিও।'

নজরুল তখন তরুণ যুবক আর তিনি প্রৌঢ়। ভেবেছিলেন, নজরুলের আগেই তিনি চলে যাবেন। তাই গেলেন—কিন্তু পরিণত পূর্ণ বয়সে। নজরুল এখনও বেঁচে রয়েছে। বাহাত্তর বছরের বৃদ্ধ। কবির সে ভবিষ্যৎ বাণী উপলব্ধি করবার ক্ষমতাও নেই।

কলেজ ষ্ট্রীটের দোতলায় কবির সঙ্গে নজরুলের সেই যে পরিচয় সেই তার প্রথম এবং শেষ।

কিন্তু আমার সঙ্গে কবি কুমুদরঞ্জনের আরও দু'চারবার দেখা হয়েছে। যখন-ই দেখা হয়েছে, তখনি তিনি নজরুলের কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন।

স্নেহপ্রবণ পিতার মতো আবেগ ব্যাকুল কণ্ঠে একবার তিনি আমাকে একটুখানি আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বারংবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'সে নাকি পাগল হয়ে গিয়েছে!'

কি রকম পাগল, কোথায় কোথায় চিকিৎসা হয়েছে, কি করে সে লোক-জনের সঙ্গে, কি রকম ব্যবহার করে, এই রকম সব খুঁটিনাটি কথা—সে আর শেষ হতে চায় না।

তার পর আমার সঙ্গে তাঁর শেষ দেখা তাঁর দেশের বাড়িতে কোগ্রামে সাহিত্যতীর্থের তরফ থেকে আমরা সদলবলে গিয়েছিলাম তাঁর জন্মদিনে তাঁকে সম্বর্দ্ধনা জানাতে। তারাশংকর আমার সঙ্গে ছিল আরও ছিল অনেক কবি সাহিত্যিক বন্ধু। রমেন (মল্লিক) আমাদের সেখানে নিয়ে গিয়েছিল।

কলকাতা থেকে ট্রেনে চড়ে, বাসে চড়ে, পায়ে হেঁটে অজয় নদী পেরিয়ে তাঁর গ্রামে যাওয়ার সে বিচিত্র আনন্দের কথা জীবনে ভুলব না।

অজয়ের তীরে ছোট্ট একটি গ্রামের এক প্রান্তে ছোট বড় নানান্ রকম গাছে ঢাকা কয়েকখানি বাড়ি দেখে মনে হয় ছোটোখাটো একটি আশ্রম, যেন তীর্থভূমি।

কবি কুমুদরঞ্জন ছিলেন দূরের মানুষ, কবে যে তিনি এত কাছের মানুষ হয়ে গেছেন বুঝতে পারি নি। কবি কুমুদরঞ্জন হয়েছেন 'কুমুদ-দা'।

সারাদিন সারারাত এবং তার পরের দিন আমরা সবাই মিলে থাকলাম তাঁর বাড়িতে। অজয়ের জলে সাঁতার কাটলাম স্নান করলাম, সারি বেঁধে পাতা পেতে খেতে বসলাম। মনে হল যেন আমরা অতিথি নই এ যেন আমাদের নিজেদের বাড়ি। সে রকম হৃদ্যতা সে রকম আতিথেয়তার স্পর্শ আমরা আর কখনও কোথাও অনুভব করি নি।

আমরা সকলেই গেছি কলকাতা থেকে, সম্মানিত অতিথি বলে আহার্য বস্তু মনে করেছিলাম সবই হবে বুঝি বিদেশঘেঁষা, কিন্তু খেতে বসে দেখি সবই পল্লীগ্রামের মাটিতে উৎপন্ন উৎকৃষ্ট টাট্‌কা সব্জি এবং তার রন্ধন প্রণালীর মধ্যে বৈদেশিক ছাপ কোথাও নেই। বরং এমন একটি পল্লীসুলভ বৈশিষ্ট্য আছে যার উপাদেয় স্বাদ একবার খেলে আবার খেতে ইচ্ছা হয়।

কুমুদরঞ্জনকে সবাই পল্লীকবি বলতো। আমরা সেই নিরাসক্ত নিরহঙ্কার মিষ্ট-মধুর মানুষটির পল্লীভবনে গিয়ে অবিস্মরণীয় আনন্দ উপভোগ করে এসেছিলাম।

তপোবন কাকে বলে জানি না। তপোবনের কথা শুধু বইয়েই পড়েছি। শুনেছি মুণিঋষিরা স-পরিবারে সেখানে বাস করেন, আমরা কিন্তু সচক্ষে দেখে এলাম আমাদের ঋষি-কবি কুমুদরঞ্জনের পল্লী তপোবন এবং তাঁর স-পরিবার আশ্রম—সেখানে আবার যেতে ইচ্ছা করে কিন্তু হায় সে আশ্রমের প্রাণপুরুষ কবি কুমুদরঞ্জন আজ লোকান্তরিত।

কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

পাথুরিয়াঘাটার সাহিত্যতীর্থ দেশের অন্যতম খ্যাতিমান সাহিত্য প্রতিষ্ঠান। সকল বিশিষ্ট সাহিত্যিকেরই সেখানে সমাবেশ ঘটে। তার আর এক বৈশিষ্ট্য তার তীর্থপতি নির্বাচনে উপযুক্ত রুচির পরিচয়। সাহিত্যের আদিরূপ কাব্য। সেই বিবেচনায় তার প্রথম তীর্থপতি কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ও দ্বিতীয় তীর্থপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন বাংলার বর্ষিষ্ঠ কবি সর্বজনবরেণ্য কুমুদরঞ্জন মল্লিক মহাশয়। পরিণত বয়সে তাঁর পরলোক গমনের পর তীর্থপতি হিসাবে যিনি নির্বাচিত হলেন তিনিও কবি এবং সকলের বয়োজ্যেষ্ঠ, শ্রীনরেন্দ্র দেব, সকল বয়সের সকল সাহিত্যিকের নরেন দা। এ বিষয় তিনি সেকালের আর এক সাহিত্যিক জলধরদার সহিত তুলনীয়।

২

কবি কুমুদরঞ্জন আমার থেকে বয়সে অনেক বড়। তিনি যখন বি. এ. পাশ করেন আমি তখন জন্মাই নি। যখন পড়তে শিখেছি তখন তিনি প্রতিষ্ঠিত কবি। ছোটবেলায় তাঁর কবিতা পড়ে কত আনন্দ পেয়েছি। আমার পরম সৌভাগ্য তাঁর সহিত ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হতে পেরেছিলাম। প্রথম পরিচিত হই তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীজ্যোৎস্নানাথ মল্লিকের গৃহে বহুকাল আগে। তাঁর সহিত শেষ দেখা হয় যখন কয়েক বছর আগে সাহিত্যতীর্থের পক্ষ হতে তাঁকে বিশেষ সম্বর্দ্ধনা জানানো হয়। সেই উপলক্ষে তাঁর ভাষণ শোনবার এবং সভার শেষে বালিগঞ্জ প্লেসে তাঁর পুত্রের বাড়ি পৌঁছে দেবার সৌভাগ্য হয়েছিল।

বাংলার অন্যতম বিশিষ্ট কবি হিসাবে কুমুদরঞ্জনের নাম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্থায়ীভাবে রক্ষিত হবে। তাঁর লেখনী অবিরাম ধারায় যে শত শত কবিতার জন্ম দিয়েছে তারা বিগত কয়েক দশক ধরে কত মাসিক পত্রিকার শোভা বর্ধন করেছে। কাব্যগ্রন্থ আকারে কাব্যরসিকের স্থায়ী আনন্দের আকর হয়ে তারা বিরাজ করেছে। সম্প্রতি তাঁর বিপুল কাব্য ভাণ্ডার হতে সঞ্চিত করে 'কুমুদরঞ্জনকাব্য-সম্ভার' নামে একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

রবীন্দ্রযুগের কবি হয়েও কুমুদরঞ্জন নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিজে রচনা করে নিয়েছেন। তা চিহ্নিত হয়েছে তাঁর কবিতার বিষয়বস্তুর দ্বারা এবং স্বকীয় রচনা রীতির দ্বারা ভগবৎ ভক্তি, দেশপ্রেম ও পল্লীপ্রীতির এই তিন মূল ভাবধারা তাঁর কাব্যস্রোতস্বিনীকে যেন ত্রিবেণী সঙ্গমের মতই বিচিত্র করে তুলেছে। তাঁর বাড়ি অজয়ের ধারে অবস্থিত ছিল। এ বিষয় তিনি কবি

অজয়দেবের সগোত্র। তার বন্যা কতবার তাঁর ঘর ভেঙে দিয়েছে। তার উল্লেখ তাঁর একাধিক কবিতায় পাওয়া যায়। তবু তিনি অজয়কে এত ভালোবেসেছিলেন যে তার কোলেই সারাজীবন কাটিয়ে দিয়েছিলেন।

তাঁর রচনারীতিরও একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। তার খানিকটা প্রমাণ হয় তাঁর জ্ঞানের বিরাট পরিধি হতে। বিশ্বের ইতিহাস ও ভূগোলের সহিত তিনি এমন নিবিড়ভাবে পরিচিত ছিলেন যে ভারতের বাহিরের নানা স্থান এবং নানাদেশের বিশিষ্ট ঐতিহাসিক চরিত্রও তাঁর রচনায় আত্মপ্রকাশ করে বসেছে। এ বিষয় তাঁর সহিত তুলনীয় দ্বিতীয় বাঙালী কবি খুঁজে পাওয়া যাবে না। যেমন বাংলার মাটিতে দ্রাক্ষালতা রোপণকে উপলক্ষ্য করে তিনি বলছেন—

'রাজপুতনায় আনলে তুমি ল্যাপল্যান্ডের মেয়ে।'

কিন্তু তাঁর রচনারীতির সব থেকে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল কবিতায় উপমা-মালা প্রয়োগ, একই বিষয় বর্ণনা করতে বহু উপমার প্রয়োগ। তার দৃষ্টান্ত সাহিত্যে বিরল নয়। রঘুবংশে কালিদাসের গঙ্গাযমুনা সংগমের বর্ণনায়, 'স্কাইলার্ক' কবিতায় শেলীর তার চমৎকারিতার বর্ণনায়, 'কৃষ্ণকলি' কবিতায় কালো মেয়ের কালো হরিণ-চোখের চাহনির রবীন্দ্রনাথ কল্পিত বর্ণনায় তারই সুন্দর দৃষ্টান্ত মেলে। কিন্তু এগুলি ব্যতিক্রম। কুমুদরঞ্জন তার ব্যবহার করেছেন বারবার অনেক কবিতায়। তার একটি দৃষ্টান্ত এখানে স্থাপন করে তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা শেষ করা যেতে পারে। তাঁর 'ছেলেবুড়ো' শীর্ষক কবিতায় তরুণ ও প্রবীণের তুলনামূলক বর্ণনায় প্রথম স্তবকটি এই :

তোমরা কচি, তোমরা কাঁচা, আনন্দ মুকুল,
আমরা হলাম বৃন্তশিথিল ঝরার আগের ফুল।
তোমরা প্রভাত আমরা যে সাঁঝ,
আমরা বিরাম, তোমরা যে কাজ,
তোমরা হলে সত্য খাঁটি, আমরা নেহাত ভুল।

কুমুদ-তীর্থে

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

মোটরবাস যখন নূতনহাটে তার শেষ 'স্টপ'এ গিয়ে দাঁড়াল তখন বেলা আড়াইটা। চৈত্র মাস শেষ হয়ে এসেছে, বৈশাখকে অভিনন্দন ক'রে যাওয়ার আয়োজন চলছে, রাঢ়ের নির্মেঘ আকাশ আর গৈরিক ধরিত্রী যেন জ্বলছে। বর্ধমান থেকে ছোট গাড়িতে এসে যখন নামলাম, চোখ দুটো জ্বালা করছে রুক্ষ প্রান্তরের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে বুলিয়ে। তার পর মোটরবাস তার পর এই নূতনহাটের বাজার।

সমস্ত বাজারটা ঝিমিয়ে রয়েছে।

বাসটা দাঁড়িয়েছে একটা ছোট চায়ের দোকানের সামনে। হোল্ড-অল্ আর সুটকেস তারই এক পাশে নামিয়ে রেখে একটা বেঞ্চে বসলাম। একটানা এতক্ষণ এসে এবার একটু চিন্তায় পড়ে গেছি। খবর দিয়ে আসা হয় নি। বয়স হয়েছে খুব বেশি, একা মানুষ, আর যে ধরনের মানুষ, খবর পেলে হয়তো নিজেই এসে উপস্থিত হবেন। তাতে মন বেশ সায় দেয় নি। তা ভিন্ন, এখন সেটা বুঝেছি, কবির কাব্যও অনেকটা বিভ্রান্ত করেছিল আমায়। অত নরম হাত, যাই ধরেন রসে যেন ফেটে পড়তে চায়, তাই থেকে একটা অতি কোমল স্নিগ্ধ পরিবেশের চিত্র আঁকা হয়ে গিয়েছিল আমার মনে। নামবো, গাছে ঢাকা ভিজে মাটির পথ বেয়ে উঠবো গিয়ে বাড়িতে, এই ছিল ধারণা। একেবারে যে সব উল্টো কাণ্ডকারখানা তা কি করে জানবো?

যখন সব উল্টে গেল তখন আরও একটা ভয় এসে জুটলো, বাড়িতেই যদি না থাকেন কবি!

ভয় আরও এই জন্যে যে—যাঁর আলো দেশময় ছড়িয়ে রয়েছে, তাঁর একেবারে পায়ের কাছে যদি অন্ধকারই জমাট হয়ে থাকে। তাইতো দেখেছি সাধারণ নিয়ম। দোকান প্রায় শূন্য, জন পাঁচেক যারা রয়েছে, দোকানের একটা ছোকরা, বাসের ড্রাইভার, কণ্ডাক্টার, জন তিনেক চায়ের খদ্দের—তারা কি আদৌ জানে কবির কথা? নূতনহাট থেকে কোগ্রাম আলাদাই তো, কতটা আলাদা তাও আবার নেই জানা।

ভয়ে ভয়েই জিজ্ঞাসা করলাম—চেনে কুমুদরঞ্জন মল্লিককে? তিনি কবি মানে ছড়াটড়া লেখেন আর কি (ওদের ভাবাতেই তো বোঝাতে হবে)——কোগ্রামে বাড়ি—কতটা দূরেই বা কোগ্রাম এখান থেকে? আছেন তিনি বাড়িতে? খবর রাখে কেউ এখানে?

ভয়ে ভয়ে অনেকগুলো প্রশ্নই ঠেলে বেরিয়ে পড়ল; যে কোনো একটার একটু যদি সন্ধান পাওয়া যায়।

একটু বিস্মিত কৌতূহলেই সবাই শুনছিল, প্রশ্নগুলো শেষ হলে উত্তরের আর পাল্টা প্রশ্নের ভিড় পড়ে গেল—

কবিকে চিনবে না এ তল্লাটে এমন কেউ আছে নাকি? কথা ফোটার পর থেকেই তার ছড়া আওড়াচ্ছে।

...কোগ্রাম?—আমি সেখানেই যাব।

ঐ তো কোগ্রাম—ঐ বাগানটা পেরিয়েই খানিকটা গিয়ে, অজয়ের ধারে, যেখানে কুনুর এসে অজয়ে পড়েছে—ডাকলে সাড়া পাওয়া যায়।... কোথা থেকে আসছি আমি? দ্বারভাঙ্গা? সে তো পশ্চিমে, অনেক দূর! সেখান থেকে দেখতে এসেছি কবিকে?

বিস্ময়ে সবাই একটু মুখের দিকে চেয়ে রইল। বেশ একটা নূতন আবিষ্কার সবার; তাদের কবি যে এত দূরের মানুষেরও কবি এটা কবে জানত?।

অস্বস্তিটা এড়াবার জন্যে প্রশ্নটার পুনরুক্তি করলাম—'তা আছেন কবি গ্রামে?"

'গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার উপায় আছে যে যাবেন?'

'কেন অসুখ-বিসুখ করেছে নাকি?'—বেশ শঙ্কিত হয়েই প্রশ্নটা করলাম আমি।

'অসুখ-বিসুখ ওঁর শত্রুর হোক।'—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল, একজন মন্তব্যটুকু করে পাশের বেঞ্চটায় উবু হয়ে বসল, বলল—'কোগ্রাম ছেড়ে উনি অন্য কোন ঠাঁই যাবেন তার তো উপায় রাখেননি মা মঙ্গলচণ্ডী। ঐ মন্দিরটুকু আর ঐ অজয়—একেবারে বেঁধে রেখেছে যে ওনাকে। এই তো গত সনের কথা, দামোদরের বাঁধ টপকে বন্যায় সারা দেশ ভাসিয়ে দিলে—কে কোথায় দাঁড়ায় ঠিক নেই, যে যেখানে একটু মাথা গোঁজবার ঠাঁই পেলে, সরে পড়ল, যেদিকে চোখ ফেরান শুধু জল, জল আর জল। তা এক পা নড়াতে পারলে কেউ ওঁকে ভিটে ছেড়ে? ঐ রকম সব ছেলে, এ বলে আমায় দেখ্, ও বলে আমায় দেখ্; তাঁদের সঙ্গে জেলার জজ-ম্যাজিষ্টর—আপনি ছেড়ে দিন গ্রাম কটা দিনের জন্যে, আপনিই যদি শেষ হয়ে যান তো কোগ্রামের থাকে কি? ... না, কোগ্রামই যদি যায়, মা মঙ্গলচণ্ডীর মন্দিরই যদি যায় তো আমার থেকে ফল কি? শেষ হই তো একসঙ্গেই হব শেষ। ... আজ্ঞে হ্যাঁ, তবে আর আপনাকে বলছি কেন?' লোকটার আকার-প্রকারই মানুষের মতন, কিন্তু আসলে আপনার আমার মতন মানুষ তো নয়। বাড়ি-ঘর ঝুপ ঝুপ করে বানের জলে ভেঙে পড়েছে—গেরাস্থি নেই একেবারে। যা করেন মা মঙ্গলচণ্ডী। তা করলেনও তো মা। জাগ্রতা হয়ে আগলে রয়েছেন ছেলেকে, বেইমানি তো করতে পারেন না। অমন পেল্লায় বন্যে কেঁচোর

মতন কোথায় গিয়ে সেঁদুল কেউ টেরও পেলে না। তার পর এখন গিয়ে দেখুন, মেটে ঘরের জায়গায় দালান, পাকা রক, উঠোন—মা চোখ বুজে বসে রইলেন কি করে বলি?'

এই করেই তো গড়ে ওঠে দেশের ট্র্যাডিশন বা ঐতিহ্য—কবিকে নিয়ে মহাপুরুষকে নিয়ে। সত্যকে কেন্দ্র করে কল্পনা হয় বিকশিত। জয়দেব, চণ্ডীদাস, আরও কত সব। কবি হলেন তো তাঁকে কাহিনীতে কাহিনীতে যেন আরও দেশের মাটির সঙ্গে জড়িয়ে রাখতে চায়। কুমুদরঞ্জনকে নিয়েও আরম্ভ হয়ে গেছে।

আসল কথাটা হচ্ছে মূল প্রকৃতিতে সব মানুষই কবি। রাঢ়ের মানুষ বোধ হয় একটু বেশি করেই।

কবিকে এই বোধ হয় দ্বিতীয় বার দেখলাম। প্রথমবার দেখি মহাবোধি হলে, কবি করুণানিধানের সংবর্ধনায়। নিমন্ত্রণ দিয়ে রেখেছিলেন—'একবার আসতে হবে কোগ্রামে।' সেই থেকে সুযোগ খুঁজছি; কিন্তু অন্য সব সুযোগ যেমন সুলভ, তীর্থযাত্রাটা তো তেমন হতে পারে না। এই এতদিনে হল।

ডাকলেই সাড়া পাওয়া যায় একেবারে এতটা কাছে নয়। লোক পাওয়াও যায় না যে মোটঘাটগুলো নিয়ে যাবে, চৈত্র শেষের আকাশ থেকে রোদ ওদিকে ঠিকরে পড়ছে। শেষ পর্যন্ত দুটো ছেলে পাওয়া গেল। বসেই ছিল, কবির আলোচনায় ঘরটা যখন বোধ হয় বেশ একটু কাব্যাভিষিক্ত হয়ে উঠেছে, দু জনেই পৌঁছে দেওয়ার জন্যে খানিকটা যেন ব্যগ্রই হয়ে উঠল। দুটিই মুসলমান। এখানকার স্কুলের ছাত্র। পথে এসে বুঝলাম স্কুল-পড়ুয়ার স্বেচ্ছাসেবক বৃত্তি এটা, তিনশ মাইল থেকে তাদের কবির কাছে এসেছে জেনে বৃত্তিটা প্রবুদ্ধ হয়ে উঠেছে।

গল্প করতে করতে চলেছে। ... 'হ্যাঁ পড়েছি বৈকি ওঁর কবিতা। স্কুলের বইয়ে। তা ভিন্ন এমনি নিজেরাও।' শুনিয়ে যাচ্ছে। গ্রাম পেরিয়ে মাঠ, মাঠ পেরিয়ে অজয়-কুনুরের সঙ্গম। জল নেই এখন। বালি ভেঙে কোগ্রামে গিয়ে উঠলাম। বিশ্বাস হচ্ছে না যে পৌঁছে গেছি।

রাস্তা থেকে উঠেই গাছপালায় ঢাকা একটি প্রাঙ্গণ, ডান দিকে কয়েকটা চালা ঘর, সামনে দালান, কবির বাড়িটা একেবারে কাছে এসে অনিশ্চয়তার ধুকপুকুনিটা বেড়ে গেছে। একরকম নিঃশ্বাস বন্ধ করেই এক জনকে প্রশ্ন করলাম—'কুমুদদা আছেন বাড়িতে?'

তার উত্তর দেওয়ার আগেই বেরিয়ে এসেছেন কবি। অবশ্য কতকটা আন্দাজেই ধরে নিতে হল—সেই প্রথম দেখার পর বয়সের দিকে অনেকখানিই এগিয়ে যাবেন তো। তবে আমার যেটুকু সংশয় তা উল্টে

দিকেই, ভেবেছিলাম নিতান্তই স্থবির একজনকে দেখব, হয়তো এই অসহ্য গ্রীষ্মের তাপে আরাম চেয়ারে নিঝুম হয়ে বসে আছেন। তার জায়গায় বেরিয়ে এসে যিনি দাঁড়ালেন—বেশ সিধা, চোখ দুটি উজ্জ্বল, একটু চঞ্চলও, চলবার দাঁড়াবার ভঙ্গিতেও বেশ একটা সজীবতা রয়েছে। পূর্বাপর একটু মেলাবার ঝোঁক এসেই যায়, তার মধ্যে প্রশ্ন হল—'কোথা থেকে আসছেন আপনি?'

বললাম—'দ্বারভাঙ্গা থেকে আসছি, আমি হচ্ছি...'

'বিভূতি! ...আরে এসো, এসো! আছ কেমন? এলে কি করে? কৈ, চিঠি পাই নি তো কোনো—একটা চিঠি দিতে হয় ব্যবস্থা করতুম—নিজে যেতুম...'

আলিঙ্গন বদ্ধ হয়েছি। প্রশ্ন অনুযোগ বর্ষিত হচ্ছে।

'ওগো, কে এসেছে দেখো!' ছেলেমানুষের মতো উদ্বেল কণ্ঠে ডাক দিতে কবিপত্নী বেরিয়ে এলেন ভেতরের দিক থেকে, কন্যা আর একটি নাতনী। একটি প্রশান্তি ছেয়ে রয়েছে দৃষ্টিতে, সর্বশরীরেই। মনে হল এই ভাব-পাগল, আত্ম-ভোলা মানুষটিকে ঘিরে-ঘুরে সংসারের সীমার মধ্যে ধরে রাখতে রাখতে যেন এইরকমটা দাঁড়িয়েছেন।

কবি বললেন— এ হচ্ছে বিভূতি! তোমার কাছে কত বার বলেছি। বই পড়েছ। তিন শ মাইল দূর থেকে দাদাকে দেখতে এসেছে—সেই দ্বার ভাঙ্গা থেকে এই রোদ মাথায় করে!'

অল্প একটু লজ্জিত প্রশ্রয়ের হাসি নিয়ে আমার দিকে চাইলেন কবিপত্নী। বোধ হয় শিবের সংসারে অতিথি এসে পড়লে শিশুকল্প স্বামীকে নিয়ে শিব-গৃহিনীর এই অবস্থাই হ'ত।

ওঁর দিকে চেয়ে শান্ত কণ্ঠে বললেন—'হাত পা ধুয়ে জলটল খেয়ে আগে একটু ঠাণ্ডা হতে হবে তো।'

মেয়ের দিকে চেয়ে শরবৎ করতে বললেন। আমায় বললেন—'ঘরের ভেতরে আসুন আপনি।'

দাদা বললেন—'হ্যাঁ ভাই, আগে ঘরের ভেতরে এসে বসো।...ওকে তুমি 'আপনি' বলছ কেন? কত ছোট আমাদের চেয়ে।'

বেশ একটু জোরের সঙ্গেই ওঁর দিকে চেয়ে বললেন শেষের কথাগুলো। ওঁরও একটা মস্ত বড় ভুল ধরে দিতে পেরেছেন। বেশ খুশি।

দুদিন ছিলাম। দেখলাম ঠিক এই ধাঁচেই গড়া সংসারটি। শান্ত, সংযত, সংহত। নৈলে এত বয়সেও অফুরন্ত সৃষ্টি সম্ভব কি করে?

শুধু তো অফুরন্ত নয়, নির্মল, নিষ্কলুষ। এ যুগে যা দুর্লভ। শুধু নিষ্কলুষও তো নয়, অনন্ত অসীমের সঙ্গে তাল-লয়ে বাঁধা—

In tune with the Infinite.

দাদার একটা কবিতা থাকলে সমস্ত পত্রিকাটা যেন নিষ্কলুষ হয়ে ওঠে। নয় কি?

আর কি অপূর্ব পরিবেশ!

রোদ বেশ ভালো করে পড়ে এলে আমরা বেরিয়ে পড়লাম ঘর ছেড়ে। সামনের মতো পেছনেও একটা উঠান, তবে ভেতরের উঠান হলেও পাঁচিল দিয়ে ঘেরা নয়, দুদিকে পাকা ঘর, বারান্দা, মাঝখানটা একটু খালি, তার পরেই নানারকম গাছ, লতাগুল্ম, ক্রমেই ঘন হতে হতে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে একটি অবিচ্ছিন্ন ছায়াকে আটকে রেখেছে। মাঝে মাঝে যত্ন করে সাজানো ফুলগাছ। বুনফুলদেরও অবহেলা নেই।

সমস্ত জায়গাটা উঁচু একটা ভিট জায়গা, আস্তে আস্তে নেমে গিয়ে কুনুর নদীতে শেষ হয়েছে। উঁচু বলেই নদীর ওদিকে দিকচক্র পর্যন্ত বিস্তৃত টানা মাঠটা যায় দেখা।

পরিচয় দিতে দিতে দেখিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন। কোন ফুলটার কি নাম, কি ইতিহাস এখানে আসার। কুনুরের ওপারে ক্ষেতের ঐ অতখানিটা ওঁর। বন্যায় ঐ পর্যন্ত জল ঠেলে এসেছিল, জমিটা এদিকে নিতান্তই উঁচু, একেবারে ডুবে যায় নি।...মার দয়া।

মার দয়ার কথা পদে পদেই। মা হলেন মঙ্গলচণ্ডী, সতীর দেহের কোন্ একটা অংশ পড়েছিল এখানে। কোগ্রাম পীঠস্থান। শুধু তাই নয়, চৈতন্যদেবেরও আগমন ঘটেছিল এখানে। শাক্ত-বৈষ্ণবের মিলন-কেন্দ্র।

'গত সনের বন্যায় আমায় কোগ্রাম ছেড়ে যেতে বলে সবাই। কি করে হয় বল তো ভাই? এবার চল ওদিকটা।'

নূতন মন্দিরটা দেখলাম। ঠিক মন্দির নয়, একটি ছোট পাকা ঘর। পুরুত ঠাকুরকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। প্রতিমা দর্শন করে আমরা গ্রামের দিকে এগুলাম।

বিরল-বসতি গ্রাম। হতশ্রীই অনেকটা, যেমন বাংলার সব গ্রামে হয়ে এসেছে। দুঃখের কথাই এসে পড়ে। কি ছিল, কি হয়ে গেছে সেই আলোচনাই করতে করতে মন্থর গতিতে চলেছি।

একটা অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গায় এসে পড়েছি। আকাশটা হঠাৎ যেন বেশি উজ্জ্বল, কাছে পিঠে বড় গাছ না থাকলে যেমন হয়।

একটু এগিয়েই সে কি দৃশ্য, যেন এক মুহূর্তে কোথা থেকে কোথায় গিয়ে পড়েছি!

অজয় নদী। দূরে দিকচক্রের কোল থেকে বেরিয়ে এসে একটা বিরাট অর্ধবৃত্ত সৃষ্টি করে কোগ্রামের একেবারে কোল ঘেঁষে ডান দিকে বেরিয়ে গেছে। এদিককার পাড়টা একেবারে খাড়া, নীচেই খানিকটা ক্ষীণ জলধারা,

তার পর ধু-ধু করছে গৈরিক রংয়ের শুকনো বালি, সূর্যাস্তের শেষ রশ্মিতে রাঙা হয়ে উঠেছে। তার পর পাতলা হরিৎ রং, দূরে দূরে ছড়ানো গাছপালা, তার ওদিকে দিকরেখা।

অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম?

কিংবা প্রশ্নই বা কেন? যুগে যুগে নব নব রূপে যে একই দেবতা প্রকাশ করে ধরছেন নিজেকে, তাঁরই তো করব পূজা—

নান্নুরের বাশুলীর, কোগ্রামের অধিষ্ঠাত্রী মঙ্গলচণ্ডীর, অজয়ের—যা কোল দিল কেন্দুবিল্বকে, কোগ্রামকে, আরও কত অপ্রকট কবিতীর্থকে, কে জানে? সৃষ্টি করল জয়দেব, কুমুদরঞ্জন।

আর পূজা করব স্বয়ং সেই কবিদের, যাঁরা সেই দেবতার পূর্ণতর অভিব্যক্তি।

অস্তরাগরঞ্জিত রাঢ়ের পুণ্যভূমিতে দাঁড়িয়ে আমার প্রণাম পাঠিয়ে দিয়েছি অপ্রত্যক্ষ কবি জয়দেবের চরণে চণ্ডীদাসের চরণে।

প্রণাম জানালাম কুমুদরঞ্জনকে।

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

লীলা মজুমদার

আশির উপরে বয়স সুন্দর মানুষ, তাঁকেই নিয়ে কথা। ধুতি-পরা বাঙালী মানুষ। ছোটবেলা থেকে ছোটদের পত্রিকাদিতে কুমুদরঞ্জন মল্লিকের কবিতা পড়তাম। মনে মনে তাঁর একটা ছবিও এঁকে রেখেছিলাম, কিন্তু তাঁকে চোখে দেখেছে বা তাঁর খুব কাছে গেছে, এমন একটিও লোক পাই নি। এম-এ পড়ার সময় আমার একজন সহপাঠীর উপর মাঝে মাঝেই চোখ পড়ত। তার রোগা লম্বা চেহারা, অল্প কোঁকড়া চুল আর কৌতুকে ভরা চোখ ছিল। তার নাম শুনলাম জ্যোৎস্না মল্লিক, কে যেন বলল সে কুমুদরঞ্জন মল্লিকের বড় ছেলে। অবাক হয়ে গেলাম, কারণ কুমুদরঞ্জন মল্লিককে নিজস্ব একটা পরিবারের মধ্যে কখনো কল্পনা করি নি। তাঁর কথা মনে করলেই মনে হ'ত খোলা ধান খেতের পিছনে লাল সূর্য অস্ত যাচ্ছে; গোরুরা গোঠে ফিরছে; চাষীরা বাড়ি যাচ্ছে; বাড়িতে শাঁখ বাজছে; সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বলছে; তারি সামনে দিয়ে একটা নদী বয়ে যাচ্ছে।

দেখতে দেখতে জ্যোৎস্না আমার একজন স্নেহাস্পদ বন্ধু হয়ে দাঁড়াল। কলকাতার হোস্টেলে থেকে পড়ত, বাড়ির বা বাবার কথা বিশেষ কিছু বলত না। শুধু শুনেছিলাম অজয়নদীর ধারে কোগ্রামে ওদের বাড়ি আর ওর মা-বোনেরা রোজ যত কাজকর্ম করেন, আমি একদিন করলেই অক্কা পেতাম। একে খুব উৎসাহের বাণী বলা যায় না। তবু জ্যোৎস্নাকে দেখলেই তার পিছনে একজন কোমল-হৃদয় কবিকে দেখতাম, যিনি ক্রমে ক্রমে আমার চোখে বাংলার শ্যামল মাটির প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। কবে যে তাঁকে প্রথম দেখেছিলাম মনে নেই, হয়তো অনেকদিন থেকেই বড় চেনা চেনা লাগত বলেই। যখন দেখা হল, দেখলাম গভীর একটা স্নেহের সম্বন্ধ আগে থেকেই তৈরি হয়ে রয়েছে।

লেখকরা দুই রকমের হয়। একজনরা ভেবেচিন্তে কথার পর কথা গেঁথে লোককে চমক লাগাতে চান। আর মুষ্টিমেয় কয়েকজন হৃদয়ের কথা অকুণ্ঠ-ভাবে ঢেলে দেন।

কুমুদরঞ্জন কোন দলের সে আর কাউকে বলে দিতে হবে না। চেহারাটার সঙ্গে বীরভূমের বৈষ্ণব বাউলদের কোথায় যেন সাদৃশ্য দেখতাম। মাথায় খুব উঁচু নন, ঈষৎ কোঁকড়া চুলগুলি বেশ লম্বা, গলায় বোধ হয় কন্ঠিও ছিল মনে হচ্ছে, স্নিগ্ধ চোখে সুগভীর মহাসাগরের ডাক। তাঁরি একটি কবিতা দিয়ে তাঁর প্রতি আমার মনের ভাব খানিকটা প্রকাশ করা যায়—

'পরিচিত নয় তবু তারে লাগছে চেনা-চেনা,
পরের জিনিস যেন আমার নিজের হাতে কেনা।
'পথের ধারের ঘরটা যেন কোন দেশেতে যেতে
একটি দিবস ছিলাম হোথা দুর্যোগেরই রেতে।
... ...
কোথায় গেছে ফুলটি ঝরে গন্ধ আছে জেগে,
কণককেয়ূর কোথায় গেছে কষটি আছে লেগে।
পড়ছে নাকো শব্দ মনে অর্থ টেনে আনে,
গানের কথা হারিয়ে গেছে সুরটি জাগা প্রাণে।'

এ ধরনের মানুষ পৃথিবীতে খুব বেশি আছে মনে হয় না। টাকা দিয়ে, মান-সম্মান দিয়ে এদের কেনা যায় না। কি-ই বা দিয়েছিল দেশবাসীরা কুমুদরঞ্জনকে? সেই কিছু-নার বদলে যা পেয়েছিল তার তুলনা হয় না। তাঁর-ই লেখা আরেকটি কবিতার কথাও সবাইকে মনে করিয়ে দিই। কবিতাটির নাম 'কি পেয়েছি'।

কবি লিখেছেন—

'দীন রটি আমি, যা চাই পেয়েছি, ধূলা-ধূসরিত পল্লীগ্রামে,
শঙ্খ-ঘন্টা খোল করতালে, শুনি হরিনাম ডাহিনে বামে।
জল-বায়ু দিয়ে ঘিরে আছে নদী, ফুলে ফলে বাড়ি ভরিয়া আছে,
পেয়েছি শোভনা শ্যাম বসুমতী—শান্তিতে আছি মায়ের কাছে।
... ...
মুক্ত আকাশ, মুক্ত বাতাস, পূর্ণকুটির, অন্নমুঠি—
তাহার উপরে মায়ের সোহাগ উল্লাসে আমি ফুলিয়া উঠি।'

এ সব মানুষ কি আজকাল জন্মায়? নিজের চোখে গিয়ে একবার দেখেও এসেছিলাম ঐ 'জল-বায়ু দিয়ে ঘেরা' ছোট গ্রামটিকে। জ্যোৎস্নার সঙ্গে গেছিলাম আমরা দুজনে, একটা রবিবার সকালে। বর্ধমান অবধি গাড়িতে, তার পর ওদের একটা জীপে, খোলা পথ দিয়ে বাতাসের বেগে। দেখতে দেখতে পৌঁছে গেছিলাম। দেখি ছোট একটা নদী বড় অজয় নদীতে এসে মিশেছে। একটা সরু লম্বা নৌকোও রয়েছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পার হওয়া গেল।

তার পর একটু উঁচু পাড়ি, তারই উপরে একেবারে নদীর কোলে বসা গাছ পালায় ঘেরা বাড়িটি। পাখির মতো মন যেন কুলায়ে এসে বসল। ফুলের গাছ, ফলের গাছ, তরকারির বাগান, মা-বাবা, সব পেলাম। অনেক দিনের একটা ফাঁকা কিছুক্ষণের জন্য ভরে গেল। বাড়ি বাগান ঘুরে দেখলাম, জল-খাবার খেলাম, বহু কাল পরে কেউ স্নানের জন্য তাড়া দিল। তার পর গাঁ দেখতে গেলাম। সে ভুলবার নয়। আম-কাঁঠাল গাছে ঘেরা

মাটির কুটির, পাকা বাড়ি, পুরনো মন্দির। মন্দিরে প্রাচীন দেবতা। অমন বিগ্রহ কখনো দেখি নি। নাকি কবেকার কোন যাত্রীর ডুবে যাওয়া উপাস্য দেবতা, অজয় নদীর বালি থেকে উদ্ধার করা।

মন্ত্রমুগ্ধর মতো ফিরে এলাম।

দেখি খাবার জায়গা হয়েছে, বাবা উঁচু আসনে বসে তদারক করলেন, মা পরিবেশন করে খাওয়ালেন। দুপুরে হাত পাখা নিয়ে বিশ্রাম করলাম। বিকেলে ফল-ফুল-আনাজ সদ্য ধরা মাছ নিয়ে আবার রওনা হয়ে গেলাম।

আর কখনো যাই নি। কিন্তু ঐ একবার যাওয়াটাই বুকে বাসা বেঁধে আছে। আমার জীবনের 'কি পেয়েছি'র উত্তর।

কোগ্রামে সেই কবিতীর্থে

আশাপূর্ণা দেবী

আমার সতীর্থরা সবাই নাকি দু'একবার করে ঘুরে এসেছেন সেই তীর্থে, 'আমার একবারও যাওয়া হ'ল না', এই আক্ষেপটি ছিল মনে। অনেকেই বলেছে—'ওমা সে কি! আপনি যান নি? আপনাকে এত ভালো বাসেন, আপনি এত শ্রদ্ধা করেন।'

কথাটা সত্যি, স্নেহ পেয়েছিলাম অনেকখানি, প্রথম দেখার দিন থেকেই 'মা আশা' বলে ডেকে কন্যার পর্যায়ে ঠাঁই দিয়েছিলেন। জানি অগাধ স্নেহে ভরা হৃদয়ে সকলেরই ঠাঁই হয়, তবু আমি যেটা পেয়েছি সেটা আমার

দেখা হয়েছে কলকাতায় সভায় সমিতিতে, কবির বালিগঞ্জস্থিত ও গোল-পার্কস্থিত পুত্রদের ভবনে, কিন্তু 'কবিতীর্থে'র প্রাঙ্গণে কবিকে দেখার বাসনা মেটে নি উনিশশো আটষট্টির অক্টোবরের আট তারিখ পর্যন্ত। অথচ বাধাও কিছু ছিল না, সতীর্থদের অনেকেই বলে রেখেছিলেন—'আচ্ছা আবার যদি যাই আপনাকে খবর দেবো', 'আমার তখনকার গোলপার্কের বাসার নিকটতম প্রতিবেশিনী কবির পুত্রবধূও বলে রেখেছিলেন 'আপনাকে একবার নিয়ে যাবো—'

তবু হয়ে উঠে নি।

অবশেষে হঠাৎই একদিন ঠিক করলাম—'একাই চলে যাই, আজই চলে যাই।'

আমরা তখন শান্তিনিকেতনে রয়েছি, সেখান থেকে বাসে যাওয়ার পথ রয়েছে। ন তারিখের সকাল বেলা আমি এবং শ্রীগুপ্ত চড়ে বসলাম বাসে, রওনা দিলাম কুমুদরঞ্জনের কোগ্রামের উদ্দেশে।

অজয় তীরবর্তী সেই ছায়াঘন আর স্নেহঘন গৃহাঙ্গনটিতে পৌঁছতে নৌকোয় চড়া ছাড়া গতি নেই—, অতএব কাদার চড়াও ভাঙতে হ'ল বেশ খানিকটা, তাতেও যেন বেশ তীর্থপথের আস্বাদ।

গিয়ে পেঁছিলাম বোধ হয় বেলা সাড়ে দশটা এগারটা, বিনা খবরে এ রকম আচমকা দু'জন মানুষ গিয়ে পড়ার জন্যে লজ্জা অস্বস্তি একটু হচ্ছিল, কিন্তু লজ্জা টজ্জা সব মুছে গেল কবির অকৃত্রিম হৃদয়ের আন্তরিক আহ্লাদের স্পর্শে। আমাদের দেখে কি খুশি হওয়া, কি ব্যস্ত হওয়া। সত্যিই যেন বাড়িতে মেয়ে জামাই এসে পড়েছে হঠাৎ।

তার পর লজ্জার শেষ কণিকাটিও মুছে গেল কবির পুত্রবধূর মুখে শোনা

কবির সংসার পরিচালনা পদ্ধতির পরিচয়ে। সংসার না বলে অতিথিশালা বললেই বোধ হয় ঠিক হয়। তিথি অ-তিথির বিচার নেই যখন তখন এসেই যায় অতিথি অভ্যাগতের দল। তাদের জন্যে সর্বদাই মজুত রাখা হয় বেশ ভালো মতো রসদ।

'বাবার কোনো কিছুতে রাগ নেই, রাগ দেখা যায় শুধু অতিথির আদর যত্নে একটু ত্রুটি ঘটলে—।' বললেন বৌমাটি।

তখুনিই দেখতে পেলাম তার প্রমাণ। শ্যামল সবুজে ঘেরা শান্ত সেই বাড়িটি—(বাড়িটি না বলে 'তপোবন' বললেই যেন ভালো হয়) ঘুরে ফিরে দেখতে দেখতে দেখি কিছুক্ষণ আগেই এসে গেছে একটি সাইকেলে বর্দ্ধমান ভ্রমণকারী দল।

সারা বর্দ্ধমান জেলা ঘুরতে বেরিয়েছে তারা সাইকেলে গুটি ছয়েক ছেলে। স্নান আহারের প্রয়োজন মেটাতে জায়গায় জায়গায় থামছে। সে দিন হানা দিয়েছে কবির গৃহে। জায়গার মতো জায়গা জুটেছে সে দিন, এমন অতিথি পরায়ণ পরিবার আর কোথায় পাবে? এমন অতিথি বৎসল গৃহকর্তা?

ছেলেগুলি যে কবি কুমুদরঞ্জনের বাড়িটি নির্বাচন করেছে, এতে কবিই যেন ধন্য এমনই ব্যাকুলতা তাঁর তাদের আপ্যায়নের জন্যে। সব রান্না তখনও হয়ে ওঠে নি, অথচ ভ্রমণকারীদের রয়েছে তাড়া, কবি নিজে ছুটোছুটি করে কোথা থেকে যেন নিয়ে এলেন গাওয়া ঘীয়ের শিশি, আচারের বোতল, তাদের তরকারির ঘাটতি মেটাতে বারবার বলতে লাগলেন, 'খাওয়া ভালো হল না। যেন তাদের উনি নেমন্তন্ন করে ডেকে এনেছেন।'

তারা যখন বিদায় নিলো, তখন তাদের 'পাথেয়-স্বরূপ' কিছু টাকা তাদের হাতে গুঁজে দিয়ে কুণ্ঠিত মনে বললেন—'আরো দেওয়া উচিত ছিল, হঠাৎ এসে পড়ায়—'

সবই দেখলাম, অভিভূত হলাম।

পরম বৈষ্ণবের যে গুণগুলি বৈষ্ণব অভিধানে উল্লিখিত, কবি কুমুদরঞ্জন ছিলেন বৈষ্ণবের সেই সর্বলক্ষণ যুক্ত। ভগবৎ প্রেমে বিহ্বল বিভোর বলেই বুঝি মানুষের প্রতি এত ভালোবাসা। মানুষ তাঁর কাছে ভগবানেরই অংশ।

ওরা চলে গেলে, পড়লেন আমাদের যত্ন আদর নিয়ে। তখন বাড়ির গৃহিণী গৃহে অনুপস্থিত, কলকাতায় রয়েছেন, তাই যেন কবির চিত্তে অসহায়তা বোধ।

সংসারে বৌমারা খুবই পটু, তবু বুঝতে পারা যাচ্ছিল, চিরকাল যাঁর উপর নির্ভর করে এসেছেন, তাঁর অনুপস্থিতিতে এটাই স্বাভাবিক। বারবারই বলতে লাগলেন—'এমন সময় এলে মা আশা। যখন তোমার মাসীমা বাড়ি নেই।'

যতই বোঝাই যত্ন আদরে ভরে গেছি, ভরে উঠেছে মন প্রাণ, তবু স্বস্তি

নেই তাঁর। আমরা নিরামিষাশী শুনেতো দুঃখের অবধি নেই। কি করে তবে খাওয়ার যত্ন হবে। অথচ—খেতে বসে আমরা প্রায় অবাক। এত কম সময়ের মধ্যে এত আয়োজন হয়ে উঠলো কি করে। তখনই মনে পড়লো—বাড়িটি অতিথি সেবারই বাড়ি, এতেই অভ্যস্থ সবাই।

খাওয়ার আগে দেখতে পাঠালেন মঙ্গলচণ্ডী, শিবঠাকুর ও লোচন দাসের ভিটে। ফিরে আসার পর গল্প করে বললেন, এইগুলির ইতিবৃত্তি।

দেখতে চাইলাম কোথায় বসে লেখেন। দেখলাম তপোবনের মতো সেই গৃহে অনাড়ম্বর ব্যবস্থার মধ্যে কবির কবিকর্মের ক্ষেত্রটি। বললেন—'ঘরে বসে দেখি এই অজয়। এই অজয় আমার প্রাণ। বারেবারে ও আমার ঘর ভেঙেছে, তবু ওর কোল ছাড়তে পারি না। সরে সরে আবার ঘর গড়েছি। ছেলেরা আর এখানে রাখতে চায় না আমায়, কলকাতায় নিয়ে যেতে চায়। আমি যেতে পারি না। এই অজয় আর কুনুর এদের সঙ্গে আমার নাড়ির বন্ধন, কোগ্রামে ধুলো মাটি আমার তীর্থরেণু।

এই বিশ্বাস আর ভালোবাসা, এ একেবারে নির্ভেজাল। দেখে অভিভূত হচ্ছিলাম, তবু যখন চারিদিকে তাকিয়ে দেখছি, ঘন ঝোপঝাড়ে ভরা এই তপোবন থেকে বেরিয়ে আসবার পথ—কেবল মাত্র জলপথ, এবং অনেক দূরের মধ্যে কোনো বড় ডাক্তার নেই, তখন ভয় পাওয়ার অভ্যস্থ মন, ভয় না পেয়ে থাকতে পারলো না। বললাম—'তা হলেও এখন এই জায়গায় একা থাকা—

সেই পরম শান্ত হাসিটি হেসে বললেন—'একলা কেন? আমার কোগ্রামের মানুষরা? এরা রয়েছে তো আমার কাছে। আর আমি রয়েছি ওদের কাছে। জানো মা আশা, আমি যখন কলকাতায় যাই এরা ভিড় করে নৌকোর ধারে এসে দাঁড়ায়, আর বারে বারে জিগ্যেসা করে কবে ফিরবো। এদের ছেড়ে আমি চলে যেতে পারি?'

তার পর একটু থেমে বললেন—'মা মঙ্গলচণ্ডী তো রয়েছেন।'

লজ্জা পেলাম।

সত্যিই বটে, যিনি স্বয়ং ভগবানকে ভরসা করে বসে আছেন, তাঁর আবার ভয় কিসের? যেন নোঙর বাঁধা খেয়া নৌকোটিতে চড়ে বসে আছেন, শুধু পারের মাঝির আসার অপেক্ষা। এমন আত্মসমর্পিত মূর্তির কাছে মানুষের সাহায্যের ভরসার কথা বলতে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায়। মনে পড়লো সেই সেই লাইন দুটি—

'পূজার ফুলে বাগান রচি অঙ্গনও বেশ বড়ই আছে,
কবিতা মোর পুষ্প হয়ে ফুটছে এখন গাছে গাছে।
আপনাকেই আজ ঘসে আমি মিলিয়ে দিই চন্দনেতে—
বজায় রাখি এই চাকুরী, জীর্ণজরা এই দেহেতে।'

কবি কুমুদরঞ্জন খাঁটি বাংলার কবি, গ্রাম বাংলার কবি। পল্লীপ্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম এই কবির কবিতার উপাদান বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল; উপাদান তাঁর বাংলার ফল ফুল তরুলতা, সংস্কার সংস্কৃতি; উপাদান গ্রাম বাংলার শান্ত জীবনছন্দ, নিভৃত জীবন চর্চা। এদের মধ্যে যে গভীর-গম্ভীর সুন্দর মহান প্রাণপ্রবাহ চির-প্রবহমান কবির প্রেমময় দৃষ্টি তাকে আবিষ্কার করেছে, আপন করে নিয়েছে।

কবি কুমুদরঞ্জনকে তাঁর ধ্যানের ভূমিতে না দেখলে হয়তো এমন করে অনুভব করতে পারতাম না। তিনি শুধু প্রকৃতির কবিই নয়, যেন বিশ্ব প্রকৃতিরই একটি অংশ।

'কবিতা বস্তুটি মস্তিষ্কের জন্য, না হৃদয়ের জন্য?' এ প্রশ্ন অনেক দিনের, বিষয়টা তর্কের, কিন্তু 'সত্য' যেখানে বিশ্বাসের ভূমিতে অচল, সেখানে তর্ক মাথা হেঁট করে। হৃদয় যেখানে প্রেমের ঐশ্বর্যে মহান, মস্তিষ্কের সেখানে নম্র না হয়ে উপায় নেই।

কুমুদরঞ্জনের অশীতিপর জীবনের অনলস লেখনী এই পরিচয়ই বহন করে এসেছে। কবির সমগ্র কাব্যসৃষ্টির মূলে আছে প্রেম। সেই প্রেম জন্মভূমির প্রতি, তার সংস্কার সংস্কৃতির প্রতি, মানবসমাজের প্রতি, জীবন আর জীবন চর্চার প্রতি।

এই প্রেমের পরিসরের বাইরে বেরিয়ে পড়ে বৈচিত্র্য সন্ধান করে বেড়ান নি তিনি। অন্বেষণ করেছেন শুধু মানবপ্রকৃতি ও বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যেকার যোগসূত্রের রহস্যটি। তাই তাঁর কাব্যে সীমার মধ্যে অসীমের অঙ্গীকার। তাঁর কাব্যে বিন্দুর মধ্যেই সিন্ধুর প্রকাশ।

'মস্তিষ্ক' নিত্য নূতনের পসরা সাজায়, 'হৃদয়' চিরদিনের অন্নপাত্র নিয়ে বসে থাকে। মস্তিষ্কের কবিতা জীবন মন্থন করে হলাহলটাকে তুলে এনে পরিবেশন করে, 'হৃদয়ে'র কবিতা সে মন্থনের অমৃত অংশটুকু পাত্রে ভরে নিয়ে এসে মানস ভোজের উপচার সাজায়।

হৃদয়ের কবি কুমুদরঞ্জনের কাব্যে তাই যুগযন্ত্রণার জ্বালা নেই, আছে যুগের ছবি।

কবি কুমুদরঞ্জন যে কেবলমাত্র এই যন্ত্রণাময় যুগেরই কবি নয়, সকল যুগের কবি, সে পরিচয় তিনি নিজেই ব্যক্ত করেছেন 'কবিতার দুঃখ' কবিতায়। বলেছেন—

'এসেছে দারুণ মন্বন্তর, মানুষ করিবে কী?
লাভ তো কিছুই হবে না, করিয়া মনকে হতশ্রী॥
'সুধাকর' নাম না দিয়া চাঁদকে, যদি বলা হয় 'ঘেঁটে'
পড়িবে কি এক মুঠা বেশি ভাত তাতে ক্ষুধিতের পেটে?
কে হবে তাহাতে ধনী?

খুলে লও যদি ধরা গাত্রের সুষমার আবরণী ?
অধিকারী ভেদ সবেতেই আছে, কী বলিবে মহাজনে—
কাশ্মীরী শাল না বুনে শিল্পী গামছাই যদি বোনে ?
যারা অজন্তা মাদুরা গড়েছে'—খ্যাত যারা চরাচরে—
কলালক্ষ্মীই কাঁদিবে, তাহারা—যদি শুধু ঢেঁকি গড়ে।
ভেবো না নেহাৎ উদাসীন আমি, নাহিকো সহানুভূতি,
যদি না ফসল ফলাইতে পারি, জোগাতে না পারি ধুতি।
আমি তোমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা বেদনার কথা কই।
'সুরপুরে' তাহা পাঠাবার, শুধু—যোগ্য করিয়া লই।

... ...

যুগ উপযোগী হতে কহ মোরে তাতে মোর রুচি নাই,
সব দেশকাল জাতির আমি যে— মর্যাদা পেতে যাই।
'ধনিক, বণিক, শ্রমিক,' ক্ষণিক কারও প্রীতিকামী নহি—
আমি জগতের যজ্ঞের হবি, 'দেবতার তরে বহি।'

এই কথা কবির কথা।

স্বীকারোক্তি নয়, কৈফিয়ৎ নয়, শুধু আপন বক্তব্যের সরল ব্যাখ্যা। কুমুদরঞ্জনের কবিতার একটি বড় গুণ সারল্য। যে সারল্য কবির চরিত্রের, কবির জীবন চর্চার, কবির জীবন শিল্পের।

আঙ্গিক চাতুর্যহীন কুমুদরঞ্জন-কাব্যসম্ভার হৃদয় বি-যুক্ত পাঠকের জন্য নয়, হৃদয়যুক্ত পাঠকের জন্য।

উনিশশো আটষট্টির নয়ই অক্টোবরের সেই দিনটি একটি মধুর স্মৃতির সঞ্চয় হয়ে জমা আছে। এমন একটি নীটোল ভালো লাগার দিন জীবনে কটাই বা আসে ?

যখন ফিরে এলাম, তখন সূর্য আকাশের মাঝখান ছেড়ে দিয়ে পাশের পথে—

ঘাটে খেয়াপারের নৌকো, এবং মাঝি সবই মজুত, তবু নিজে এগিয়ে এলেন সেই কাদাভর্তি ঘাটে।

বারবার সতর্ক করে দিলেন।

নৌকোয় চড়ে বসবার আগে বললেন—'তোমার মাসিমা ফিরলে আবার এসো।'

জানতাম আবার যাওয়া হবে না, কোনোদিনই হয়তো হবে না, তাই শুধু প্রণাম করলাম।

নৌকো ছেড়ে দেবার পর সেই প্রায়-অজয় গর্ভস্থিত 'তরুলতা গুল্মে

ঘেরা চারু তপোবন' খানি চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল, হঠাৎ মনে এলো—বাল্যে শোনা সেই বাংলাদেশের মন মাতানো গানটির বিখ্যাত সেই লাইনটি—'ওরে মাঝি তরী হেথায় বাঁধিস নেকো—আজকে সাঁঝে—'

এই গান দিয়েই কবি কুমুদরঞ্জনের নামের সঙ্গে প্রথম পরিচয়। সেদিন এই মধুর করুণ সুরে গাওয়া গানটি ড্রইংরুম থেকে মাঠ ঘাট পথ প্রান্তর সর্বত্র ধ্বনিত হয়েছে—। কে না শুনেছে এ গান? কার স্মৃতির খাতায় জমা হয়ে নেই এর অন্ততঃ একটিও লাইন?

শান্তিনিকেতনে ফিরে আসার পথে মনে পড়ছিল সারাদিনের অনেক খুঁটিনাটি কথা, অনেক ক্ষণমুহূর্তের গভীর স্পর্শের স্বাদ, উদার স্নেহময় সেই হৃদয়টির অনেক ছোট ছোট প্রকাশ। যা ভাষায় ব্যক্ত করতে গেলে হয়তো মূল্য হারায়, অক্ষয় হয়ে থাকে অনুভূতির গভীর স্তরে।

কবি কুমুদরঞ্জনের কাব্যের মূল্যায়ন করতে আলাদা কলমের কলমী আছেন, সে মূল্যায়ন হবে হয়তো আরো অনেক পরে।

আজকের এই বুদ্ধিপ্রধান যুগ হয়তো হৃদয়ের প্রতি উদাসীন, চিন্তার জটিল জালের মধ্যে পাক খেতে খেতে সারল্যকে করছে অবজ্ঞা, কিন্তু বুদ্ধির শান পাথরে ঘসে ঘসে জর্জরিত মস্তিষ্ক আবার একদিন হৃদয়ের দরজায় হাত পাততে না এসে পারবে না। 'কুমুদরঞ্জন' রইলেন সেই কালের জন্যে।

গ্রাম বাংলাকে হারিয়ে-ফেলা বাঙালী আবার যেদিন 'খাঁটি বাংলার ছবি'-খানি দেখবার জন্যে অন্বেষণ করে বেড়াবে—কুমুদরঞ্জনের কাব্য রইলো সেই পরিচয় হারা বাঙালীর জন্যে।

পুরাতন স্মৃতি

প্রমথনাথ বিশী

সে অনেকদিনের কথা, পঞ্চাশ বছরের বেশি বই কম নয়। তখন আছি শান্তিনিকেতনে, গ্রীষ্মের ছুটি চলছে। ছাত্র ও শিক্ষক অধিকাংশই চলে গিয়েছেন, আছি আমরা অল্প কয়েকজনে মাত্র। তখনকার শান্তিনিকেতন আজকার মতো বারো মাসের জনসংখ্যার পল্লী হয়ে ওঠে নি, ছুটির সময়ে খাঁ খাঁ করত।

সময়টা মনে হচ্ছে বিকালবেলা, রান্নাঘরে গিয়েছি জলযোগের আশায়। এমন সময়ে নিরীহ ভালো মানুষ গোছের একজন ভদ্রলোক সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। দোহারা চেহারা, মাথায় খুব উঁচু নন, মাঝখানে চেরা সিঁথি—মুখে স্নিগ্ধ শান্ত একটি প্রসন্নতা, গায়ে মটকার পাঞ্জাবি। তাঁর ভাবগতিকে বুঝতে দেরি হল না যে তিনি নবাগন্তুক, কোনোপক্ষে কেউ কাউকে চেনে না।

পাঠকের হয়তো মনে হতে পারে চল্লিশ বছর আগেকার এমন অপরিচিত লোককে মনে ক'রে রাখা, মায় তার চেরা সিঁথি ও মটকার পাঞ্জাবি সমেত একটু বিস্ময়ের নয় কি? সাধারণ ক্ষেত্রে তাই, এ ক্ষেত্রে নয় বলেই এই প্রবন্ধ লিখতে হ'ল।

ভদ্রলোকের আসবার কারণ শুনলাম, তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে চান।

আমি বললাম—তিনি তো শান্তিনিকেতনে নেই, মাদ্রাজের দিকে গিয়েছেন।

আশাভঙ্গের দাগ ফুটে উঠল তাঁর মুখে।

তবে তো—

কথাটা শেষ হল না, শেষ করবার আর প্রয়োজনও ছিল না।

বেশ বুঝতে পারা গেল যে আসাটাই বৃথা হল তিনি বলতে চান। তাঁকে জলযোগ করিয়ে বিদায় দিলাম। খানিকটা পথ সঙ্গে সঙ্গে এলাম। যখন তিনি স্টেশনের পাকা সড়কে উঠেছেন, জিজ্ঞাসা করলাম—আপনার নামটা শুনতে পাই কি?

একটু ইতস্ততঃ ক'রে, নামকরা লোকে অনেক সময়েই এইরকম ইতস্তত করেন, কি জানি অপরপক্ষ নামটা চিনতে পারবে কিনা—তিনি সঙ্কোচের সঙ্গে বললেন—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

এবারে আমি তাঁকে যে নমস্কার করলাম সেটা অপরিচিতকে বিদায়দানের নয়, অতি পরিচিত ব্যক্তিকে স্বাগত করবার।

এই হচ্ছে কবি কুমুদরঞ্জনের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়ের স্মৃতি।

তাঁর স্মারক সংখ্যা উপলক্ষে এই পুরাতন স্মৃতিটি উপহার দিলাম অনুরাগী পাঠকবর্গকে। কবিবর অমিতায়ু হোক—এই আমাদের কামনা।

এই প্রথম স্মৃতি প্রসঙ্গে মনে পড়ে কবি কুমুদরঞ্জনের শেষ স্মৃতি। সেদিনের তরুণ কবি এখন বৃদ্ধ, তবে সে বার্দ্ধক্য কালিদাস কথিত জরাহীন বার্দ্ধক্য। যৌবনের প্রসন্ন শান্তশ্রী তখন প্রসন্নতর, বুঝতে পারা যায় একটি সার্থক জীবনের আশীর্বাদ তাঁকে মণ্ডিত করে রয়েছে। কল্‌কাতায় কোন সভা উপলক্ষ্যে এসেছিলেন, সভাতেই সাক্ষাৎ।

সেই শেষ।

কিন্তু তখন কে জানতো শেষ।

শেষ নিশ্চয় নয়, কুমুদরঞ্জন রয়ে গেলেন তাঁর কাব্যে।

স্মৃতিচারণ

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

১৯১৮ সাল। আমি তখন প্রমথ চৌধুরীর এক্তিয়ারে জমে বসেছি, রাতা রাতি বিত্তহীন, সম্পদহীন, বিদ্যাহীন ; কলকাতার সাহিত্য-সংস্কৃতি সমাজে সুপরিচিত হয়ে উঠেছি।

কবিবর কালিদাস রায় তখন উলিপুর স্কুলের হেড মাষ্টার। তাঁর সাথে পত্রযোগে আলাপ জমিয়েছি। তাঁর কাছেই পেলাম কুমুদদার ঠিকানা। কুমুদদা তখন মাথরুন স্কুলের হেড মাষ্টার। মহারাজ মনীন্দ্র নন্দীর প্রতিষ্ঠিত এই স্কুলে দীর্ঘকাল কুমুদদা হেড মাষ্টার ছিলেন। ঠিকানা পেয়ে তাঁকেও চিঠি লিখলাম। সঙ্গে সঙ্গে জবাব পেলাম,—চিঠির মধ্যে আন্তরিকতা পূর্ণ স্নেহের স্পর্শ। কবি কুমুদরঞ্জনের তখন খুবই নাম ডাক। বাংলাদেশের হেন সাময়িক পত্র ছিল না—যাতে তাঁর লেখা বেরোয় না। তাঁর রচনা স্বতঃস্ফূর্ত এবং এর প্রাচুর্য এত যে সকল কাগজকেই তিনি খুশি করতে পারতেন।

প্রমথ চৌধুরীর এক নম্বর ব্রাইট স্ট্রীটের বাড়িতে আমি ও আমার সমবয়সী চার পাঁচটি যুবক মিলিত হতাম। তার মধ্যে ডি. এল. রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র শচীন এবং সুধীন প্রায়ই এসে বাংলাদেশের কবিতা সম্বন্ধে আলোচনা করতেন। কবি কুমুদরঞ্জনের সঙ্গে আমার চিঠিপত্রে আলাপ আছে জেনে জিজ্ঞেস করলেন—'তুমি কি জানো, কুমুদরঞ্জন মৃতদার?' আমি বললাম—'জানি না।' আমাদের সেই আড্ডায় সেদিন এই সাব্যস্ত হ'ল যে নিশ্চয়ই কুমুদ মল্লিক মশাই বিপত্নীক। আমি জিজ্ঞেস করলাম—কি করে এ সিদ্ধান্ত করছ? সেই সময় অতি পরিচিত একটি গানের রচয়িতা কুমুদ মল্লিক। গানটি হচ্ছে,— 'মাঝি তরী হেথা বেঁধোনাকো আজকে এ সাঁঝে'। আমি বললাম—'গানটি আমি জানি। কিন্তু এর মধ্যে এমন কিছু আমি পাই নি যাতে—অনুমান করতে পারি তিনি বিপত্নীক। আচ্ছা, কুমুদদাকে আমি—চিঠি লিখব এ গানটির সম্বন্ধে।'

বলা বাহুল্য আমি কুমুদদাকে চিঠি লিখলাম এ গানটির ইতিহাস সম্বন্ধে। পত্রোত্তরে দাদা জানালেন গানটি আমার কোনো বন্ধুর পত্নী বিয়োগের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। একবার তাঁরা ক'জন বন্ধু মিলে নৌকাযোগে বেড়াতে বের হয়েছিলেন। নদীর পাড়ে এক গ্রামে উঠে তাঁরা রান্নাবান্না করে খাওয়া দাওয়া করবেন ঠিক করলেন। ঘাটটি ভালো। কিন্তু তাঁর সে বন্ধুটি আপত্তি জানালেন এখানে নয়। আর একটু দূরে গিয়ে আমরা জায়গা ঠিক করে

খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত করব। 'এখানে নয় বেশ?' জবাবে তিনি জানালেন, এই গ্রামেই তাঁর শ্বশুর বাড়ি ছিল এবং এই নদীর পাড়েই তাঁর স্ত্রীর দাহকার্য সম্পন্ন হয়েছিল।...সঙ্গীরা তাঁর কথামত ঘাটান্তরে গিয়ে রান্নার আয়োজন করলেন। এই ঘটনাটি কবিতার উৎস। কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল 'ভারতবর্ষ' ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যায় সচিত্র।

বলা বাহুল্য এই চিঠি কুমুদরঞ্জন মল্লিককে আমার আরও ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে আনতে সাহায্য করেছিল। তার পরে দীর্ঘকাল যখনই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে বা চিঠিপত্র লিখেছি, তখনই তাঁর হৃদয়ের ঘনিষ্ঠ পরিচয় পেয়েছি। তিনি পল্লীগ্রামকে ভালোবাসেন, সেটা সখের ভালোবাসা নয়, পল্লীগ্রামের সহস্র অসুবিধা সত্ত্বেও তাঁর মন শহর বিমুখ। বন্যায় দেশ ভেসে গেছে। কুমুদ মল্লিক কোনো ক্রমে তাঁর নিজের বাড়ি ছেড়ে পাশের এক দোতলা বাড়ির ছাদে অবস্থান করছেন। জেলা শাসক খবর পেয়ে তাঁর উদ্ধারের জন্যে লঞ্চ নিয়ে এসে হাজির। না, গ্রামের একটি লোকও যতক্ষণ গ্রামে থাকবে ততক্ষণ তিনি দেশ ছাড়তে পারবেন না। কিছুতেই তিনি তাঁর প্রস্তাবে রাজী হলেন না। গ্রামে ডাক্তার নেই; রোগে পরামর্শে তিনিই একমাত্র ডাক্তার। আমাদের নিয়ে পল্লীভ্রমণে বেরিয়ে তিনি যাকেই পান জিজ্ঞেস করেন—'তোর ছেলে কেমন আছে, তোর বৌ কেমন আছে, ওষুধে কি কাজ হচ্ছে? কাকে সাগু দিতে হবে কাকে বার্লি দিতে হবে বিধান করতে করতে চলেছেন।

সাহিত্যের চেয়ে যে হৃদয় বড়, অন্তত কম নয়, এ কথা কুমুদ মল্লিকের জীবন ভাবলেই আমার মনে হয়। তিনি ভক্ত, বৈষ্ণব। তিনি জীবনে সুখী। ভগবানের দয়ায় তিনি যথেষ্ট দীর্ঘ জীবন লাভ করেছেন। দূরে থাকি, কালে ভদ্রে দেখা হয়; চিঠি পত্রেই সংবাদ পাই। সংবর্ধনা প্রস্তাবের উত্তরে ৬, ৭, ৭৪ তারিখে কোগ্রাম থেকে আমাকে লিখেছিলেন—

কল্যাণবরেষু

ভাই পবিত্র, তোমার চিঠি পেয়ে সুখী হইলাম। মাঝে মাঝে পত্র দিও। আমার শরীর তত ভাল নয়। কোথাও যাইতে সাহস করিনে, ছেলেরা নিষেধ করে। কোগ্রামে আসিলে সুখী হইব। নভেম্বর মাসের পর হইলেই ভাল হয়। আশা করি তুমি কুশলে আছ। আমি একটু ভাল আছি। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

আমার জীবনে কুমুদরঞ্জনের আশীর্বাদ একমাত্র সম্বল।

কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের উদ্দেশে

বনফুল

আমার যাঁরা মনের মানুষ থাকেন তাঁরা দূরে দূরে,
তাদের সাথে আলাপ চলে রঙে রেখায় সুরে সুরে।
আসেন তাঁরা অলখ পথে
অচিন্ রূপে অরূপ রথে,
নিমন্ত্রণের অপেক্ষা নেই, বসেন এসে হৃদয় জুড়ে।
তুমি আমার সেই আপনার গোপন মনের মোহন বঁধু,
তোমার তরেই জমিয়ে রাখি প্রেম কমলের অমল মধু।
আস তুমি ফুলের বাসে
শিশির ভেজা শ্যামল ঘাসে,
চাঁদনী রাতের রূপ-সায়রে হঠাৎ দেখি হাসছ তুমি।
পাখির গানে ডাক দিয়ে যাও চমকে দিয়ে কাননভূমি।
পথ চলতে যখন তখন তোমার দেখাই পাই যে প্রিয়।
পাই যে মনে ক্ষণে ক্ষণে পরশ অনির্বচনীয়।
এই দুনিয়ায় সত্য-ভুলের
ফোটা ফুলের, ঝরা ফুলের
সব সাজিতেই তুমি, কবি, চিরন্তন ও রমণীয়।

তোমার সাথে, সখা আমার, ছিল একটা গোপন কথা,
বলতে কিন্তু পারছি না যে, অবাঙ্‌ময়ী আকুলতা।
দিচ্ছে বাধা, দ্বন্দ্ব দ্বিধা সংকুচিত হচ্ছি লাজে,
বলতে যেটা চাইছি সখা বলাটা তা হল না যে।
মনের কথার ফুটছে না বোল
হচ্ছে খালি আবোল-তাবোল,
বৃথা বলার চেষ্টা করে তোমার কাছে লজ্জা পেলাম,
তোমায় যেটা বলার ছিল না-বলাতেই রয়ে গেলাম।

কুমুদরঞ্জনকে

বাণী রায়

রাত্রির প্রহরে জাগে কুমুদকহলার
সারি সারি সরসীর বুকে পদ্মহার।
সারা রাত্রি জেগে থাকে দু চোখ আমার,
হে কবি, করুণ-মধু গানেতে তোমার।

কুমুদরঞ্জন

প্রেমেন্দ্র মিত্র

যেখানে আকাশ কবে   নীল ছিল মনে নাই আর,
দেওয়ালে আড়াল দৃষ্টি   পরিক্রমা বাঁধানো বিপাকে,
হৃদয় বেড়ায় ঘেরা   কাঁটা তার লোভ ও ঘৃণার,
প্রাণের জাহ্নবী সেও   পঙ্কগাঢ় গ্লানির প্রবাহ।

তাই মুগ্ধ মনে ভাবি   কোথায় সে শীতল সায়র
দর্পণের মতো আজো   মেলে আছে নির্মল হৃদয়,
অকৃত্রিম অনাবিল   জীবনের মহিমা-মাধুরী
যার মাঝে ঝলকায়   শুচিস্নিগ্ধ সারল্যে বিম্বিত।

একটি নিভৃত শান্তি   খোঁজে যবে কীর্তিক্লান্ত মন
পরম সুধার সত্রে   ডাক দেন কুমুদরঞ্জন।

কুমুদরঞ্জন প্রশস্তি

কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

কুমুদরঞ্জন কবি, যবে রবি অপম্রিয়মান,
মলিন নলিনী-দলে ফুটাইলে হাসিত কুমুদ,
বঙ্গের সরসী-জলে মজাইলে বিবান বিবুধ
কৌমুদী-প্লাবনে তব, কেহ মগ্ন, কেহ মজ্জমান।

'বন-তুলসী'র কবি, পল্লী 'বন-মল্লী' তব দান,
'ভুঁই-চাঁপা', 'স্বর্ণ-চাঁপা' ফুটাইয়া তুলিলে অর্বুদ
গদগদ কণ্ঠে তব, গান নহে, আনন্দ-বুদ্বুদ,
পল্লীর স্বভাব-কবি ভাগবত ভাবাতুর প্রাণ।

ওগো মাঝি! তরী তব ভেসে চলে ভরা নদী-মাঝে,
শিথিল বকুল ঝরে, চিতা'পরে সে কোন বধূর?
আজো তার কাঁকণের রিনিঝিনি কর্ণে যেন বাজে
ম্লান সন্ধ্যা ব্যথাতুর অবিস্মরণীয় সে মধুর।

'উজানি' জাহ্নবী-নীরে 'অজয়ের' হে অজেয় কবি!
বঙ্গের ঐতিহ্যপূত পুরাণের তুমি পুরোহিত,
কবিকঙ্কণের তীর্থে লোচনের মূর্ত প্রতিচ্ছবি
কুমুদ কোগ্রাম শশী পূর্ণিমার অন্তে অস্তমিত॥

একটি প্রণামী কুমুদরঞ্জন মল্লিক

জ্যোতির্ময়ী দেবী

হে কবি পরম বৈষ্ণব কবি!
তবু কবিকুলে সে বৈষ্ণব কবি তুমি নহ।
গাহ নি তাদের মতো রাধাশ্যাম প্রেম কথা মিলন বিরহ।

এ তুমি বৈষ্ণব কবি—'তৃণসম নম্র নত'। তারি মতো শ্যাম—
প্রাণময় নিয়ত হাসিভরা মুখ আনন্দিত মন।—
তৃণসম মাটিমাখা—ঠাঁই যার যেথা শালগ্রাম।

এ তুমি বৈষ্ণব কবি 'তরুসম ধৈর্য ধর' অজয়ের মহানদতীরে।
এ তুমি বৈষ্ণব জন আপনার প্রীতি প্রেম দিতে 'অমানীরে'।

কোথা যশ কোথা খ্যাতি বিদগ্ধ নগর জন আর ধন মান।—
খুঁজিয়া ফেরো নি কিছু।
চিরদিন শান্তমন 'একতারা'খানি বাজাইয়া গাহিয়াছ বৈষ্ণব বাউলের গান।

কবি কুমুদরঞ্জন

কৃষ্ণধন দে

বাংলার মাঠ, ঘাট, পথ, হাট, কুটির, সরসী,
বাংলার নদনদী, বাংলার সুখদুঃখ সবি,
বাংলার পুণ্যপীঠ,—গৌরবের লাঠি আর অসি,
—তোমার সরল ছন্দে রূপায়িত, হে দরদী কবি!

বাংলার প্রেমতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব সাধনসঙ্গীতে
বাংলার চিন্তা, আশা, বাংলার অন্তরের বাণী
তুমি ফুটায়েছ তব প্রাণময় মধুর ভঙ্গিতে
হে কবি, তোমার দৃষ্টি বাংলার মরম-সন্ধানী।

শিশুর সারল্যে আর প্রবীণের জ্ঞান-তপস্যায়
তোমার সে-কবিচিত্ত বিলায়েছে কত রত্নকণা,
পল্লীর শ্যামলকুঞ্জে আমরণ বাণী-সাধনায়
বাংলার প্রাণগীতি তব ছন্দে পেয়েছে মূর্ছনা।

তব স্নিগ্ধ জোছনায় উদ্ভাসিত সাহিত্যগগন,
বাংলার চিরপ্রিয় কবি তুমি কুমুদরঞ্জন।

অজয়ের কবিকে

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

বনতুলসীর গন্ধ ছড়ায় অজয়ের কূলে কূলে
উদাসী সন্ধ্যা কান পেতে শোনে বাউলের একতারা
কার ডিঙি চলে সোনাঝরা স্রোতে পালের পাখনা তুলে
তারাদের ডাকে মাটির প্রদীপে শিখারা দিয়েছে সাড়া।

দূর অজয়ের সেই মায়া আসে তোমার কবিতা হয়ে
বুকের তন্ত্রী বেঁধেছ তোমার গোপীযন্ত্রের তারে
রাঙা সন্ধ্যায় ভাসানো-তরীর ভাটিয়ালী গান বয়ে
হে কবি-প্রদীপ, সুরের আলোটি পাঠালে আকাশ পারে।

বৈদ্যুতী বাণে বিদ্ধ হৃদয়—যন্ত্রণা-জর্জর
এই কলকাতা, এই যে জীবন—বিরাম শান্তি হারা,
নিথর রাত্রে আধো ঘুমে শোনে স্বপ্ন নদীর স্বর
আজো একবার ভুল করে খোঁজে ফেলে আসা একতারা।

কবি ও কবিতা কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক স্মরণে

গোপাল ভৌমিক

সরস মধুর গ্রাম্যজীবনের ছবি
এঁকেছ সহজ সরল রেখার টানে,
শিশু বয়সেই প'ড়ে সে কবিতা, কবি,
লেগেছে মধুর, বুঝি বা না বুঝি মানে।

আজ বড় হয়ে বুঝেছি তোমার গানে
শান্ত মধুর যে রসের খেলা চলে
সে তো সহজাত হৃদয়-ভাসানো বানে
ভাসে ও ভাসায় দু পায়ে সময় দলে।

দেখেছি তোমাকে কবিতার প্রতিরূপ
বিভোর কি এক মধুর জীবনরসে;
দেখলে তোমাকে মুহূর্তে হয় চুপ
অশান্ত মন, ভরে ওঠে সন্তোষে।

তোমার জগতে প্রবেশের অধিকার
নাই থাক তবু দেখেছি বাহির দ্বার।

কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক

সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবেম শারদং শতং—জীবনের আলোছায়ার দোলায় এক শ'টি শরৎকাল কর্মোচ্ছল উজ্জলতায় কেটে যাবে এই ছিল বৈদিক যুগের মানুষের অরুণ প্রত্যাশা আর তার কবিমনীষিদের কবিচিত্তের আশীর্বাদ, শুধু জৈববৃত্তিতে বেঁচে থাকা নয় মনন শক্তিতে, মেধায় মনীষায়, স্মৃতিতে কীর্তিতে দেখা, শোনা, বাঁচার মতো বাঁচা—পশ্যেম শারদং শতং শৃণুয়াম শারদং শতং।

কবি কুমুদরঞ্জন এক শ বছর বাঁচেন নি বটে, তাঁর মৃণ্ময় দেহবিগ্রহ শতায়ুর আশা পূরণ করে নি, তবু তিনি দীর্ঘায়ু ছিলেন। কবি কুমুদরঞ্জনের কথা মনে হলেই আমার স্মরণে আসে নদীর বুকে ভেসে যাওয়া নৌকো থেকে বাঙালী বাউলের এক কলি মারফতী গান—ধীরে ধীরে বাইওরে মাঝি, যেন মায়ের কাঁদন শুনি—এই কান্না যে তাঁর নিজের বুকের সাত রাজার ধন মাণিক, যা উদ্বেলিত করেছিল তাঁর বাণীপদ কোকনদকে, প্রস্ফুটিত করেছিল দলমাদল ছাড়িয়ে শতদলে—'তরী হেথা বাঁধবো নাকো আজকে সাঁঝে...' যার ম্লান মাধুরী কতই ব্যথা আনছে ডেকে, বিষাদ ছবি দিচ্ছে এঁকে—

একটি গৃহ হেথায় কি না
ছিল আমার বড়ই চেনা
ছবিটি আজও আমার হৃদয় কোণে সদাই বাজে।

এককালে সারা বাংলাদেশে পূবে পশ্চিমে, উত্তরে দক্ষিণে এই গানটি অতি সুপরিচিত ছিল। তাঁরই কথায় বলি—গীতটি জানি, রচিত কার জানিনে তার নাম, কোন সে দেশের লোকটি সে যে কোথায় তাহার স্থান। অনেককে ভুল করে বলতে শুনেছি যে এই গানটি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের—বিরহ দীপন দীপিকা জ্বালিয়ে কবি চলেছেন নদীপথে—তারই তীরে তীরে শিথিল বকুলঝরা পল্লীবাট, শঙ্খমুখর সন্ধ্যা—প্রিয় করছেন প্রিয়ার স্মৃতিচারণ।

কবি কুমুদরঞ্জনের সাহিত্যিক জীবনের ইতিহাস ও তার মূল্যনিরূপণ এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। তিনি ডুব দিয়েছিলেন শুধু পল্লী বাংলার হৃদয় রহস্যে নয়, শান্তরসাস্পদ কাব্যই তাঁর কৃতিত্ব নয়, ভারতের বিচিত্র বীর্যে মানুষের চিরন্তন অভিজ্ঞতাকে প্রতিষ্ঠিত করে চেয়েছেন স্বচ্ছ প্রাঞ্জল কাব্যসুষমায় মণ্ডিত করে, চিন্তাশক্তিতে বিতর্কে নয়, বিচারে নয়, বিশ্লেষণে নয়, কল্পনার উদার আতিথ্যে, বনফুলের ভাষায় বলতে গেলে—

কল্পনাজাল অল্প না জেনো নাহিকো গণ্ডি পরিধি তার।
অবাঙ মানস গোচর তাহাতে ধরা পড়ে যায় বারংবার।

কবি কুমুদরঞ্জন সেই অতিপরিচিতের মধ্যেই অবাঙমানস গোচরকে পেয়ে গেছেন—To me the meanest flower that blows can give, thoughts do often lie too deep for tears. তিনি দেখেছেন ভক্ত হৃদয়ের আকুতি দিয়ে শুধু নীললোহিতের সমাহিতির তীর্থ নয়, চেতনার রং-এ প্রেমিকের 'হাঁ'। একদিকে শান্তির পারাবার, নৈঃশব্দের তটভূমি বাংলার নদীর ধারের ছায়াবহুল গ্রাম, তারই মাঝে 'ধূর্জটির মুখের পানে পার্বতীর হাসি' আর একদিকে স্তব্ধ অচঞ্চল আকাশ—যেন দীপ্ত অর্ধনারীশ্বর বসে আছেন পূজার বেদীতে—নবজীবনের বিপুল ব্যথায় শ্যাম ও শ্যামা জাগছে। এইজন্যই তিনি বাংলা সাহিত্যের আসরে শাশ্বত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। মনে পড়ছে কবিগুরুর কথা—

বহুদিন ধরে বহুক্রোশ দূরে
বহুব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা, দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই শুধু চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপর একটি শিশির বিন্দু।

কোগ্রামের কবির চোখে এই সোনার বরণ রাণীর নিত্য সন্দর্শন। ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে তিনি বর্ধমান জেলার অজয়ের ধারে কোগ্রামে (প্রাচীন উজানি) মাতামহ গৃহে বৈদ্য বংশে জন্মগ্রহণ করেন—তাঁর পিতৃপুরুষদের নিবাস ছিল শ্রীখণ্ড। ১৯০৫ সালে গ্রাজুয়েট হবার পর তিনি নিকটবর্তী মাথরুণ উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন ও পরে প্রধান শিক্ষক হয়ে অবসর গ্রহণ করবার পর তিনি জন্মস্থানেই বাস করেন। তাঁর গৃহটি ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের আশ্রম বললে অত্যুক্তি হয় না। অজয় ও কুনুরের সঙ্গমে সেই পীঠস্থান। সামনেই স্বপ্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির। বহুবার বন্যায় তার বাসস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, পথঘাট ডুবেছে, তবু তিনি তার আশ্রম পরিত্যাগ করেন নি—শান্ত নির্ভীক, সদাপ্রসন্ন এই জ্ঞান-তপস্বী মনস্বী। একে শুধু পল্লীপ্রীতি বলবো না, আত্মমগ্নতা বলবো না, একে বলবো মানুষের সেই চারিত্রিক দৃঢ়তা যা দুঃখে অনুদ্বিগ্ন মন হয়, সুখে বিগতস্পৃহ হয়, সব কিছুকেই গ্রহণ করতে শেখায়, সব পরিবেশকেই সহাস্যবদনে মেনে নিতে বলে। শুনি, তিনি নাকি রোমান্টিক ভাবজগতে বাস করতেন, মৃদু পেলব কোমল ভাষা ব্যবহার করতেন, নানা অভিজ্ঞতার ঝড়ঝঞ্ঝার 'কমপ্লেক্স'এর চুলচেরা বিচার তাঁর লেখার মধ্যে অনাগত, অনাদৃত শুধু একটা lyrical emotional extravagaura-র মধ্যদিয়েই তাঁর কাব্যপরিক্রমা—জীবন যে একটা পিষ্ট ক্লিষ্ট কঠোর সত্য, সংশয়ের, সন্দেহের জ্বালার তীব্রতা যে সংসারে আছে সে কথা কবি কুমুদরঞ্জন জানেন না। তিনি ভাবজগতে বাস করেন,

'এরোটিক' ছবি আঁকেন, ভূমির চেয়ে ভূমার দিকেই তাঁর টান্ তাঁর দৃষ্টি গণ্ডিবদ্ধ, তিনি বাংলার পল্লীকবি—এবং তাঁর কবিমন সেই দুঃখ দুর্দশাকেও বেমালুম মোলায়েম করে নিয়েছে ভাষার মাধুর্যে 'ভাবরসৈক' সিক্ত করে। তাঁর রসঘন বেদনাবোধ, দরদীমন, অনুভূতিপ্রবণ চিত্ত কাজল লতার রোদনভরা অঞ্জন চোখে মেখে অবাস্তব এক চিত্র আঁকায় সাহায্য করেছে। না, এই ধরনের শ্লেষ বা বিশ্লেষণ ঔচিত্যবোধের সীমা লঙ্ঘন করে। এই প্রীতি তার সহজাত কবচ ও কুণ্ডল, এই শক্তিই তাঁকে কবিতীর্থে উত্তীর্ণ করে দিয়েছে, মানুষ কুমুদরঞ্জনই কবি কুমুদরঞ্জনকে সৃষ্টি করেছে।

মূর্খগরীব নামহারা মোর মা হয়েই তুই থাকলি মা
সব দিকে আমি ছোট্ট বলে তুই আগলিয়ে কোলে রাখলি মা।

কিন্তু সিংহগর্জনে এই প্রতীতিও রয়েছে—

বাঙালী দিয়েছে ভারতকে সেরা কবি
বাঙালী দিয়েছে ভারতকে সেরা ছবি
বাঙালী দিয়েছে দরদী বৈজ্ঞানিক
বীর সন্ন্যাসী বাগ্মী অলৌকিক।

মত্ততাহীন তত্ত্ব-পারাপারের খেয়া-নৌকার তিনি মাঝি নন, সোনার তরীতে ফসল বোঝাই করে অনির্দেশের সন্ধানেও তিনি পাড়ি দেন না, তাঁর লেখার মধ্যে Quality of massivenessও নেই কিন্তু আছে মনের সেই plastic বা নমনীয় গুণ যার স্পর্শে সবই মৈত্রীসুধা রসময় হয়।

প্রভু হইবার নাহিকো আমার শক্তি সামর্থ্য
যুগযুগ ধরি পরিচারক আর আমিই যে ভৃত্য।

তাঁর পল্লীপ্রীতি ট্রেনে বসে দেখতে পাওয়া ধানের শীষ কাশের গুচ্ছ নারিকেল তালঘেরা পুষ্করিণীর চকিত দর্শন নয়, সৌখীন কাব্য নয়, কারণ নর্মদা মর্মর তটে ঘর বাঁধতে তাঁর মন চায় নি, উচ্চ প্রাসাদ অলিন্দে তিনি ভীত।

আমার এ ভক্তি— এ অনুরক্তি বুকের রক্তে বহে।

বাউল বৈরাগীদের নিয়েই তাঁর কারবার, চলতি পথের পথিক, ভবের যত পাগল-পাগলী রসিকজন মহাজন যারা—বাজিয়ে যাব গাবগুবাগুব—সেতারেতে চড়াসুরে ঝঙ্কার নয়, গোপীযন্ত্রে মৃদুতান—অজে তাহার শান্তি-পুরের সাতটা রাসের ঝাঁঝরে।

শতদল, বনতুলসী, উজানি, একতারা, অজয়, বনমল্লিকা, বীথি, নূপুর, রজনীগন্ধা প্রভৃতি কবিতার বইগুলি তাঁর মনের চিরন্তন প্রকাশকে কাব্যে ধরে রেখেছে, বিধুর, মধুর করেছে শান্ত অনুদাত্ত সুরে। লোচনদাসের ভাবশিষ্যকে মাতিয়ে তুলেছে, গঙ্গা ও গৌরাঙ্গের দেশ, অজয় আর কুনুরের বাঁক, বনতুলসী ও পদ্মের বাঁক। তাই তিনি হয়েছেন লোচনদাসের পাটের

প্রহরী। বৈরাগির সহজিয়া সুরের সঙ্গী আর কেন্দুলির কোমল কান্ত পদাবলীর ভক্ত। এতে তিনি শুধু মুগ্ধ নন্ উজ্জীবিত উদ্বোধিত উদ্দীপিতও।

মাধব তুহুঁ বড় কঠিন পরাণ।
সো কুল কামিনী তুয়া গুণ গণি গণি
নিশিদিন ঝুরই বয়ান॥ —লোচনদাস

এই সূত্রে একটি কথা মনে পড়েছে—একটা ধারণা আছে যে তিনি বৈষ্ণবভাবে অনুপ্রাণিত বাংলার পল্লীকবি। এ কথা ঠিক নয়, তিনি ভারত-পথপথিকও। একদিকে তাঁর কামাখ্যা আর একদিকে হিংলাজ।

গোটা ভারতের আরতি করিয়া জ্বালি মোরা গৃহদীপ…
আমি গয়াকাশী, আমি অযোধ্যা, পুরী ও বৃন্দাবন
আমি কামাখ্যা, আমি কাশ্মীর, সোমনাথ পত্তন।

ভারতবর্ষের চিন্ময়রূপ তাঁকে অভিভূত করেছে, তার কাব্যে সোমনাথ পর্ব একটি বিশিষ্ট ধারা।

ভারত-তনয় অমৃত পুত্র আমি মৃত্যুঞ্জয়।

ভারতের দাসপর্ব তাঁকে বেদনাহত করে—

কেটে ফেলে দাও, ছেটে ফেলে দাও রাখো যা সাচ্চা খাঁটি
ফোসিল হাঙর কচ্ছপ নয়, মুক্তা যা পরিপাটি।

বজ্র ও ব্রজের নবনী দিয়ে তৈয়ারী যে বাঙালী অর্ধনারীশ্বর তাকেই তিনি বারবার ডেকেছেন, যে অঘটন্ ঘটায়—তাতে মিশে আছে শুধু খোকার কাজল চোখের জল নয়, তরুণীর প্রেমাশ্রু নয়, বৃদ্ধের তপ্ত আঁখির বারিধারা নয়, বঞ্চিতের হাহাকার দানের আর্তি, দরিদ্রের একবিন্দু নয়নের জল, কালের কপোলতলে যা চিরকালের মতো শুভ্রসমুজ্জল হয়ে থাকবে মহাকালের ভালে। তিনি চেয়েছেন একটি শুচিশুভ্র সুন্দর শুদ্ধ শান্ত মৎ, ভুবন কান্তি মৎ জাতির অভ্যুত্থান, কল্পনায় গেয়েছেন তারি জয় গান, 'কায়েন মনসা বাচা' তাকেই প্রণাম জানিয়েছেন অগোচরে—

টার্কি কি টাসখণ্ড, টোকিও কি মস্কো
কানাডা কি কেনটার্কি যেথা হোক্ বাস গো।

কারণ চন্দন চিরকালই চন্দন, তার ধর্মভীরু মন জানতো যে—

একটি সাথী আছেন, হিয়া আছে—
তাপস তিনি, তিনিও সদা একা
তাঁহার কাজ ধ্যানের রূপ বাহিরে মেলে দেখা।

—রবীন্দ্রনাথ

এ কথা সত্য যে তাঁর কবিতায় আমরা কিছু hard hitting epigram পাই না, সত্যাবৃতে মিথুনীকৃত ভাব ও ভাবনার জোড়াতালিও নেই, আছে রসাত্মক বাক্যের সমষ্টি, লাবণ্যের দ্যোতনা, ভাষার সুষ্ঠু প্রয়োগ, ছন্দের বন্ধন।

রীতিযু রেখাম্বিব চিত্রং কাব্যং প্রতিষ্ঠিতম্

তারই সঙ্গে সঙ্গে একটা বৃহত্তর জীবনের জন্ম কান্না, প্রসব বেদনা।

যুগে যুগে এসেছি চলিয়া
স্খলিয়া স্খলিয়া
চুপে চুপে
রূপ হতে রূপে। —রবীন্দ্রনাথ

তাই তিনি সাহিত্যের ক্র্যাফ্‌টস্‌ম্যান নন্—এস্‌কেপিষ্ট নন্, স্টাইলিষ্ট নন্—শুধুই কবি। নিজের মনে যে গান করে, সুর দেয়, গোপীযন্ত্রে উদাস হয়ে স্বর তোলে। তাঁর কবিতা তাই কাটলের ফুল।

একটি নিশির শবসাধনায় এমন মহাসিদ্ধি
বজ্রজ্বালার আকাশে এ রামধনুকের সৃষ্টি।

মাটিতে এই জীবনের শুরু বটে কিন্তু এর সমাপ্তি আকাশে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে সাহিত্যের যিনি সাধক ইন্দ্রদেব যদি তাঁর তপোভঙ্গ করেন সে লোকসান্ সাহিত্যের। শুধু উপস্থিত কালের কাছে দাম আদায়ই সাহিত্যের সবচেয়ে বেশি পুণ্য কর্ম নয়—ভবিষ্যৎ বংশীয়দের জন্যও কিছু রেখে যেতে হয়। তিনি তাই করে গেছেন।

শরৎচন্দ্র বলেছিলেন—যখন মরব ফর্সা খাতা রেখে যাব যার মধ্যে কালির আঁচড় এক জায়গায়ও থাকবে না। কুমুদরঞ্জনের জীবনখাতায় তাই আছে। সোনারবাংলা-মায়ের চরণপাতে তিনি মাথা পেতে দিয়েছিলেন—'আমার যে ভাই তারা সবাই তোমার রাখাল, তোমার চাষী।' তাই ভবিষ্যদ্দিনে দুন্দুভিতে যখনই আঘাত হবে শুরু বুকের মধ্যে যেন বেজে উঠবে গুরু গুরু গুরু।

স্বগৃহে কবি কুমুদরঞ্জন

শিলাদিত্য

(ক)

'কুমুদরঞ্জন কাব্যসম্ভার' গ্রন্থে কবি-পরিচায়িকায় কবিকে 'গৃহাসক্ত কবি' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই গৃহ দেখবার বহুদিনের সাধ ছিল।

এই সাধ পূর্ণ হল ১৯৬৬ সালে—কবিপুত্র বন্ধুবর শ্রীজ্যোৎস্নানাথের সৌজন্যে। কর্ম উপলক্ষ্যে বর্ধমান সহরে কয়েকদিনের জন্যে গিয়েছিলাম। সেই সময় একদিন প্রাতঃকালে কবিপুত্রের ব্যবস্থাপনায় কবি অনুরাগী অন্য কয়েকজনের সঙ্গে সস্ত্রীক আমি কবির বাসস্থান কোগ্রাম (প্রাচীন নাম উজানী) যাত্রা করলাম।

বর্ধমান শহর থেকে মাইল ত্রিশ দূরে কুনুর বলে একটি ছোট নদী যেখানে অজয় নদের সঙ্গম লাভ করেছে, সেই সঙ্গমের সন্নিকটে কবির নতুন বাসগৃহ। নতুন বললাম কেন না অজয়ের বন্যা কবিকে বারবার গৃহহীন করেছে। আবার নতুন করে কবি নিজেকে স্বগ্রামেই পুনর্বাসিত করেছেন।

কবি কতখানি 'গৃহাসক্ত' ছিলেন আমার জানা নেই। তবে কবি স্বগ্রাম প্রেমিক ছিলেন। ঐ গ্রামেই তাঁর জন্ম। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বি. এ. পাশ করে ঐ গ্রামের নিকটস্থ মাথরুন উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। ঐ বিদ্যালয়ই তাঁর একমাত্র কর্মক্ষেত্র। ঐখানে বহুকাল প্রধান শিক্ষকের পদ অলঙ্কৃত করে, পরিণত বয়সে অবসর গ্রহণ করেন। সুতরাং স্বগ্রামেই তাঁর সারা জীবন কেটেছে। ঐ গ্রামের বৃক্ষ, লতা, জীব জন্তু, গ্রামবাসী সবই তাঁর প্রিয় পাত্র। দেবী মঙ্গলার (পীঠস্থান) উপর তাঁর অচলা ভক্তি। লোচনদাসের পাট তাঁর পরম শ্রদ্ধা ও গৌরবের বস্তু। এমন কি অজয়ের সর্বনাশা বন্যা, যা বারবার তাঁকে গৃহহারা করে, সে বন্যাও তাঁর বড় আনন্দের উৎস। তাঁর কবিচেতনায় মনে হয় যে গৃহপ্রাচীর যখন অজয়ের সঙ্গে তাঁর 'চোখোচোখি' হওয়া বন্ধ করে তখন

রাগিয়া উঠে সে মাতি
দেখিতে না পেয়ে ঘটায় এই প্রলয়।
... ...
দেখি মহারোহ দেখি বিজয়োৎসব
অশ্বমেধের যজ্ঞের কোলাহল,
তোরা খুঁজে-মর ভুলি আনন্দ সব,
হারালো কাহার পুটুলির সম্বল। —অজয়ের বন্যা

(খ)
খেয়া-নৌকায় কুন্নুর পার হয়ে কবিগৃহে সদলে পৌঁছিলাম। জ্যেষ্ঠ পুত্রের বন্ধুদের কবি পরম সৌজন্যে স্বগৃহে আহ্বান করলেন। মাত্র 'পরম সৌজন্য' বললাম আমার বর্ণনা শক্তির অপ্রতুলতা হেতু। নচেৎ সে সৌজন্যে ধ্বনিত ছিল দেবতা-আবাহনের ধ্বনি—'ধন্যোঽহং কৃতকৃতোঽহং সফলং জীবিতং মম।'

আমাদের সঙ্গে জন দুই সরকারী চাপরাশধারীও গিয়েছিল কবিদর্শন মানসে। তাদের প্রতিও কবি সমধিক সৌজন্য প্রকাশ করলেন। তাদের সুখাসীন করিয়ে তবে তিনি আমাদের কাছে এলেন। মানুষ মাত্রেই কবির কাছে সমান প্রিয়—সে ঘাট-মাঝিই হোক, চাষীই হোক, জজ ম্যাজিষ্ট্রেটই হোক। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি চূড়ান্ত সাম্যবাদী।

কবির বাসগৃহটি বাহুল্য বর্জিত। সদর-অন্দর, রান্নাবাড়ি, কৃষাণ পরিচারকদের ঘর সবই আছে, যেমন পল্লীগৃহস্থের বাসবাড়িতে থাকে। তাঁর উপবেশন কক্ষ থেকে অজয়ের বিশাল বক্ষ অতি সুন্দর দেখা যায়। তখন শীতকাল। জলধারা শীর্ণ। তবুও কুন্নুর সঙ্গমে অজয় নদের একটা বিরাটত্ব প্রতিভাত হয়। কথা বলতে বলতে কবি বারবার অজয় নদের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলেন। আজন্ম দেখছেন তবুও যেন তৃপ্তি নেই।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সকলের সব খবর নিতে লাগলেন। যেন বহুদিন প্রবাসের পর তাঁর প্রিয়জন ঘরে ফিরেছে। তার পর হঠাৎ ব্যস্ত সমস্ত হয়ে পড়লেন। কি ব্যাপার, অন্দর মহলে কবি গৃহিনীর নিকট বৌমার (অর্থাৎ আমার গৃহিনীর) সম্যক সমাদর হচ্ছে কিনা দেখতে।

অন্দর মহল থেকে কবির আনন্দ উচ্ছলধ্বনি ভেসে এল।

. .

(গ)
আমরা এই অবসরে কোগ্রাম দেখতে বার হলাম। নিতান্তই রাঢ়ের পল্লীগ্রাম। ক্ষেত, বাগান, কুঁড়েঘর, মেঠো পথ, গরুর গাড়ির দেশ। দু'চারটে পাকা বাড়ি আছে। দু'একটা আরও হচ্ছে। মা মঙ্গলার ছোট্ট মন্দির, যদিও স্থানটির পীঠস্থান বলে প্রসিদ্ধি আছে! বৈষ্ণবতীর্থ লোচন দাসের পাট, সেটিও ছোট্ট। সবই যেন গঠনে ও পরিবেশে পল্লী পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিয়েছে। নিকটে একটি হাটতলা। এই গ্রামের হৃদয় হয়ে আছেন কবি স্বয়ং, যে হৃদয় থেকে অফুরন্ত করুণাধারায় প্রস্রবণ বইছে।

কবির গৃহ সংলগ্ন একটি ফুল বাগান আছে। সেখানে একটি বেঞ্চে কবি অনেক সময় বসে থাকতেন। হাটবারে জনসমাগম হয়। সেদিন গ্রামবাসী বহুলোক এবং ভিন্ন গ্রামবাসী অনেকে কবিকে দর্শন করে যান। কবি

তাদের এবং তাদের আত্মপরিজনের কুশল সংবাদ নেন। প্রয়োজনে সাহায্যও করেন। কবি-পুত্রগণ নানা কর্মে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাই তাদের সাহায্যেও কবি কারও চিকিৎসার ব্যবস্থা, কারও অন্য প্রয়োজন উদ্ধারের ব্যবস্থা করে দেন। হাটবারে প্রায়ই কিছু লোক প্রসাদপ্রার্থী হয়। তাদের জন্যে কবির গৃহে অন্নসত্র খোলাই আছে। অসময়ে অনিশ্চিত সংখ্যক ক্ষুধার্তকে অন্নদানের ভার যে সুগৃহিনীর উপর তাঁর দুর্ভোগের কথা চিন্তনীয়। প্রয়োজনবোধে কবি নির্বোধ গ্রামবাসীদের অকুণ্ঠ তিরস্কারও করেন। আমি বিশ্বস্তসূত্রে এই কাহিনীটি শুনেছি। এক কাণ্ডজ্ঞানহীন সংসারের প্রয়োজনের দিকে না তাকিয়ে হাটে বিক্রয়লব্ধ অর্থ মাদকদ্রব্য ক্রয়ে অপব্যয় করত। তার কবির নিকট একদিন লাঞ্ছনা হল :

হ্যাঁরে (অমুক) তুই নাকি গাঁজা খাস্ ?

আজ্ঞা না তো।

না! কাছে আয়। আয় বলছি। (আঘ্রাণান্তর) ঐ তো গাঁজার গন্ধ বার হচ্ছে। হতভাগা। তোর ছেলেটা ভুগছে। ডাক্তার দেখাস না, ওষুধ কিনিস না, পথ্যির জোগাড় নেই। আর তুই গাঁজায় পয়সা ওড়াবি।

বের কর তোর কাছে কত পয়সা আছে।

হয়তো দেখা গেল তার কাছে টাকা খানেক আছে। বাকিটা কবি নিজেই দিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিলেন।

এ ছাড়া অমুক দুস্থের কন্যাদায়, অমুকের অন্নদায়—তা মোচনের ভার বিপত্তো কুমুদরঞ্জন। এ রকম সহৃদয় লোক কমই দেখা যায়।

(ঘ)

কবিতা লেখা তাঁর কাছে নিত্য উপাসনার অঙ্গ। প্রায় প্রত্যহই লিখতেন। কিন্তু লেখায় যত উৎসাহ, লেখা বস্তু সংরক্ষণে তার কিছুমাত্রও ছিল না। তাঁর বহু অপ্রকাশিত রচনা অজয়ের বন্যা গ্রাস করেছে। বহু কবিতা লিখে অন্যকে দিয়েছেন, নকল রাখেন নি। প্রাপকও যদি কবিতাটি না রেখে থাকেন, তা হলে তাও বিলুপ্ত। এমনি একটি কবিতা আমার কাছে ছিল। অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম। কবিকে একদিন কলকাতার চিড়িয়াখানা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম; কবি নাকি ঐ স্থান বছর চল্লিশ দেখেন নি। আমার অনুরোধে তৎকালীন ডিরেক্টর ডাঃ রামকৃষ্ণ লাহিড়ী সযত্নে কবিকে সমস্ত বাগান ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়ে ছিলেন। কবি আনন্দে আত্মহারা। তিনি অল্পেই আনন্দানুভব করতে পারতেন। পরদিন এই কবিতাটি পেলাম—

বুড়ো খোকা আনন্দেতে দেখে এলাম 'জু'—
হাসছে আমার নাতনী নাতি বেণু ও মঞ্জু।

দেখানোর সে কি আগ্রহ—কি বচন ভঙ্গা—
পিছন হাঁটে কাল যে হেরে এ হেন সঙ্গী।
ময়ূর দেখে মনে হ'ল পিঠে তাহার চড়ি—
কার্তিক এমন মিলবে না তো—নিজেই হেসে মরি ;
সিংহ ওযে মায়ের বাহন কেশর বুলায় গায়—
সোনা পাখীর ঝাঁক নামিল জীবন আঙিনায়।
যেন ভয়াল ব্যাঘ্র এসে লেহন করে পা
সাপেরা সব মাণিক ঢালে শঙ্কা করে না।
গোটা ভুবন দেখে এলাম নয় চিড়িয়াখানা
ভয়ও সেথা অভয় হয়ে বসায়েছে-থানা।
এত ফুল আর এত পাখা নয়ন অভিরাম
বিশ্বঘুরে নয়কো—একই সঙ্গে দেখিলাম।
ঐ কাকলী কলরব আর আরাব ও গর্জন,
বিস্মিত ও পুলকিত করলে আমার মন।
গোপাল মুখে নন্দরাণীর চোদ্দ ভুবন দেখা—
সত্য বটে আমারও তা ভাগ্যে ছিল লেখা।[১]

প্রসঙ্গক্রমে বলি কবির বহু কবিতা অবলুপ্তির আরও এক কারণ আছে বহু কবিতা অনেক ক্ষণজীবি পত্রিকায় প্রকাশের জন্য দিয়েছিলেন। যে চাইত তাকেই অকৃপণ হস্তে দিয়েছেন। দু'চার সংখ্যা প্রকাশের পর সে সব পত্রপত্রিকা লুপ্ত হয়েছে। কারও কাছে সেই সব পত্রিকার সংগ্রহ থাকলে হয় তো আরও কিছু কবিতার উদ্ধার হতে পারে।

এ প্রবন্ধে কবির কাব্যপরিচিতির পূর্ণতা দেখাতে চাই না। কবি বাংলা ও বাঙালীর গাথা রচনা করেছেন—সরল ও সহজ বাংলায়। বিষয় বস্তুও বিচিত্র। গ্রাম্য পূজারীও আছে, অখিল মাঝিও আছে, ভালুকওয়ালাও আছে, কনষ্টেবলও আছে, হিটলারও আছে, ডেভিড হেয়ারও আছেন। আর পল্লী

১ শিলাদিত্যের প্রতি কবিতাটির প্রথম ও শেষ

দেখছি তোমার সোহাগ হৃদয় দুর্লভ এবং দামী
বৃদ্ধ তো নই হলাম যেন কিশোর জনক আমি।
... ...
মায়ের আমার অফুরন্ত প্রসাদী ভাণ্ডার
কণ্ঠে তোমার পরিয়ে দিলাম পরিণয়ের হার।
যার সুরভি দেবতাদের একান্ত কাঙ্খিত
সমুজ্জ্বল ও জীবন তোমার করবে সুরভিত।

প্রকৃতির বহুরূপে বর্ণনা। তবে কবিতার সারবস্তু তাঁর গ্রামাঞ্চল ও বাংলা; কবি নিজেই লিখেছেন—

বাঙালী হায় যেথায় যাবে, বাংলা তাহার সঙ্গে যায়
বৃন্দাবনের কাছেই তাহার নদীয়া যে দিন দাঁড়ায়।
যেথায় থাকুক নাইকো ক্ষতি সঙ্গে থাকেন হৈমবতী,
কালিদহের কাহিনী ময়—সিংহলের সে রাজসভায়।

থাক যে দেশে থাক যে বেশে সপ্তসাগর লঙ্ঘি সে
কাশীদাস আর কৃত্তিবাস পায় যে চিরসঙ্গী সে।
বাউল নাচে তাহার সনে হৃদয় গলে সংকীর্তনে,
চিন্তা তাহার নয়ন জলে গ্রামের পথে পথ হারায়।
(১৯৬১ নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে কবির অভিভাষণ)

পূর্বোক্ত চূর্ণকটিতে প্রকাশিত হয়েছে কুমুদরঞ্জনের কবিমানস। সাচ্চা বাঙালীর মন।

(৬)

গ্রাম সন্দর্শন করে ফিরে এলাম। দেখি কবিগৃহে এরই মধ্যে জলযোগের বিরাট আয়োজন সম্পূর্ণ। গরম লুচি, মাছ, তরকারি, নানান ভাজি ও বহু প্রকার মিষ্টান্ন যোগে চা পান। ইহাকে জলযোগ না বলে পূর্ণ ভোজ বলাই উচিত কিন্তু কবির ভাষায় ভাত না থাকায় উহা জলযোগের বেশি নয়। খাওয়ার সময় কি ব্যস্ততা। চাপরাশীদের খাওয়ার তদারক করেন, না আমাদের দেখেন, না অন্দরে বৌমার খাওয়া বিধিমত হচ্ছে কিনা দেখেন। চক্রাকারে ঘুরে সবই তদারক করলেন—আপ্যায়নের বিন্দুমাত্র ত্রুটি হতে দিলেন না। শুনলাম অতিথি অভ্যাগত এলে, নিজে তদারক করে খাইয়ে কবি গভীর তৃপ্তি পান। নরদেবতাকে নারায়ণ মূর্তিতে যিনি সেবা করতে অভ্যস্ত, তাঁর এই আচরণ খুবই স্বাভাবিক।

কবির যখন অবকাশ হ'ল পুনরায় আমাদের কাছে বসবার তখন আমরা তাঁর জীবনের কথা কিছু শুনতে চেয়েছিলাম। কবি বৈষ্ণব বিনয়কে জীবনে ধর্ম করেছেন, অপূর্ব নম্রতা দিয়ে আমাদের অনুসন্ধিৎসা এড়িয়ে গেলেন। গ্রামের কথা, দেবদেবীর কথা, রামায়ন মহাভারতের কথা অনেকক্ষণ ধরে বললেন। যেন সেকালের ঋষি তপোবনে শুশ্রূষু ছাত্রকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করছেন।

সাজ সজ্জায়, অশন বসনে, গৃহ সজ্জায়, আচার ব্যবহারে সর্বপ্রকার বাহুল্য বর্জিত এমন একটি সজ্জন সহৃদয় ভদ্র বাঙালী দেখা দুর্লভ। স্বগৃহে কুমুদরঞ্জনের এই স্বরূপ একাধারে কবি ও সাধকের মূর্তি।

কবিবর কুমুদরঞ্জন

ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বাংলা দেশে সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যাহারা বিশিষ্ট ভাবে নিজ দানের দ্বারা জনগণের সেবা করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের অন্যতম খ্যাতনামা কবি কুমুদ রঞ্জন মল্লিক মহাশয় সম্প্রতি ৮৮ বৎসর বয়সে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। তিনি বর্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকটস্থ কোগ্রাম নামক পল্লীর অধিবাসী ছিলেন। অজয় নদের সহিত কুনুর নামক একটি ছোট নদী যেখানে মিলিত হইয়াছে সেই মিলনস্থানের উপরই কোগ্রাম অবস্থিত। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী লেখক চৈতন্যমঙ্গল-প্রণেতা মহাকবি লোচনদাস ঐ গ্রামেরই অধিবাসী ছিলেন এবং এখনও গ্রামে লোচনের পাট নামক একটি দেবস্থান আছে। তাহা ছাড়া ঐ গ্রামে আরও পুরাতন একটি মঙ্গলচণ্ডীর মন্দির বর্তমান। কুমুদরঞ্জন তাঁহার সুদীর্ঘ জীবন ঐ গ্রামেরই কাঁচা বাড়িতে কাটাইয়া গিয়াছেন। গত কয়েক সাল পূর্বে ভীষণ ঝড় ও বন্যায় বাড়িটি ভাঙ্গিয়া গেলে তাঁহার ছেলেরা সেইস্থানে একটি পাকা বাড়ি নির্মাণ করিয়া দেয় এবং জীবনের শেষ এগারো বৎসর কবি ঐ পাকা বাড়িতে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার ছটি পুত্র সকলেই শুধু বিদ্যায় নহে সকল বিষয়ে কৃতী। ছেলেদের বহু অনুরোধ সত্বেও কুমুদবাবু গ্রামের বাস ত্যাগ করেন নাই। ইহা ছিল তাঁহার চরিত্রের একটি অপূর্ব মাধুর্য। ১৯০৫ সালে বি. এ পাশ করিয়া তিনি তাঁহার বাসস্থান হইতে কয়েক মাইলদূরে মাথরুণ গ্রামে একটি উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রথমে সহকারী শিক্ষক ও অল্পদিন পরে প্রধান শিক্ষক হইয়া প্রায় ৪০ বৎসর কাল ঐ কার্যে নিযুক্ত ছিলেন, তখনও তাঁহার পরিবার বর্গ কোগ্রামেই বাস করিত। বর্ষা ও শীতকালে যাতায়াতের অসুবিধার জন্য তিনি সপ্তাহে পাঁচ দিন মাথরুণে ও দুদিন কোগ্রামে বাস করিতেন। অন্যকোনো বিলাস ছিল না। অবসর পাইলে তিনি কবিতা রচনা করিতেন।

এবং সারা জীবনে কত হাজার কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন তাহার হিসাব নাই। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের যুগে জন্মলাভ করিয়াও তিনি রবীন্দ্র-প্রভাব হইতে সম্পূর্ণমুক্ত ছিলেন এবং অতি সাধারণ বিষয় লইয়া কবিতা রচনা করার ফলে কবিতাগুলি বাঙালী পাঠক মাত্রকেই আকৃষ্ট ও অভিভূত করিত। কীট পতঙ্গ মশা মাছি কেঁচো প্রভৃতি বিষয় হইতে আরম্ভ করিয়া বাড়ির দাসদাসী, গ্রামের কিষান মজুর, জেলার সাধারণ শ্রমিক সকলের কথাই তিনি তাঁহার অসীম দক্ষতার সহিত কবিতায় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। বৈষ্ণব লোচনের পাটের মানুষ বৈষ্ণব ত ছিলেনই সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। কিন্তু পৃথিবীর

সকল জীবের প্রতি এরূপ ভালোবাসা ও দরদ অতি অল্প কবির মধ্যেই দেখা গিয়াছে। আমরা প্রায় পঞ্চাশ বৎসর কাল তাঁহার সহিত ঘনিষ্ট পরিচয়ের সুযোগ লাভ করিয়া তাঁহার স্নেহ ও কৃপা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি। এই সুদীর্ঘ কালে তাঁহাকে কতভাবে কত জীবকে আপন করিয়া লইয়া ভালোবাসিতে দেখিয়াছি তাহা বলিবার শক্তি নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় এম. এ. পড়িবার সময় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আগ্রহে ও কৃপায় কবি কালিদাস রায় ও কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের সান্নিধ্য লাভে সমর্থ হই। প্রথম দলের বাংলা এম. এ. ক্লাসের ছাত্র বলিয়া স্যার আশুতোষ সাগ্রহে বাংলাদেশের সকল সংস্কৃতিবান মানুষের সহিত ছাত্রদিগের পরিচয় করাইয়া দিতেন। সেইযুগের মানুষদের মধ্যে কুমুদরঞ্জন চলিয়া গেলেন। এখন একমাত্র কবিশেখর কালিদাস রায় অশীতিপর বৃদ্ধ ও দৃষ্টি শক্তিহীন হইয়া আমাদের মধ্যে আছেন। এই পঞ্চাশ বৎসর কাল কত ভাবে কতখানে ও কত উৎসবে কুমুদরঞ্জনের সহিত মিলিত হইয়াছি তাহার সংখ্যা নাই। তিনি পল্লীগ্রামের মানুষ। তাঁহার বাড়িতে সহরের লোক যাইলে কি ভাবে তাঁহাকে আদর আপ্যায়ন করিবেন তাহা খুঁজিয়া পাইতেন না। ভারতবর্ষ-পত্রিকা সম্পাদকের পদ লাভ করিবার পর প্রথম যেবার কোগ্রামে যাই কবি সেবার বাড়িতে নহবৎ বসাইয়া আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। সঙ্গে অবশ্য আমাপেক্ষায় কনিষ্ট আরও কয়েকজন সাহিত্যিক বন্ধু ছিলেন। তাঁহার বিরাট অভ্যর্থনার আয়োজন আমাদিগকে শুধু অভিভূত করে নাই লজ্জিত ও সঙ্কুচিত করিয়াছিল। বহুবার আমার কবিতীর্থ কোগ্রাম দর্শনের সৌভাগ্য হইয়াছে। প্রতিবারই সঙ্গে বন্ধুবান্ধবের দলকে লইয়া গিয়াছি। সকল সময়ই কুমুদরঞ্জন সকলকে এত অধিক আদর যত্ন করিয়াছেন কেহ কোনোদিন সে কথা ভুলিতে পারিবে না।

বাংলা ভাষার সকল পাঠক জানেন কি বিখ্যাত কি খ্যাতিহীন কি ছোট কি বড় বাংলা ভাষায় প্রকাশিত যে কোনো পুস্তক বা সাময়িক পত্র যখনই তাঁহার নিকট কবিতা চাহিয়া পত্র দিয়াছেন তখনই তিনি কাল বিলম্ব না করিয়া নিজ রচনা তাহাদের নিকট প্রেরণ করিতেন। পূজার সময় শতাধিক পত্রিকার পূজা সংখ্যা সংগ্রহ করিয়া দেখিয়াছি এবং মনে হয় তাহার মধ্যে একখানিতেও কুমুদরঞ্জনের কবিতা প্রকাশ বাদ যায় নাই। কালের বিচারে কবি কুমুদরঞ্জনের কবিতা কোন স্থান লাভ করিবে জানি না কিন্তু সকলের প্রতি তাঁহার এই প্রগাঢ় স্নেহ মমতা ও সকলকে তৃপ্তি দানের চেষ্টা কুমুদরঞ্জনকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অমরত্ব দান করিবে।

তাঁহার জীবনযাত্রা-প্রণালী অতি সহজ ও সরল ছিল। গ্রামের মানুষ বৎসরে প্রায় আটমাস কাল শুধু-পায়ে ও শুধু-গায়ে দিন কাটাইয়া দিতেন। প্রতিদিন সকালে ২।১ ঘন্টাকাল দরিদ্র গ্রামবাসীদের মধ্যে হোমিওপ্যাথিক

ঔষধ বিতরণ এবং গ্রামের পথে পথে ঘুরিয়া গ্রামবাসীদের কুশল বার্তা গ্রহণ তাঁহার নিত্যকর্ম ছিল। শুধু বাহিরের লোক নহে ঐ অঞ্চলের সকল লোক সর্বদা তাঁহার আদর লাভ করিয়া জীবনে ধন্য হইয়াছে। পুত্রগণ কেহ ম্যাজিষ্টেট, কেহ বড় ডাক্তার, কেহ অধ্যাপক, কেহ ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি হইবার পর সকলেই পিতা মাতার স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ প্রেরণ করিত; কুমুদরঞ্জন সেই অর্থ নিজের স্বচ্ছেন্দ্যের জন্য ব্যয় না করিয়া প্রায় সমস্তটাই পল্লীবাসীদের উপকারের জন্য ব্যয় করিতেন।

এরূপ একটি আদর্শ নিষ্ঠ ও গ্রামভক্ত বাঙালী সচরাচর লোকের চোখে পড়ে না। কলিকাতার মতো সহরবাসের সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয়া শীত গ্রীষ্ম বর্ষা অবহেলা করিয়া তিনি গ্রামে থাকিয়া প্রতিদিনের কাজ করিয়া যাইতেন। ছেলেরা কলিকাতায় আসিলে কথনও ২।১ দিনের বেশি সহরে থাকিতে পারিতেন না। সহরের চাকচিক্য বিলাসব্যাসন আমোদ-প্রমোদ বিলাসিতা প্রভৃতি কোনো কিছুই তাঁহাকে কথনও আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন পূর্বে চিকিৎসার জন্য[১] তাঁহাকে সহরে আনা হইয়াছিল এবং সহরেই তাঁহার দেহান্তর হইয়াছে। ইহা তাঁহার সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত ছিল।

কবি কুমুদরঞ্জন হয়ত সাহিত্যের ইতিহাসে চিরজীবি থাকিবেন কিন্তু আমরা যে মানুষ কুমুদরঞ্জনকে দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি সেই আদর্শ দেশবাসী আর ফিরিয়া পাইবে কিনা সন্দেহ।

[১] জ্যেষ্ঠপুত্রের পাতিপুকুরস্থ নবগৃহে প্রবেশের পূজানুষ্ঠানে যোগদান করতে আসেন

কুমুদ-কাব্যের দুই অধ্যায়

দক্ষিণারঞ্জন বসু

দশম শতাব্দীর চর্যাপদের কাল থেকে আজকের যুগ পর্যন্ত বাংলা কাব্যের বয়স প্রায় হাজার বছরের। এই হাজার বছরের ইতিহাস যেমন বৈচিত্র্যময়, তেমনি রোমাঞ্চকর। তারই মধ্যে যে যুগটি উজ্জ্বলতম, তা রবীন্দ্রযুগ। সেই যুগছায়ার মানুষ হিসেবে আমরা ভাগ্যবান। রবীন্দ্রনাথের কাব্য মহিমায় বাংলা সাহিত্য ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে বিশ্বসাহিত্যের মর্যাদা লাভ করেছে। সেই রবীন্দ্র-প্রতিভাকে কেন্দ্র করে যে বিরাট কবি-পরিমণ্ডল বাঙলাদেশে সৃষ্টি হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে অনেকেই গত হয়েছেন; জীবিতদের মধ্যে কুমুদরঞ্জন বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন তিনিও চলে গেলেন।

রবীন্দ্র-পরিমণ্ডলের কুমুদরঞ্জন প্রমুখ কবিদের অধিকাংশই ঐতিহ্যাশ্রয়ী। তবে তার পাশাপাশি মোহিতলাল প্রভৃতির কাব্যে বিদ্রোহী সুরের ধ্বনি উঠেছে। আধুনিক বাংলা কাব্যের বনিয়াদ এই দুই দলের সংঘর্ষের ভিতর দিয়েই গড়ে উঠেছে। এ যে শুধু আমাদের দেশেরই কথা তা নয়, কাব্য-ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রায় সব দেশেই এমনি একই ধরনের ধারা বিবর্তিত হয়ে চলেছে।

পূর্ব যুগের কাব্য অনেক সময় পরবর্তীকালে আর তেমন আদৃত হয় না। সকল ক্ষেত্রে কাব্যের অপকৃষ্টতাই তার কারণ নয়, সমাজ ও যুগের ব্যবধানও তার অন্যতম কারণ। দেশকালাতীত ভাবলোকে বসে কাব্য রচনা করেন এমন কবির সংখ্যা খুব বেশি নয়। তাঁরা সর্বদেশের সর্বকালের প্রতিনিধি। কিন্তু কবি সাধারণত আপন যুগ ও সমাজেরই ভাববিগ্রহ। এক একটি ভাবানুভূতি একই সময়ে বহুর মধ্যে অঙ্কুরিত হয়ে উঠলেও রচনা-শক্তির অভাবে অন্য সবাই যখন তা প্রকাশে ব্যর্থ, একমাত্র কবিই তখন তাকে ভাষায় যথার্থ রূপায়িত করে সকলের আনন্দ বিধান করে থাকেন। সমসাময়িক দেশবাসীর মনে অনুরূপ ভাবানুভূতির আদর থাকে বলেই কবির কাব্য তাদের নিকট এত উপভোগ্য হয়ে থাকে। এ থেকেই প্রমাণিত হবে কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক তাঁর কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাববিগ্রহ এবং বর্তমানেও তাঁর কাব্যালোচনার দ্বারা কবির সেই ভাববিগ্রহের স্মৃতিপূজার আয়োজন করে সাহিত্যতীর্থ স্মারক সংকলনগ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ায় একটি অবশ্য করণীয় মহৎ কর্তব্য পালিত হয়েছে।

ইলিনয় রাজ্যের শিকাগো শহরে আকাশ চুম্বী হোটেল এলার্টনে আমার ঘরে একাকী বসে মার্কিন কবি ভ্যাসেল লিণ্ডসের কবিতা পড়ছিলাম। একটি কবিতায় কবি লিখছেন:

That hour of their homesickness, I myself
Will turn, will say farewell to Illinois,
To old Kentucky and Virginia
And go with them to India, whence they came.
For they have heard a singing from the Ganges,
And cries of orioles— from the temple caves—
And Bengal's oldest, humblest Villages.

পড়তে পড়তে ভুলেই গিয়েছিলাম যে, আমি তখন নতুন পৃথিবী আমেরিকার এক শহরে, আমার বাঙলা দেশ আমার সেই ছেড়ে আসা গ্রামের পরিবেশ আমার মনকে ততক্ষণে এসে ঘিরে ফেলেছিল। বিশেষভাবে মনে পড়ছিল শ্রদ্ধেয় কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের কথা।

কুমুদরঞ্জন একান্তই প্রকৃতির কবি। গ্রাম-বাঙলাকে তিনি যেমন অন্তর দিয়ে ভালোবেসেছেন, তেমনি দরদ দিয়েই তিনি প্রকাশ করেছেন সেই ভালোবাসাকে তাঁর অসংখ্য কবিতায়। প্রকৃতিকে তিনি ভালোবাসেন, যেমন বাসতেন ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ। কীটস এর মতো শুধু বর্ণ-গন্ধের পিয়াসী নন কুমুদরঞ্জন। শেলীর মতো অপার্থিব মানস-সৃষ্ট প্রকৃতিও তাঁর কাম্য নয়। বায়রনের মতো উদ্দাম প্রকৃতির চিত্রও তিনি আঁকেন নি। আসলে কুমুদরঞ্জন শান্ত প্রকৃতির কবি। দিনের কর্মক্লান্তির পর মধুর পল্লী-সন্ধ্যা একটুখানি ঝিরঝিরে বাতাসে তাঁর হৃদয় জুড়িয়ে দেয়। পাখির গানে বনের ছায়ার আর প্রান্তরের উন্মুক্ততায় তিনি খুঁজে পান প্রাণের শান্তি, খুঁজে পান আত্মার সান্ত্বনা এবং তাই নিয়েই তাঁর পরম তৃপ্তি। আর সেই সঙ্গে বাঙলার পল্লীগৃহের আশেপাশে ছায়াচ্ছন্ন পথে ঘাটে যে সব মায়াজাল জড়িয়ে আছে সে সবের জন্যেও কবির অসীম আগ্রহ। এ প্রসঙ্গে তাঁর একটি অনবদ্য কবিতা-স্তবক মনে পড়ছে :

এ ঘাটেতে বাঁধব নাকো আজকে সাঁঝে।
ওই ঘাটে ওই বকুল গাছে
জলটি যেথায় ছুঁয়ে আছে,
এখনো ওই যে-ঘাটেতে পল্লীবালার কাঁকন বাজে,
তরী হেথা বাঁধব নাকো আজকে সাঁঝে।

গ্রাম-বাঙলার চারণকবি কুমুদরঞ্জন। আশা-নিরাশা, সুখ-দুঃখ, বিরহ-মিলনে জড়ানো পল্লীর মানুষ যেন তাঁর কাব্যে কথা কয়ে উঠেছে। অজয় নদী তীরের পল্লীসৌন্দর্য তাঁর 'একতারা'য় অপূর্ব সুরে ঝংকৃত হয়ে উঠেছে। বাংলার ছায়াঘেরা, পাখি ডাকা পল্লী তাঁকে যেন সব সময়ই হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

তাই বলে প্রকৃতির নিভৃত ছায়ায় বসে থেকেও সমষ্টিগত জীবনের

আহ্বানকে কুমুদরঞ্জন উপেক্ষা করেন নি। প্রাক্-স্বাধীনতা কালের ঝঞ্ঝা বিক্ষোভের মধ্যে তিনিও শুনতে পেয়েছেন আসন্ন ভবিষ্যতের ইঙ্গিত।

আজ ঈশানের বিষাণে উঠেছে নব উত্থান ডাক,
কাল সাগরের বক্ষ হইতে মাথা তোলে মৈনাক,
ভাঙা প্রস্তর কণিকার মাঝ—
'জাগৃহি' রব জাগিতেছে আজ,
করেছে ভক্ত রূপকারগণ পুনর্জন্ম লাভ।

কুমুদরঞ্জনের সাম্প্রতিক কবিতাবলীতে এমনি সমকালীনতার ছাপ অনেক ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে লক্ষণীয়। শুধু সমকালীনতার ছাপই নয়, আগামী দিনের স্বপ্নও স্পষ্ট ছবির রূপ নিয়েছে তাঁর কাব্যে। জন্মান্তরে বিশ্বাসী কবি একদিকে যেমন সন্ন্যাসী মুখে-পশু-পাখি ও পিপীলিকার পূর্বজীবন কাহিনী শুনে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে লিখেছেন—

দুর্লভ এই মানবজন্ম দেবতাও নাকি চায়,
কর্মফলেতে, শুনি সেই নব হীন জীবদেহ পায়।
দেখিয়াছি এক খেপা সন্ন্যাসী
শিবের মতন জটা বিন্যাসি,
জন্মান্তর কাহিনী শোনাতো বসি বিম্বের ছায়।

তেমনি আবার 'উজ্জ্বল ভারত'-এর স্বপ্নে বিভোর হয়ে তিনি বলছেন :

সাধুর স্বপ্ন ব্যর্থ হবার নয়,—
সত্য তাহাকে নিকটে টানিয়া লয়।
আজি যা স্বপ্ন, সত্য তা হবে কাল,—
কেবল কয়টা দিনের অন্তরাল।
ভাব করে রূপ দুদিনে পরিগ্রহ,
রাঙা পূবদিক তাহারি বার্তাবহ।

এমনি সব কবিতা পড়তে পড়তে মনে হয় কুমুদরঞ্জনকে আমরা যেন আবার নতুন করে পাচ্ছি। তাই পুরনো কুমুদরঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে আত্ম-ভোলা শেষ যুগের কুমুদরঞ্জনকেও আমরা আজ স্মরণ করি।

কুমুদস্মৃতি

উমা দেবী

বেশ কয়েক বছর আগের কথা। মাঘমাসে কেন্দুবিল্বগ্রামে জয়দেবের মেলা দেখতে গিয়েছিলুম। ফিরে বর্ধমানে এসে দিন কয়েক ছিলুম। বর্ধমানের লোকপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক শ্রীশৈলেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে উঠেছিলুম। তাঁর স্ত্রী অরুণা আমার বিশেষ পরিচিতা ও স্নেহপাত্রী। অরুণার বাড়িতে তখন শান্তিনিকেতনের শ্রীমুকুলদেবের স্ত্রী বীণা দেবীও ছিলেন।

একদিন অরুণা, বীণাদেবী, আমি ও শান্তি পাল অরুণার গাড়িতেই কুমুদরঞ্জনকে দেখবার জন্য কোগ্রামে গেলুম। গাড়িখানা রাস্তার উপর একটা গাছের নিচে দাঁড় করিয়ে একটু হেঁটে অজয় নদের তীরে এলুম। আমাদের পারগামী দেখে এক মাঝি এগিয়ে এলো।

—কোথায় যাবেন মা ঠাকরুণরা? কার বাড়িতে?

শান্তি পাল বললেন—মাষ্টার মশাইএর বাড়ি।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—মাষ্টার মশাই কে?

—কুমুদদা। এখানে মাষ্টারমশাই নামে বিখ্যাত।

আমরা তো নৌকোয় উঠলুম।

সরু নদী কিন্তু বেশ গভীর। কুমুদরঞ্জনের বাড়ি যেখানে, সেখানে আর একটি নদী এসে মিশেছে—খড়ি নদী—প্রবল স্রোতা।

তখন অক্টোবর মাস। তারিখটা আমার মনে পড়ছে তেসরা। দু'আনা করে নৌকোর পারানি। সঙ্গিনীরা পয়সা বার করতেই মাঝি দু'হাত জোড় করে ব্যাকুল নিবেদন জানালো—মাষ্টার মশাইএর বাড়ির অতিথি আপনারা—আপনাদের কাছ থেকে পয়সা নিতে পারবো না।

সকলে বলতে লাগলেন—তুমি গরীব মানুষ, কেন পয়সা নেবে না? এই তো তোমার রোজগারের পথ—না নিলে চলবে কেন—ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি বললুম—থাক, ওকে একটু আমাদের সমান হতে দাও অরুণা। মাষ্টার মশায়ের প্রতি ভক্তিতে ও আমাদের কারো চেয়ে খাটো নয়। কি হবে দু'আনা পয়সায়। নাই বা পেলো, বরঞ্চ আতিথেয়তায় আত্মীয় হোক—

আমাদের দেখে কুমুদবাবু আনন্দে অধীর হয়ে পড়লেন। বারে বারে বলতে লাগলেন—আজ তোমরা আসবে বলে ঐ নদী আমাকে ইলিশ মাছ পাঠিয়ে দিয়েছে—

আমরা বললুম—না, না আমরা আধ ঘন্টার মধ্যে চলে যাবো—খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করবেন না।

কুমুদবাবু সাগ্রহে বললেন—তা কি হয়? কতদূর থেকে তোমরা এলে। একটু ঘুরে দেখো, মায়ের মন্দির কাছে, পীঠস্থান—সেখানে যাও। বাড়িতে আমার অতিথ আসবে জেনে, আহা, মা আমার করুণা করে ইলিশ মাছের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, তোমাদের জন্যে, একটি ছোট্ট ইলিশ, মাচায় লাউ শাক আছে—

আমরা কিছুতেই রাজি হলুম না। আমি বললুম—বরঞ্চ আপনার মুখে —মানে কবি কণ্ঠে, একটি কবিতা পড়ে শোনান।

কুমুদবাবু কবিতা পড়লেন। তার পর আমাকে তাঁর কবিতা পড়ে শোনাতে বললেন। আমি 'অশরীরী' কবিতাটি পড়ে শোনালুম। শান্তি পালও পড়লেন। অরুণা আর বীণাদেবী—শুনলেন।

শান্ত সৌম্য চেহারা—পাপক্ষালন মূর্তি। সৌজন্য ও প্রীতিতে ভরপুর। বললুম—আপনার 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' সঙ্কলনটি আমি অনায়াসে পড়াচ্ছি।

কুমুদবাবু বললেন—দাঁড়াও, তোমাকে আমার একখানা বই দিই—এখানে এলে, খেলে না। আমার স্নেহের চিহ্ন রেখে দাও—

বইখানিতে স্বহস্তে লিখলেন—

'মা উমা, কমল দেওয়া উচিত ছিল তোমার কোমল করে।
দিলাম নীরস কাব্যখানি গভীর স্নেহ ভরে॥"

৩।১০।৬৬ শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

কুমুদবাবু সম্বন্ধে অনেকেরই ধারণা তিনি পল্লীকবি। পল্লী প্রকৃতিকে ভালোবাসলেই পল্লীকবি হয় না। পল্লীকবি হৃদয় জগতের কবি মাত্র। কুমুদবাবুর কাব্যে বাংলার অত্যুজ্জ্বল বৈষ্ণব সংস্কৃতি—যা একাধারে চিদ্‌গত ও হৃদ্‌গত—রূপগ্রহণ করেছে পরিপূর্ণ ভাবে। অনেক সময়েই দেখি কবি ও কাব্যের মধ্যে অনেক পার্থক্য। কুমুদবাবুকে দেখে সেদিন মনে হয়েছিল—কবি স্বয়ং কাব্যপুরুষে রূপান্তরিত হয়েছেন।

নিরভিমান, বিনয়ী, মানবপ্রেমিক ও ভক্তবৈষ্ণব কুমুদবাবুর স্থির, শান্ত ও উদার সত্তা যেন চারপাশের বায়ুমণ্ডলে একটি রসিকপ্রাণের হিল্লোল তুলেছিল। তাঁকে দেখে আমার মনে পড়ল ভোজদেবের কথা—যিনি রসিক বলতে একমাত্র জীবনরসিককেই স্বীকার করেছেন। স্থির উজ্জ্বল দীপশিখার তুলনা যে—এবং কাব্যকার চারদিকে বিকীর্ণ জ্যোতির স্বাক্ষর।

আজও কুমুদবাবুর কথা মনে পড়লে—মনে পড়ে মাঝির কথা—'মাষ্টার মশাইএর অতিথ আপনারা—আপনাদের কাছ থেকে পয়সা নিতে পারবো না মা ঠাকরুণেরা।' আর মনে পড়ে কুমুদবাবুর ব্যাকুল কণ্ঠস্বর—'আহা, মা আমার করুণাময়ী। তোমরা এলে কি দিয়ে অতিথসেবা করবো—তাই ভেবে ইলিশ মাছ পাঠিয়ে দিয়েছেন—'

কবিতীর্থে

কুমারেশ ঘোষ

হাওড়া থেকে ট্রেনে বর্ধমান, সেখান থেকে মোটরে নতুনহাট, তার পর গ্রাম্যপথে খানিকটা হেঁটে দাঁড়ালাম এসে অজয় নদীর তীরে। এখানেই মিশেচে কুন্থর নদী। গাছের ফাঁকে তখনও ডুবন্ত সূর্যের আধখানা দেখা যাচ্ছে। পল্লীর পথে নামচে আসন্ন সন্ধ্যা। গোধূলি লগ্ন।

সামনে বিরাট বালুতটে ক্ষীণ জলরেখা। বর্তমানে জলের গভীরতা হাঁটু পর্যন্তই। তবে বর্ষাকালে এই অজয় অজেয়। আমরা পায়ের জুতো খুললাম। আমরা মানে—তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, রমেন্দ্রনাথ মল্লিক, আমি এবং আরো অনেকেই। নতুনহাটে আমাদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে গেছলেন অনেক গ্রামবাসী এবং একটি কীর্তনের দল। তাঁরা গাইছেন—'হরিনাম বিলায়ে আমার নিতাই এল ঘরে।'

অথচ আমরা চলেচি কোগ্রামে কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের জন্ম-উৎসবে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাতে। কোথায় আমরা সাড়ম্বরে করব কবির সংবর্ধনা, তা না, দেখি আমাদেরই অভ্যর্থনার বিরাট আয়োজন।

খালি পায়ে নদী পার হয়ে হয়ে উঠলাম সবাই অপর পারে। তীর্থে দেবতা দর্শনে নগ্নপদে যাওয়াই নিয়ম, আমরা কবিতীর্থে সেই নিয়মই মানলাম। মন্দ নয়।

কিন্তু খানিকটা এগিয়ে আসতেই কানে এল শানাইয়ের আগমনী সুর। কবিগৃহের দিকে মিছিল আরো একটু আসতেই চোখে পড়লো পথের মাঝে উঁচু তোরণ, তার উপর মণ্ডপ বাঁধা। নহবত বসেচে; আমরা আরো কাছাকাছি যেতেই দেখি পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কবি কুমুদরঞ্জন। শ্যামল, সরল, সুন্দর গ্রাম্য চেহারা। মাথায় পাতলা কোঁকড়ানো চুল। মুখে মিষ্টি হাসি। গায়ে একখানা তোয়ালে জড়ানো। পরনে খাটো ধুতি। আমাদের দেখে আনন্দে শিশুর মতোই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। প্রণাম করতেই একে একে সবাইকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন সেখানেই। আমাদের ঘিরে বহুলোক। বললেন—তারাশংকর, শৈলজা, কুমারেশ, রমেন তোমরা এসেছ, আমার যে কি আনন্দ হচ্চে, তা কি বলব? পরক্ষণেই দুঃখ করে বললেন—সজনীকান্ত এল না, ওর জন্যে ডাকাবিন আনিয়ে রেখেছি যে। আবার গ্রামের লোকদের দিকে ফিরে বললেন—ওরে তোরা পায়ের ধুলো নে সবার। এমন সুযোগ আর পাবিনে।

অনর্গল ছোট ছেলের মতো নানান কথা বলতে লাগলেন সবার সঙ্গে।

আমি অবাক হয়ে কবির দিকে তাকিয়ে রইলাম। ওঁর কত কবিতা পড়েছি। ছোট বেলায় পাঠ্যপুস্তকে, বড় হয়ে পত্রপত্রিকায়। ওঁর গান আজও কানে বাজচে—'মাঝি, তরী হেথা বাঁধবো নাকো আজকে সাঁঝে।' সেই গানের কবি আমার সামনে। মনে মনে আর একবার সশ্রদ্ধ প্রণাম রাখলাম তাঁর পায়ে।

কবির বাড়ির সামনেই সভাসজ্জা। সামিয়ানা টাঙানো, আলপনা, আমপাতা, কলাগাছ আর মঙ্গল ঘট দিয়ে বিশুদ্ধ দেশীয় প্রথায় রুচিসম্মত আয়োজন। তা ছাড়া প্রচুর লোকের সমাগম। কিন্তু আজ কেন? কবি সংবর্ধনা তো পরদিন।

কবি হেসে বললেন—আজ তোমাদের সংবর্ধনা, গ্রামের সকলের তাই-ই ইচ্ছে। তোমরা হচ্চ অতিথি।

কিন্তু আমরা তো, মানে—সে কথা তো—

—কে কার কথা শোনে।

কবির নির্দেশে কয়েকজন ভদ্রলোক ইতিমধ্যে এগিয়ে এসে সাদরে হাত ধরে নিয়ে গিয়ে বসালেন সভা মধ্যে। দেখি আমাদের নামে ছাপানো অভিনন্দন পত্র বিলি হচ্চে। গ্রামের প্রাচীন পুরোহিত ধানদূর্বা নিয়ে করলেন আমাদের আশীর্বাদ। তার পর গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে শুরু হল অভিনন্দন জ্ঞাপন। এ যেন বরযাত্রী হয়ে এসে বরের পিঁড়িতে জাঁকিয়ে বসা। আর রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে গেলে—আগে কেবা 'মান' করিবেক দান তারি লাগি তাড়াতাড়ি। যাই হোক, তারাশংকরদা আমাদের হয়ে গুছিয়ে গাছিয়ে সংবর্ধনার উত্তর দিলেন।

তার পরের ব্যবস্থাবলী রীতিমত পৈটিক। বিকেলে খাওয়া, সন্ধ্যায় খাওয়া, রাত্রে খাওয়া। কেবল খাওয়া আর খাওয়া। সামনে দাঁড়িয়ে মাটির খাঁটি মানুষ কুমুদরঞ্জন নিজে দেখচেন আমাদের খাওয়া। অনেক খেয়েও তাঁকে বোঝাতে পারলাম না, পেটে আর আমাদের জায়গা নেই। মনে তাঁর সন্দেহ, ঠিকমত হল না বোধ হয়।

কবি যে ঘরে লেখেন সেই ঘরেই শোবার ব্যবস্থা হল। (গত বন্যায় সে ঘর ও কবির বাড়ি ভেঙে যাওয়ায় পাকা বাড়ি করেচেন। তাঁর আমন্ত্রণে গিয়ে দেখে এসেচি সে বাড়ি) ঘরখানি চমৎকার সাজানো। তাকে বইপত্র। সেক্রেলে একটা ব্যাটারি সেট রেডিও। সারা ঘরে ডি. ডি. টির গন্ধ। তবু কবি নিজে দাঁড়িয়ে আর একবার ডি. ডি. টি. পাওডার ছড়াবার ব্যবস্থা করলেন। আমরা আপত্তি জানালে বললেন—তোমরা শহরের লোক, গাঁয়ের মশার ধারণা নেই কোনো। শেষে রাত্রে কষ্ট পাবে, ঘুমোতে পারবে না। হেসে বললাম আমি—পেট ভর্তি, চোখ ঘুমে ভরে আসচে আমাদের। কিন্তু আমাদের কথা ভেবে বোধ হয় আপনারই ঘুম হবে না দাদা।

হ্যাঁ, তিনি কখন যেন অতি কাছের মানুষ 'দাদা' হয়ে গেছেন।

পরদিন ভোরে ঘুম ভাঙল মনোরম পরিবেশে। বেশ শীত শীত আমেজ। অতি ভোরে দরজার বাইরে শোনা গেল মধুর কীর্তন। বুঝি আমাদের ঘুম ভাঙতেই কীর্তনের দল এসে আমাদের বন্ধ ঘরের সামনে শুরু করল গান। উঠে বাইরে এসে দাঁড়ালাম বারান্দায়। কীর্তনীয়ারা আরো খানিকক্ষণ গেয়ে চলে গেল গাইতে গাইতে। দূরে কোথায় যেন কোকিল ডেকে উঠল কুহু-কুহু।

একটু পরেই প্রায় ছুটে এলেন কুমুদরঞ্জন—'হ্যাঁ গো রাত্রে তোমাদের ঘুম হয়েছিল তো?'

—কোনোই অসুবিধে হয় নি দাদা। দিব্বি—

'দাঁড়াও, তোমাদের মুখ ধোবার জল আনতে বলি।'

দাদা বাড়ির দিকে পা বাড়াচ্ছিলেন।

তারাশংকরদা বললেন—দাদা একটু গরম জলের ব্যবস্থা হলে ভালো হয়।

'গরম জল? এখুনি বলে আসছি।'

তাড়াতাড়ি গেলেন উনি বাড়ির মধ্যে। তারাশংকরদা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। হেসে বললাম—দাদা কিন্তু আপনার জন্যে এক বালতি গরম জলের ব্যবস্থা করতে গেলেন।

তারাশংকরদা বললেন—কি যে বল সকাল বেলায় গরম জল মানেই চা, সবাই বোঝে।

—বোঝেন, যাঁরা ঘোরানো কথা বোঝেন। বেশ তো, দেখুন।

একটু পরেই কুমুদরঞ্জন ফিরে এসে বসলেন আমাদের কাছে। বললাম—আপনি কি হাত মুখ ধোয়ার জন্যে গরম জলের কথা বলে এলেন?

'হ্যাঁ, এক্ষুনি করে দিচ্ছে।'

নিন, হল তো! —হেসে উঠলাম সকলেই।

'কেন, কি হল?' —জিজ্ঞেস করলেন উনি।

তারাশংকরদা হেসে বললেন—একটু চায়ের কথা বলেছিলাম দাদা।

'ও, এই কথা! আমি ভাবলাম, মুখ ধোবার জল। আচ্ছা, বলে আসছি।'

আবার গেলেন তিনি বাড়ির মধ্যে।

এমন সহজ সরল মানুষটি।

এ সব মানুষকে কি না ভালোবেসে পারা যায়!

বিকেল চারটেয় কবির সংবর্ধনা সভা। সভায় লোক আসতে শুরু হয়েছে। কাটোয়ার এস. ডি. ও. এলেন (তাঁরই চেষ্টায়, শোনা গেল, এই আয়োজন), কলকাতা থেকে সবান্ধবে এলেন কবিপুত্র জ্যোৎস্না মল্লিক।

বর্ধমান থেকে সস্ত্রীক জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং মুভিক্যামেরা সহ মেডিক্যাল অফিসার। এসেছেন বহু গ্রামের লোকেরা, ছোট ছোট ছেলেরা হয়েছে জড়ো তাঁদের কাছের অতি আপন জন কবি কুমুদরঞ্জনের সংবর্ধনা সভায়— তাদেরই আগাম অধিকার। পরণে গরদের ধুতি-পাঞ্জাবি, কাঁধে চাদর, গলায় ফুলের মালা—সুসজ্জিত কবি সবলের কুশল জিজ্ঞাসা করছেন। আর আশ্চর্য, মানীদের ছেড়ে বারে বারে ছুটে যাচ্চেন তিনি গাঁয়ের সংকুচিত, বিহ্বল লোকগুলির কাছে। তাদের গায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে নানা প্রশ্ন— 'হ্যাঁরে, কখন এলি? কখন বেরিয়েছিলি? রোদ্দুরে কষ্ট পাস নি তো? তোর বাবা কেমন আছে রে?' ইত্যাদি।

সভা শুরু হল। সভাপতি তারাশংকর ও কবি কুমুদরঞ্জন মঞ্চে লাল কার্পেটের উপর বসলেন, আমরা তার আশেপাশে। কুলপুরোহিত এসে আশীর্বাদ করলেন। সাহিত্যতীর্থের তরফ থেকে রমেন্দ্র মল্লিক করলেন মান-পত্র পাঠ। সদ্য আগত কবি মৃত্যুঞ্জয় মাইতি এক সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করলেন, শৈলজানন্দ কুমুদরঞ্জনের সম্বন্ধে কবিশেখর কালিদাস রায়ের একটি কবিতা 'অজয়ের কবি' আবৃত্তি করলেন। অন্তরের টানে মাঠ-ঘাট পেরিয়ে ব্যাগ বগলে ব্যঙ্গশিল্পী রেবতীভূষণ এসে জানালেন তার শ্রদ্ধাঞ্জলি।

তারাশংকরদা তাঁর সভাপতির ভাষণে বললেন:

এখানে এসে এই জ্যেষ্ঠ কবির পরিচয় নতুন করে দেবার দরকার নেই, এই কবির পরিচয় হয়তো দিতে হবে শহরে, কারণ এই গ্রামের প্রতিটি তৃণ, প্রতিটি লতা কবিকে চেনে জানে। কবি আমাদের প্রাচীন কালের শেষজন। আমরা ইউরোপের যা নিয়েছি তার জন্যে লজ্জিত নই, লজ্জিত নিজেদের সাময়িক আত্মবিস্মৃতির জন্যে, লজ্জিত সব কিছু ভুলে একমাত্র পশ্চিমের সব কিছুকেই একদিন মেনে নিয়েছিলাম বলে। কবি উচ্চশিক্ষিত তবু আজও আমাদের সেই গৌরবময় প্রাচীন ঐতিহ্যকে আঁকড়ে আছেন। বিদেশের কবিরা যশের জন্যে কাব্য রচনা করেন। বাংলার কবিরা জীবনদেবতার পূজা করেন কাব্যের মাধ্যমে। মাটির মধ্যেই কুমুদরঞ্জন মাতৃদেবতার সন্ধান পেয়েছেন, এই-ই তাঁর জীবনসাধনা।

কবি কুমুদরঞ্জন সংবর্ধনার উত্তরে বললেন—আমি সামান্য লোক, তোমরা এলে এতেই আমি খুব আনন্দ পেলুম, লজ্জাও পেলুম আমি এ সবের উপযুক্ত নই ভেবে। পল্লীগ্রামের সামান্য লোক আমি, বোধ হয় মা মঙ্গলচণ্ডীর ইচ্ছে হল এখানে তোমাদের আনার তাই তিনি তাঁর ইচ্ছে পূরণ করলেন। আমার পল্লীবাসীরা আমায় ভালোবাসে, আমিও ওদের খুব ভালোবাসি। যাঁরা আমার প্রতি ভালোবাসার নিদর্শন নিয়ে এই সভায় এসেছেন তাঁদের আমি কোটি কোটি প্রণাম জানাই, যাঁরা আশীর্বাদের যোগ্য তাঁদের আশীর্বাদ করছি। আমার মতো সামান্য লোকের সামান্য জন্ম তিথিতে এই বিরাট

ব্যাপারে সংকোচ বোধ করছি। আমায় সবাই ভালোবাসে বলেই অনেক বাড়িয়ে বলছে।

পরিশেষে সেদিনের সংবর্ধনা-সভায় পঠিত আমার ভাষণটির পুনরুল্লেখ হয়তো এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না—কথায় বলে গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজো।

আজ অজয়ের তীরে দাঁড়িয়ে আজকেরই এক অজেয় কবিসন্তানের কবিতা দিয়েই জানাই আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি।

কবি কুমুদরঞ্জন লিখেছেন তাঁর 'হংস খেয়ারী' কবিতায়—

তার সে ছোট কুটিরখানি অজয় নদীর পারে
ছোট ছোট শিশুর গাছ জাগছে চারিধারে।
বসলে আঙিনায়　　ক্ষেতটি দেখা যায়,
ছুটে ছুটে ভেড়া ছাগল আসছে তাহার দ্বারে।
তরুলতার রাঙা ফুলে চালাটি আছে ঢেকে,
বাতাস আসে শিউলি ফুলের বাসটি গায়ে মেখে।
নদীর কালো জল　　করলে টলমল,
হাঁসগুলি তার হেলেদুলে ডাঙায় আসে বেঁকে।
দোপাট ডোঙায় একা কেবল যাত্রী করে পার
আটটি জনের বেশী কভু নেয় না সে তো ভার।
ঝিঙে কচু পুঁই,　　ভাবে কোথায় থুই,
হাটের লোকে আঁজুল-আঁজুল দেয় যে পুরস্কার।
মামলা মকর্দমা আর ধরার কোলাহল
পায়না সে তো শুনতে, বিনা নদীর কলকল।
শুধু গঙ্গাস্নানে,　　যায় 'কাটোয়া' পানে
আদালতের নামে তাহার চরণ টলমল।
চণ্ডীমায়ের সোনার 'কোঁগা' তার বুকে যে থাকে,
ভোরে উঠেই লোচনদেবের চরণধূলা মাখে।
গাজন উজানিতে,　　হৃদয় উঠে মেতে,
সুখে দুঃখে মঙ্গলারে হৃদয় ভ'রে ডাকে।

'উজানি'র কবির কলমে আঁকা এই 'হংস-খেয়ারী'টিকে। কবি নিজের অজ্ঞাতেই বুঝি নিজেরই চরিত্র এঁকে বসেচেন। চণ্ডীমায়ের সোনার কোগাঁয়ের হংস-খেয়ারীর মাধ্যমে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের পল্লীকবি কুমুদরঞ্জনকেই। আজো তিনি কাব্যের ডোঙাটি নিয়ে অজয় নদীতে খেয়া বাইচেন জল-ছলছল প্রবহমান ছন্দে ও সুরে।

কালগতিকে ষ্টীমারের বেসুরো আওয়াজ এসেচে তাঁর কানে, তার ধোঁয়া এসে লেগেচে চোখে, জলে ঢেউ জেগে লেগেচে তাঁর ডিঙিতে—

কিন্তু কাব্যের এই খেয়া-মাঝিটি টলেন নি, ঝাঁঝালো সার্চলাইট তাঁর চোখ ধাঁধাঁতে পারে নি। বৈঠা আঁকড়ে বসে আছেন।

তবে এই মাঝিটির সঙ্গে হংস-খেয়ারীর একটু তফাত আছে। হংস-খেয়ারী নদীর কলকল ধ্বনি ছাড়া ধরার কোনো কোলাহলেই কান দেয় না, কিন্তু এই কাব্যমাঝির দৃষ্টি যেমন ঘরে, তেমনিই বাইরেও, তাঁর সাম্প্রতিক দুটি কবিতা থেকে সামান্য উদ্ধৃতিতেই বোঝা যাবে এঁর দেশপ্রীতি। বাঁশি ধরতে যেমন জানেন বাঁশ ধরতেও পেছিয়ে থাকেন না তিনি।

ভারতবাসীদের প্রতি কটূক্তি করায় 'লর্ড ম্যালভার্ণের প্রতি' কবিতায় তিনি লিখেছেন—

শুনি লর্ড তুমি? বিস্ময়কর অনুদারমনা তবুও এত
হীন ও ইতর ধৃষ্টের সাথে প্রভেদ তোমার রাখিলে না তো।
কারা ছিল তব পূর্বপুরুষ জেনো 'ডারুইন' শিষ্যে পুছে,
দেখছি তাদের লাঙুলের চিন্ এখনো তোমার যায় নি মুছে।

'পর্তুগীজ' কবিতায় লিখচেন, পর্তুগীজদের উদ্দেশ্য করে—

ক' বিঘত জমি আছে? মরিতেছ—তাহারি লাগিয়া দম ফেটে?
শত শতাব্দী চলে গেল তবু রয়ে গেলে সেই বোম্বেটে?
গোয়া? সে দ্বিতীয় গয়া হবে নাকি? সাঙ্গ করতে শেষ লীলা?
উহাই হবে কি পর্তুগালের পিণ্ডদানের প্রেতশিলা?

সত্য আর শান্তি দিয়েই রচা কবি কুমুদরঞ্জনের কাব্যডিঙাটি হংস-খেয়ারীর দোপাটি ডোঙার মতোই। এখন প্রশ্ন—কবি যে এতদিন আমাদের তার কাব্যডিঙায় পারাপার করালেন এবার তাঁর প্রাপ্য কড়ি গুণচে কে?

আমরাই, তাঁর আপন হাটের লোকেরা। 'আঁজুল আঁজুল' দিতে হবে আমাদের দেয়া। কি দেবো? আমাদের অন্তর আঙিনার আপন করা ফসল—'ঝিঙে, কচু, পুঁই'; টবের রডোডেনড্রন গুচ্ছ নয়, প্রাণ-খোলা শ্রদ্ধা, ঠোঁটের ঠাণ্ডা হাসি নয়।

যে কবির গলায় 'বনমল্লিকা', বুকে 'বনতুলসী', কানে 'শতদল', পায়ে 'নূপুর', হাতে 'একতারা'—'অজয়ে'র তীরে 'স্বর্ণসন্ধ্যা'য় আপনার গানে আপন-হারা, মাতোয়ারা হয়েছিলেন—সে কবি কাব্যের মুখাপেক্ষী নয়, আমাদেরই অপেক্ষা করতে হত তাঁর একটু স্নেহ দৃষ্টি পাবার আশায়।

কুমুদকাব্যের কলাকৌশল

সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

কলাকৌশলের দিক থেকে প্রসিদ্ধ সমালোচক কথিত eyes .. to see and ears to hear কবি কুমুদরঞ্জনের অনির্বচনীয়।

দেশীয় শব্দের সাথে যখন তখন সাধুশব্দ মিশানোর বিবাদ তিনি এই অনির্বচনীয় অনুভব-শক্তিতে কাটিয়ে উঠেছেন। একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক আর একজন বাগ্মী অধ্যাপকের বিষয় বলতে গিয়ে বলেছিলেন যে As Ariel was in the Service of Prospero, So English language was in the Service of Prof. J. L. Banerjee : he was the wizard of English language, আর একজন প্রসিদ্ধ সমালোচক এই কথাই অন্য ভাবে বলেছিলেন, 'Words came out of him in a huddling succession, reeling, as it were, in the Joy of release'. কুমুদরঞ্জনের মুঠো মুঠো সাধু অসাধু মিশানো বাংলা শব্দগুলি দেখলে তাই বলতে ইচ্ছে করে—এই খানেই কবি হিসাবে তাঁর নিজের শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা। ধুরন্ধর সাইকেল চালক যেমন দুহাত ছেড়ে যে কোনো জনবহুল বা আঁকা-বাঁকা বিপৎসঙ্কুল পথ দিয়ে তাঁর যানকে চালিয়ে যেতে পারেন, আরো একটু উর্দ্ধে উঠলে নীল আকাশে পাখি যেমন পাখা ঝাপটিয়ে কতদূর গিয়ে আবার পাখাকে স্তব্ধ করে অনেক দূর চলে যেতে পারে, কুমুদরঞ্জন সেই রকম শব্দপ্রয়োগে অকুতোভয় সাবলীল স্বচ্ছন্দ, বিপৎসঙ্কুল ভাবে স্বৈরাচারী অথচ অমোঘ ভাবে মৌলিক ও সুন্দর। কালিদাসের রঘুবংশের বিমান-যাত্রার সেই প্রণালীটি—

> ক্বচিৎপথা সঞ্চরতে ঘনানাং কচিৎ খগানাং পততাং কচিচ্চ।
> যথাবিধো মে মন সোঽভিলাষঃ প্রবর্ত্ততে পশ্য তথা বিমানম্॥

কথাটি তাঁর ক্ষেত্রেও লাগানো যায়।

দেশী শব্দ প্রয়োগের বিপদ হ'ল এর বাহুল্যে কাব্য প্রাদেশিক বা গ্রাম্য পর্যায়ে নেমে যেতে পারে, আবার সাধু শব্দও উদ্ভট বাছাই করা ভাষা ও ভাবে বোনা কাব্য পণ্ডিতের আস্বাদ্য হয়, সাধারণের বা চিরকালের রোচনীয় হয় না। কুমুদরঞ্জনের অধিকাংশ কবিতাই এই উভয় বিপদ এড়িয়ে গেছে। এমন ভারসাম্য বজায় রেখে, সেগুলি জীবনের খণ্ড ক্ষুদ্র অথচ অপরিহার্য সত্যের ওপর সেগুলির স্থিতি যে যতদিন যাবে তত তাদের ঔজ্জ্বল্য বাড়বে।

প্রবাদ বাক্যের গঠনে যেমন সংক্ষিপ্ততা, লঘুতা, মিল ও মার্জিত রূপ দেখা যায়, কুমুদরঞ্জনের কাব্যে ঠিক সেইরকম পাওয়া যায়। আমরা দুই একটি শব্দালংকার ও দুই একটি অর্থালংকার পরীক্ষা করলেই এর সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবো।

ধরুন 'রহস্য' কবিতাটি। জগতের রহস্যের মধ্যে বেছে বেছে কবি কতকগুলি অতি সাধারণ নমুনা ধরে কবিতাটি লিখেছেন। কবিতায় কবির চোখ, হৃদয় ও বুদ্ধি একত্র হয়ে কি ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেছে তা ভাবতে অবাক্ লাগে। প্রথমেই ভগবানের স্বতোবিরোধী দুটি গুণ—যেমন কৃপণ আবার তেমনি দানী তিনি। তার প্রমাণও অদ্ভুত। ঋতু পরম্পরার বিচিত্র রূপ আপাতত যেখানে সেখানে তার রঙের ও রসের ছড়াছড়ি, তাতে কোনো বিচার বা বিবেচনা পরিচয় যেন মেলে না এই ভাব। তার সাথে শব্দালংকারের কেমন সমারোহ সেইটিই অনুধাবনের বিষয়। প্রথমেই দেখুন গ্রীষ্মের বর্ণনা—'নিদাঘে কেবল ধূ ধূ ধূসরের ধুলোট শুধু' এই ধূ ধূ করা ভাবটি যেন আপনা আপনি কবির কলম থেকে ঝরে পড়েছে কাকু ও অনুপ্রাসের ধারা ধরে: দ ধ ঘ যথাক্রমে এই ঘোষবৎ ও মহাপ্রাণ বর্ণ, তার সাথে আ এ এউউ উ এ ও উ এই স্বরবর্ণগুলির তরঙ্গ যোগ হয়ে সন্ন্যাসী গ্রীষ্মের হাহাকারকে মূর্ত ও ধ্বনিত করে তুলেছে। তার পরেই বর্ষার রিমঝিম বৃষ্টি ধারারও ক্ষণমধ্যে প্লাবনের আভাস ফুটে উঠেছে ন ধ্বনি ও অন্তস্থর, ল ধ্বনির সমাবেশে। শরতের কোমলতা অসংখ্য ল ধ্বনির প্রাচুর্যে, লতাপাতার মেশামেশি অ ও আ স্বরের পাল্টাপাল্টিতে ধরা পড়েছে। ফড়িঙের লঘুদেহ ও স্বচ্ছ পাখাটি, সানুনাসিক প্রায় স্বরবর্ণের কাছাকাছি ঙ ও ল ধ্বনির মাধ্যমে। কাশ ফুলের আশ কবিতায় এই রকমেই লঘুহস্তের কারুকার্য—'পুলকোগুলি খাসা— যেন কাশের আশা,

আকাশ-কুসুম হবার আশে নাচে।' (কাশের আশ)

এখানে শ ও স ধ্বনির মধ্যে কোমল লোমের মতো কাশফুলের কেশরগুলির সূক্ষ্মতা, তাদের মধ্যে দিয়ে মৃদু বাতাসের ঈষৎ স্পর্শ ভেসে আসছে। কাশের আশা, আকাশ এই তিনটি শব্দের স্বরসাম্য যমকের আভাস দিচ্ছে। কাশফুলের যেন রূপে ও ধ্বনিতে তার লঘুপক্ষ বিস্তার করে আমাদের চোখের সামনে নাচতে শুরু করেছে। রবীন্দ্রনাথের তালগাছ আর একটু ভারী ও ঘনপিনদ্ধ সারবান্, তাই তার এতখানি লঘুতা কবিগুরু দেন নি—

তালগাছ একপায়ে দাঁড়িয়ে,
সব গাছ ছাড়িয়ে,
উঁকিমারে আকাশে।

এখানে অন্যান্য শব্দগুলির ভার আছে, সেগুলি ব্যঞ্জন-বহুল, কেবল পঙ্‌ক্তির শেষের শব্দগুলি অন্তঃস্থ 'য়' ও 'এ' কার যোগে শূন্যতার বা মুক্তির আভাস দিচ্ছে। কারণ দীর্ঘ তালগাছের উপর প্রান্তটাই শুধু আকাশের দিকে মেলা। কাশফুলের তন্বী দেহযষ্টিও লঘু। তার মাথার অনেকখানিও কোমল শূন্যতাময় পুলকোবহুল। কুমুদরঞ্জন এখানে তাঁর নিজস্বতায় ভাস্বর হয়ে আছেন।

লঘু-হস্ততার পর ভারসাম্য দেখুন 'বৈকালি' কবিতায়। এখানে অজ পল্লীগ্রামের ব্যবহৃত বিশেষণ 'বোঁজা' ও বিশেষ্য 'পয়নালী'র সাথে 'পথভরা জল'

এই মাঝামাঝি বিশেষ্য বিশেষণের সোপান পার হয়ে কবি গুরুগম্ভীর 'শিশুবনিক' 'সুযোগ' 'তরণী' ও 'পণ্য রাশি' এই বিশেষ্যগুলি এবং 'অবিরল' 'প্রবল' এই বিশেষণ দুটি প্রয়োগ করে বালচাপল্যের পাশাপাশি প্রসন্ন প্রবীণতার মায়া সৃষ্টি করেছেন—

বোঁজা পয়নালী পথভরাজল,
শিশুবনিকের সুযোগ প্রবল,
কত না তরণী ছাড়ে অবিরল ভরিয়া পণ্যরাশি ॥

এখানেও জলের প্রাচুর্য সূচক 'ল' ধ্বনি, ঠুন্‌কো খেলনার পণ্যরাশি-সূচক 'ন'-ধ্বনি লক্ষ্য করার মতো।

এইবার দেখুন গুরুগম্ভীর শব্দ প্রয়োগ ও ভারসাম্য। 'এহেহি' কবিতার স্তবকে স্তবকে তৎসম শব্দের নৃত্য চোখ এড়ায় না—

বটহে, তুমিই বট হে,
পাঞ্চজন্য কম্বু নিনাদে পশিছে কর্ণ পটহে,
নহে আনন্দ নহে সৎচিৎ,
এ বিশ্বরূপ লোকক্ষয়কৃৎ
নূতন যুগের করিতে সূচনা হলে প্রলয়ের নট হে ॥

'আজিকে রাতি' কবিতায় ছন্দের নর্তন আরো সুস্পষ্ট, এ কবিতাটিতে পরিচিত অপরিচিত আটপৌরে ও পোষাকী ভারসাম্যও প্রচুর—

সমুখে মাধবী তেমনি শ্যামলা, শাখে থলো থলো কুঁড়ি গো,
বরণ পিঁড়িতে এখনো রয়েছে পুরানো এলুন গুঁড়ি গো
কোকিলের ডাক তেমনি মদির, কইতো হয় নি পুরাতন ?
মনি মঞ্জীর ঝঙ্কত নিশি বাজে কঙ্কণ কনকন।

অযুক্তাক্ষর ও যুক্তাক্ষরের মিশ্রণেও সেই ভারসাম্য বজায় আছে। প্রথমে তিনি লিখলেন—

সাহিত্যিক কি কবি না হই, যাত্রী বটে মোরা,
কার্য ছিল সাহিত্যের সব তীর্থে শুধু ঘোরা ॥

এখানে প্রতি পঙ্‌ক্তির প্রতি পর্বে হসন্ত শব্দ বাদ দিয়ে ৪, ৪,৪,২ অক্ষর। কিন্তু পরের দুই পঙ্‌ক্তিতে আপাতত—

তীর্থে শুধু প্রণাম রেখেই হয়েছি ধন্য,
ভেদ নাহিক প্রসাদ কিংবা যশেরও জন্য ॥

কিন্তু ঐ আপাততঃই। এখানেও প্রথম পঙক্তিতে ৪, ৪,৪,২ কেবল শেষের দুটি পর্ব পড়তে হবে হয়েছি ধ/নিয় এবং যশেরোজ/নিয়—এই ভাবে। দ্রুত লিখেও তাল ঠিক রাখবার এরূপ উদাহরণ দুর্লভ।

তা ছাড়া কবি সংস্কৃত মাত্রা সব সময় মানেন নি। একই শব্দে তিনি যুক্তাক্ষরের আগের অক্ষরকে গুরু বা দ্বিমাত্রিক বলে মেনে নিয়েছেন, কিন্তু

সমাস বদ্ধ দুটি তিনটি শব্দ যেখানে থাকে সেখানে যুক্তাক্ষরের আগের বর্ণকে স্বরান্ত ধরেছেন। উপরেই তার প্রমাণ আছে—

'নহে আনন্দ নহে সৎচিৎ, এ বিশ্বরূপ লোকক্ষয়কৃৎ।

এখানে একই 'আনন্দ' ও 'বিশ্বরূপ' শব্দের অন্তর্গত 'ন' ও 'বি' অক্ষর দ্বিমাত্রিক, কিন্তু লোকক্ষয়, কৃৎ এই তিনটি শব্দে গাঁথা সমাসের অন্তর্গত 'ক' টি হসন্ত। এখানে বাংলার দাবি তিনি মেনেছেন।

মিলের পরিধির মধ্যে থেকেও তিনি অনেক ইতর বিশেষ করেছেন কানের ও মনের মর্যাদা বশে।

যাকে বলে ভালো মিল বা Perfect rhyme তা তিনি আধুনিকদের মতোই মান্য করেন নি। 'হিংসার সাথে মীমাংসা' 'বিধির সাথে (প্রতি) পদই, 'দুর্যোগের সাথে' 'সূর্যকে' 'দোরখেলা' ও 'ভোরবেলা' 'কোনঝরে' ও 'পুঞ্জেরে' 'ফুল্লরা' ও 'ফুলওরা', 'উল্লাসে ও 'তুল্যসে' বিশ্ব, দৃশ্য ও রেখায় গো' এমন কি 'ভুল বকি' ও 'ফুল কপি' মিলিয়ে দিতে তাঁর আপত্তি নেই। আর আধুনিক কবিতার প্রবণতাই হল পূর্ণ মিলের চেয়ে মিলের ঈষৎ আভাসের দিকে। তাতে ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টির মাঝে একটু সাম্যের রেশ বাজে।

এইরূপ মিলের প্রচলন ইংলণ্ডে আগেই শুরু হয়েছে। ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত বিখ্যাত ইংরেজ আধুনিক কবি Auden-এর লেখা Look, Stranger কবিতায় দেখুন—

Here at the small field's ending Pause,
Where the chalk wall falls to the foam, and
its tall ledger.
Oppose the Pluck,
And Knock of the tide,
And the Shingle Scrambles after the Sucking
Surf And the gull lodges.
Amoment on its sheer side.

এখানে tide ও Side এ পূর্ণ মিল, পঙ্‌ক্তির মধ্যে tall ও fall এরও মিল আছে। কিন্তু lodges ও ledges আংশিক ব্যঞ্জনগত মিল chalk, pluck, knock এই গুলিতেও তাই। আর chalk, wall, fall, foam tall, lodges ইত্যাদি শব্দে ধ্বনিতরঙ্গ আছে। আধুনিক কবিতা অনেকটা এই কাঠামোয় গড়া। কুমুদরঞ্জন দীর্ঘদিন থেকে এর সূচনা করেছেন তাঁর কাব্যে। অর্থালংকারের মধ্যে সমাসোক্তির মাধুর্য কবির কাব্যে অনন্যকরণীয়। ভুঁই-চাপাকে তিনি বললেন—'তুলট পুঁথির মলাট খুলে শকুন্তলা বেরিয়ে এলো।' জুঁইকে বলেন—'অনুরাগের পথের সাথী আমার রাণী তুই', রিকসা হল 'সহজিয়া চায় পথ সহজ সরল'। মৌচাকের উদ্দেশে উচ্চারিত 'এক সাথে কোথা এত কবি

সম্রাট’। দ্রাক্ষালতাকে সম্বোধন করে বললেন কবি—‘রাজপুত্তনায় আনলে তুমি ল্যাপল্যাণ্ডের মেয়ে।’ উল্টোদিকে উপমাও অনুপম; সাঁওতাল যুবতীকে বললেন—

জ্যোৎস্না এবং আঁধার ভেঙ্গে গড়লে তারে বিধি,
পূর্ণিমা নয় মূর্তিমতী কৃষ্ণা প্রতি পদই ॥

বৃদ্ধ ঠাকুর্দা ও নাতির মিলনকে বললেন ‘চৈত্র বৈশাখী’ এবং মন্তব্য করলেন—

মাথুর এসে মিশল হঠাৎ পূর্বরাগের সনে।
মধুরতর নিবিড় মিলন বোধন বিসর্জনে ॥

এক বৃদ্ধকে—

কমলের ঝিল জলে ঝিলমিল ঝিলমে
শ্যাকলের ভিটা লোপ রজতের নিলামে ॥
নাতিদনে একাসনে বসে দুই বালকে
ত্রিদিবের কথা কয় প্রদীপের আলোকে।

‘পুরানো চিঠি’তে শোকের খবর—

ছেলের গলায় সোনার হারের সাথে,
কেনরে এই বাঘের নখর গাঁথা ?

বিরোধ অলংকার। চন্দনকে বলছেন—

আনে এমন পূর্ণতা কার ক্ষয় গো,
কোথায় বলো ক্ষয়ের এমন জয় গো,
শুষ্কতা এমন কমণীয় ?

সত্যই তাঁর নিজের ভাষায় বলতে গেলে—

‘কবি তাঁর কাব্য লিখে বিটপীফুল ফোটায় যেমন
ডুবুরী সাগর জলে মুক্তা তোলে মুঠায় যেমন

ভক্ত কুমুদরঞ্জনের ক্ষেত্রে অবশ্য শেষের পংক্তিটিও সমান ভাবে প্রযোজ্য—

‘সাধক তার ইষ্টদেবের [illegible]’

কারণ তাঁর কাব্যই উপাসনা।

সহজিয়া কবি কুমুদরঞ্জন

অজিতকৃষ্ণ বসু

দশ বছর বয়সে আমার কবি কুমুদরঞ্জনের প্রতিভার সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল হিজ মাস্টার্স ভয়েস রেকর্ডে শ্রীমতী আঙুরবালার গাওয়া একটি গানের মাধ্যমে—

'ওরে মাঝি, তরী হেথা বাঁধব নাকো আজকে সাঁঝে।
ভিড়ায়ো না, চলুক তরী নদীর মাঝে।'

গানটির শেষ স্তবক—

'ঐ ঘাটে ঐ গাছের পাশে তটিনীর ঐ শ্যামল কূলে
দিয়েছি সেই স্বর্ণলতায় আপন হাতে চিতায় তুলে।
আজো যে সেই চিতার পরে
শিথিল বকুল পড়ছে ঝরে,
আজো মধুর মুখখানি তার দেয় যে বাধা সকল কাজে।
তরী হেথা বাঁধব নাকো আজকে সাঁঝে।'

গানটির বাণীর অকৃত্রিম, কারুকার্যহীন সহজ সরল করুণ আবেদন কি গভীরভাবে আমার মর্ম স্পর্শ করেছিল, তা এই পঞ্চাশ বছর পরেও আমার স্পষ্ট মনে পড়ছে। ইংরাজ কবি শেলি অতি সত্য কথা বলেছিলেন তাঁর স্কাইলার্ক পাখি সম্পর্কিত কবিতায়—'আমাদের সব চেয়ে করুণ ভাবপূর্ণ গানগুলিই হচ্ছে আমাদের সব চেয়ে মধুর গান।'

যে কবিতাটি এই আশ্চর্য মর্মস্পর্শী গানের রূপ নিয়েছিল তার নাম 'নৌকা পথে'। নদী পথে নৌকায় যেতে যেতে তীরবর্তী গ্রামটি দেখছেন কবি, ঘনায়মান সন্ধ্যার প্রাথমিক অন্ধকারে। তাই দেখে বিষাদের ছায়ায় ছেয়ে যাচ্ছে তাঁর মন। নদীর মাঝখান থেকে তিনি নদীর কিনারায় সেই ঘাটটি দেখতে পাচ্ছেন, যেখানে প্রিয় প্রিয়াকে একদিন আপন হাতে চিতায় তুলে দিয়েছিল! সেই ঘাটেরই কাছে আজ কেমন করে তরী বাঁধবেন?

বেদনা যে কত গভীর অথচ কত মধুর হতে পারে, সেটা ঐ অল্প বয়সেই এই গানটির বেদনাভরা মাধুর্য আমাকে অনুভব করিয়েছিল। কিন্তু তখন জানতাম না এই অনবদ্য গীতিকবিতাটির রচয়িতা কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক। পরে জেনেছিলাম, জেনে তাঁর কবিতা আরো পড়বার আগ্রহ এবং সুযোগ পেয়ে তার সদ্ব্যবহার করেছিলাম। ছোটদের এবং বড়দের মাসিক পত্রে তাঁর কবিতা অমন সহজ সরল আর মধুর বলেই ভালো লাগত।

তার পর যত বুদ্ধি পাকতে লাগল, দেশী এবং বিদেশী বিশেষ করে বিদেশী (অর্থাৎ ইংরাজি) অনেক কবিতা পড়তে লাগলাম, ততই মনে হতে লাগল কুমুদরঞ্জন সম্বন্ধে ভুল করেছি, তিনি কবি নন, পদ্যলেখক মাত্র। তাঁর রচনা

কবিতা আখ্যা পাবার মতো যথেষ্ট অসরল নয়, তাতে কোনোরকম চোখ ধাঁধানো চমক বা মন ধাঁধানো ওস্তাদী কায়দা নেই। এমন সাদামাটা পদ্যরচনাকে কি কবিতার মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে?

ইংল্যাণ্ডের অনেকেরই মনে এমনি প্রশ্ন জেগেছিল ইংরাজি কবিতা সাহিত্যের রোমান্টিক যুগের কবিগুরু ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ-এর কবিতা সম্পর্কেও। কিন্তু ক্রমে তাঁদের মন থেকে সেই ভুল বিদায় নিয়েছিল, তাঁরা যখন কবির অসামান্য প্রতিভার মূল সুরটি উপলব্ধি করেছিলেন। তেমনি আমারও যখন কবিতার মূল্যায়ন সম্পর্কিত বুদ্ধি আরেকটু বাড়ল, তখন আমি বুঝতে পারলাম কুমুদরঞ্জন 'পদ্য লেখক মাত্র' নন, তিনি খাঁটি কবি। তাঁর কবিতার যে সব লক্ষণগুলিকে অভাব বা দৈন্য বলে ভুল করেছিলাম, তারা প্রকৃতপক্ষে তাঁর স্বভাব এবং ঐশ্বর্য। হৃদয়ের সহজ অনুভূতিকে তিনি স্বতঃস্ফূর্ত সহজ ভাষায় প্রকাশ করেছেন, ইংরাজি কবিতার ক্ষেত্রে যেমন করেছিলেন ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ।

'রিক্স' নামক কবিতায় কুমুদরঞ্জন লিখেছেন—

'রাজ্যের যান মহাকাব্য না হোক,
স্নিগ্ধ সে সুন্দর উদ্ভট শ্লোক।
ধ্রুপদ খেয়াল নয়, নাই মান তার,
তাইরে নাই-রে যেন দুটি কথার।
পজ্ঝটিকা সে নয়, নয় ত্রিষ্টুভ,
নব লঘু ত্রিপদীর ছন্দের রূপ।
নয় সে তো হঠযোগী, নাই যোগবল,
সহজিয়া চায় পথ সহজ সরল।'

কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ এবং শেলি যেমন তাঁদের 'স্কাইলার্ক' সম্পর্কিত কবিতা দুটিতে আসলে নিজেদেরই প্রকাশ করেছিলেন ঐ পাখিটিকে উপলক্ষ্য করে, আমার মনে হয় কবি কুমুদরঞ্জনও এই কবিতায় তেমনি ঐ রিক্সওয়ালাকে উপলক্ষ্য করে নিজের কবি রূপটিকেই প্রকাশ করেছেন এবং তাঁর স্বরূপটি ফুটে উঠেছে কবিতাটির শেষ লাইনে—'সহজিয়া চায় পথ সহজ সরল।'

এই সহজিয়া পথের সহজ-যাদুকর কবিরূপেই তিনি বেঁচে আছেন এবং বেঁচে থাকবেন।

আমি কবিদের মোটামুটি রকমে দুভাগে ভাগ করে নিয়েছি—সহজিয়া কবি আর মগজিয়া কবি। সহজিয়া কবিদের সহজ আবেদন হৃদয়ের কাছে, তাঁরা হৃদয়ের সহজ কথা সহজ ভাষায় বলতে ভালোবাসেন; মগজী চাতুর্য তাঁদের নেই, তাঁরা তার প্রয়োজনও বোধ করেন না। আর মগজিয়া কবিদের আবেদনের লক্ষ্য হচ্ছে মগজ, তাই সহজ কথাকে কি করে জটিল কায়দায় ধাঁধিয়ে তোলা যায় তাই নিয়ে তাঁরা মগজ খাটাতে ভালোবাসেন। সহজ

নয় বলেই তাঁরা সহজ হতে পারেন না। অবশ্য মগজিয়া কবিতারও একটা আলাদা ধরনের আবেদন বা মজা আছে, যা সহজিয়া কবিতায় নেই। কিন্তু মগজিয়া কবিতায় ভাবের চাইতে ভঙ্গিই প্রধান হয়ে ওঠে; আর যুগে যুগে ভঙ্গি বদলে যায়, কিন্তু হৃদয়ের মূল ভাবগুলি বদ্‌লায় না, তারা চিরন্তন। হৃদয় গ্রহণ করে ভাবকে, ভঙ্গিকে নয়। তাই কবিতার হৃদয়বান আর হৃদয়বতী পাঠকপাঠিকাদের কাছে স্বভাবতঃই মগজিয়া কবিতার চাইতে সহজিয়া কবিতার আবেদন অনেক বেশি।

কবি কুমুদরঞ্জন বেছে নিয়েছিলেন সহজিয়া পন্থা। না, ঠিক বললাম না। বলা উচিত সহজিয়া পন্থাই তাঁকে আপন বলে বুকে টেনে নিয়েছিল। তিনি ছিলেন সহজ কবি, স্বভাব কবি। তাঁর সম্বন্ধে কবিশেখর কালিদাস রায় বলেছেন—

'কবির রচনাভঙ্গি এত অনুদ্ধত, সুকুমার, শান্তশুচি, স্নিগ্ধ ও কমনীয় যে যুগের দ্রুতচারী আত্মাভিমানী উদাসীন পাঠকের চোখে পড়িবার কথা নয়।'

কবিশেখরের এই উক্তির সঙ্গে আমার যোগ করে দিতে ইচ্ছে হয়—'ইহা উদাসীন পাঠকের দুর্ভাগ্য।'

আমার মনে হয় কুমুদরঞ্জনের কবিপ্রতিভা এবং কবিজীবন সম্বন্ধে আরো আলোচনা এবং গবেষণা হওয়া উচিত।

কবি কুমুদরঞ্জন সকাশে একদিন

সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

'ওই ঘাটে ওই গাছের পাশে তটিনীর ঐ শ্যামলকূলে' জীবন তরীর মাঝি তরী আর বাঁধবে না। ও পারের শান্তি পারাবারে চ'লে গেছেন বর্তমান বাংলার সর্ব জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ কবি কুমুদরঞ্জন। শৈশবে বোধোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবিতার মতো কুমুদরঞ্জন মল্লিক ও কালিদাস রায়ের কবিতার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার আকাশবাতাস, তরুলতা, বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি তাঁর কবিতার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। কুমুদরঞ্জন শুধু বড় কবি নন, দরদী মানুষ হিসেবে তিনি আরও বড় ছিলেন। আপন-ক'রে নেবার অসীম ক্ষমতা তাঁর উদার সমুদ্র-হৃদয়ের ছিল। বর্তমান কলুষ কঠিন, ঈর্ষা অসূয়ার জগতে তিনি ছিলেন অদ্ভুত ব্যতিক্রম। তিনি ছিলেন স্বভাব বৈষ্ণব। তাঁর আলাপ-আলোচনায়, তাঁর চরিত্র মাধুর্যে, তাঁর সহৃদয় আত্মিক ব্যবহারে, সকলের শুভ কামনায় তিনি ছিলেন বৈষ্ণব আদর্শের জলন্ত প্রতীক। পরে তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় যখন ঘনিষ্ঠতর হয় তখন তিনি হলেন দূরে-থাকা আমাদের পরিবারের এক হিতৈষী ও শুভাকাঙ্ক্ষী অভিভাবক। সৌভাগ্য-ক্রমে পূর্ণ একদিন তাঁর সান্নিধ্যে তাঁর পল্লীর বাসভূমিতে কাটাবার পরম সৌভাগ্য হয়েছিল প্রথম দর্শনে যেমন প্রেম হয় তেমন একদিনের সান্নিধ্যে তাঁর চরিত্র মাধুর্যে অভিভূত হয়েছিলাম।

১৯৬৪ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের এক স্মরণীয় দিন। ঐ দিন বাংলার তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিককে তাঁর নিজ বাসভবনে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন ও তাঁকে আজীবন মাননীয় সভ্য হিসাবে মানপত্র অর্পণ আমাদের কর্মসূচীর প্রধান অঙ্গ ছিল। বহুদিন থেকে বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের বিভিন্ন কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল তা কার্যকর করতে বিশেষ বিলম্ব হচ্ছিল, কর্ম-কর্তাদের মিলিত প্রচেষ্টার অভাবে।

৭ই জুলাই 'ভারতবর্ষ' অফিসে গিয়ে স্থির হ'ল কবি কুমুদরঞ্জনের বাসভবনে যাওয়া যাবে শীঘ্রই এক রবিবার। ফণীদার (ভারতবর্ষ সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) বহু জনের সঙ্গে বহু সূত্রে পরিচয়। ফণীদাই লিখেছিলেন কবি কুমুদরঞ্জনকে যে আমরা জনা ছয়েক কলকাতা থেকে তাঁর পল্লী নিকেতনে ১৩ই সেপ্টেম্বর যাব। সেই সঙ্গে কুমুদরঞ্জনের যে পুত্র ব্যারাকপুর মহকুমার হাকিম তাঁর কাছেও এ সংবাদ পাঠালেন। আমিও আমার অনুজকে লিখেছিলাম ঐদিন আসানসোল থেকে বেলা দশটা নাগাদ গাড়ি নিয়ে হাজির থাকতে বর্দ্ধমান রেল ষ্টেশনে। আত্মজকেও বলেছিলাম তুমিও বর্দ্ধমানে রাখা গাড়ি যেন ঐ সময় বর্দ্ধমান ষ্টেশনে হাজির করো। কলকাতা থেকে ইলেকট্রিক ট্রেনে

বর্ধমান যাওয়া নিরাপদ ও তাতে সময় অনেক কম লাগে। যাত্রীদলে থাকার কথা ডঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সুরেন নিয়োগী এবং আরও কয়েকজন ও আমি। ফণীদার আগরপাড়ার বাড়ি থেকে অত ভোরে হাওড়ায় ট্রেন ধরা সম্ভব নয়, তাই তিনি আমাদের হাওড়ার বাড়িতে রাত্রি যাপন ক'রে ভোরে আমাদের সঙ্গে হাওড়া ষ্টেশনে যাবেন, স্থির হল।

আগের শুক্রবার টেলিফোনে ফণীদাকে বললাম—ফণীদা, বসিরহাটে আমার ভায়ের বাসায় যখন গিয়েছিলেন তখন গামছা দিয়ে পুঁটুলি বেঁধে নিয়ে এসেছিলেন। এবারও কি গামছা নিয়ে আসছেন? বোধ হয় ফণীদা এবার ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন, তাই রুক্ষ কণ্ঠে বললেন—কেন, আমি কি ধর্মশালায় যাচ্ছি?

—ঠিক বলেছেন। সত্যিই তো আপনি তো ধর্মশালায় যাচ্ছেন না, আমি লজ্জিত, আপনি নিশ্চয়ই সঙ্গে কিছু আনবেন না। আপনাকে শনিবার বৈকালে আমি নিজে গিয়ে অফিস থেকে তুলে নিয়ে আসব হাওড়ায়।

ভোরে 'বারাউনী প্যাসেঞ্জার' ধরতে যখন আমরা হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছলাম তখন সংখ্যা দাঁড়িয়েছে পাঁচে—ফণীদা, সুরেন নিয়োগী, ডাঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, সৌরানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও আমি। আমরা চলেছি পাঁচজনে। শারীরিক অসুস্থতার জন্য কবি কুমুদরঞ্জন কলকাতায় আসতে পারলেন না তাই তাঁরই গৃহ প্রাঙ্গনে হবে সম্বর্ধনা। মনে পড়ে কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার মরিস্ গয়ার এসেছিলেন 'অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে'র প্রতিনিধি হয়ে শান্তিনিকেতনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে এক বিশেষ স্থানীয় অনুষ্ঠানে অক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডি লিট্' উপাধিতে ভূষিত করতে। মনে পড়ে প্রাচীন উক্তি 'যদি মহম্মদ যেতে না পারে—পাহাড়ের কাছে, পাহাড় আসবে মহম্মদের কাছে।'

ফণী-দা হলেন গল্পের ঝুলি। সমকালীন মানব জীবন থেকে নানাতথ্য পরিবেশনে, নানা লোকের নাড়ীর খবর প্রকাশনে তিনি অদ্বিতীয়। এখন কুমুদরঞ্জনের কাছে যাচ্ছি। তাই কুমুদরঞ্জনের কোন ছেলে কোথায় কাজ করেন, কার কোথায় বিয়ে হয়েছে, কার শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে কি বিপুল সমাদর পেয়েছিলেন তিনি, ছেলেরা কে কোথায় থাকে। সেই সূত্রে অন্যান্য মানী-গুণীদের ভালো মন্দ সকল কথা ক্রমশঃ প্রকাশ করতে করতে আমরা চললাম্। ফণীদাকে বলা যেতে পারে তিনি একটি পারিবারিক কুলপঞ্জীর জীবন্ত কোষকার। ধর্মস্থলে পাণ্ডাদের মতো কতকটা। পাণ্ডারা অতীত কুলপঞ্জীর ধারক কিন্তু ফণীদা হলেন জীবন কথার চলন্ত অভিধান। গাড়িতে কথা হ'ল—আমরা যখন যাচ্ছি কুমুদরঞ্জনের কাছে তখন তাঁকে বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের তরফ থেকে একটা উপাধি দেওয়া যায় কিনা?—যেমন 'কবিরঞ্জন' 'কবীশ', 'কবীশ্বর', 'কাব্যকুমুদ', 'কবিকঙ্কণ', 'কবিসূর্য', 'কবিচূড়ামণি', 'কবিরত্ন' প্রভৃতি।

এমনি আলাপ-আলোচনায় পৌঁছে গেলাম বর্ধমান রেল ষ্টেশনে। আমরা রিফ্রেশমেন্ট রুমে 'চা' পান করতে বসেছি এমন সময় ভায়া আসানসোল থেকে

'জীপ' নিয়ে এসে হাজির। ষ্টেশন থেকে পুত্র চলে গেল বর্ধমানে তাদের গাড়ি আনতে। আমার ভাইঝি 'স্নিগ্ধা', সব সময়ে আমার অনুচর, সেও এবার আসে নি তার বাপের সঙ্গে। মোট সংখ্যা দাঁড়ালো ছ'জন। কি করা যায়। এই ছ'জন লোকের জন্য দুটো, না একটা জীপ যাবে? যদিও চালক আছে পুত্রের আনা জীপে। মনে হ'ল কেন অন্নপূর্ণা ভাদুড়ীকে নিয়ে আসা হ'ল না। 'বিচার' সম্পাদক প্রফুল্ল দাশগুপ্তকে বললে তিনিও আমাদের সঙ্গে হাওড়া থেকে আসতেন। যাই হ'ক স্থির হ'ল দুটো জীপই যাক—কেন না প্রথম যদি একটা খারাপ হয় তো আমরা অন্যটায় ঠাসাঠাসি ক'রে চ'লে আসতে পারব।

আগের দিন মুখ্য বাস্তুকরের (সড়ক নির্মাণ) ব্যক্তিগত সহায়ক পথের বিশদ বিবরণ জানিয়ে দিয়েছিলেন। ভায়া তো এ অঞ্চলের পথের পরিচয় ভালোই জানে। দুখানি জীপে আমরা আরাম ক'রে বসলাম—একটির চালক ভ্রাতা ও অপরটির পুত্র। নির্দিষ্ট চালক পিছনে। বর্ধমান ষ্টেশনের কাছে রেল সেতু পার হয়ে বর্ধমান-কাটোয়া রাস্তা ধরে চলতে লাগলাম। সহর ও সহরতলী ভাব কাটিয়ে রাস্তার ধারের চা ও পান বিড়ির দোকান ছাড়িয়ে পীচে মোড়া রাস্তা ধান ক্ষেতের বুক চিরে চলেছে। সেইপথে জীপ জোড়া লাগলো। বর্ধমান থেকে 'বলগণা' এসে বাঁ দিক ঘুরে বলগণা-গুস্‌করা রাস্তা ধরে বেশ খানিকক্ষণ চলার পর মুরাতিপুর এলাম। মুরাতিপুর থেকে ডান দিকে বেশ কয়েক মাইল চলার পর এলাম 'নতুন হাট'। 'নতুন হাট' থেকে কুনুর' নদী নৌকোতে পার হলেই 'কোগ্রাম' বা 'উজানী'। বর্ধমান-কাটোয়া রাস্তায় গাড়ির গতির বেগ ঘণ্টায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ মাইল। মোট পথ তিরিশ মাইলের কিছু বেশি। বলগণা-গুশকরা রাস্তা বেশ ভালো নয়। মুরাতিপুর থেকে রাস্তাটির পীচ উঠে গেছে; মেরামতের ব্যবস্থা হচ্ছে। পথের দুপাশে পাথর ফেলা। সবুজ ধানে মাঠ ভরে গেছে। মাঠের সবুজের শেষ হয়েছে দিকচক্রবালে আকাশের অসীম নীলে। সামনে খেত চিরে চলে গেছে সঁাথির মতো সোজা কালো পথ।

নদী থেকে প্রায় ফার্লিং দুই দূরে গাছের তলায় জীপ দুটো রাখতে হ'ল কেন না সামনে এক বিরাট দঁক। কবি এ পারে লোক পাঠিয়েছেন মাদ্রাসায় পড়া বামুনের ছেলে মঙ্গল মুখুজ্জেকে। আমাদের সঙ্গে আনা টুকিটাকি জিনিস সেই ব'য়ে নিয়ে এল কুনুর নদীর পারে। তাকে নাম ধ'রে ডাকলেই সে তৎক্ষণাৎ বলবে—'আজ্ঞে, বেশ।'

প্রায় দু ফার্লিং পথ হেঁটে খেয়ায় কুনুর নদী পার হয়ে সামান্য গেলেই দেখা গেল দূরে কবি কুমুদরঞ্জনের বসতবাটী। এক পুত্র পার ঘাটায় এসেছিলেন। সামনেই কুনুর নদী অজয় নদীর সঙ্গে মিশেছে। লাল ঘোলা জল বেগে ব'য়ে চলেছে। পাড় ধ্বসছে। কয়েক বছর আগে বিরাট বন্যায় নদীর পথ পরিবর্তন

হয়েছিল। এখন প্রায় কবির বাড়ির কাছে এসে গেছে। আমাদের সাদর আহ্বান জানাবার জন্য কবি স্বয়ং বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন গলায় মিহি তুলসীর মালা—দীর্ঘ ঋজু দেহ, গায়ে গেঞ্জি, পায়ে চটি। আজ বিরাশি বছর বয়স হয়ে গেছে তবু দীর্ঘ দেহ বিন্দুমাত্র কুব্জ হয় নি। মাথায় হালকা কাঁচা-পাকা চুল। মুখে হাসি লেগেই আছে।

সকলেই প্রণাম জানালো তাঁর পায়ে। সঙ্গে দুটি মানপত্র। অত ভোরে যুঁইফুলের মোটা মালা কলেজ স্ট্রীট মার্কেট থেকে কিনে আনা হয়েছিল। একটি আজীবন সভ্যের মানপত্র। আরেকটিতে কবি কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত কবি কুমুদরঞ্জনের প্রশস্তি লিখে নিয়ে গিয়েছিলেন। আর সেই সঙ্গে আনা হয়েছে সুন্দর একগাছি লাঠি ও সিল্কের নামাবলী। গলায় যুঁইয়ের মালা পরিয়ে দিলেন শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। আজীবন সভ্যের অভিনন্দন পাঠ করলেন তার আবেগময় ভাবগম্ভীর কণ্ঠে আমার ভায়া। ভক্তিভাবে তার পাঠের পর কালী কিঙ্কর বাবু তাঁর ফ্রেমে বাঁধানো স্বরচিত কবিতা পাঠ করলেন ও কবিবরের হাতে দিলেন। গেঞ্জির উপর মালা পরা ছবি তোলার প্রস্তাবে আমি ঘোরতর আপত্তি করলাম। এ যেন রাজ্যপাল হরেন মুখুজ্জের রাজ্যপালের ভবনে হুঁকো খাওয়ার মতো। কবিবর এ কথায় সায় দিয়ে তিনি সহজেই এ সমস্যার সমাধান করে দিলেন আমাদের দেওয়া নামাবলিটি গায়ে জড়িয়ে ও লাঠিটি হাতে নিয়ে। তার উপর মালা দুলিয়ে দেওয়া হ'ল। সঙ্গে করে নিয়ে-যাওয়া আমার লেখা 'সুর ও সুরভি' ও 'প্রয়োগ বিজ্ঞান কথা' তাঁর হাতে উপহার দিলাম। তাঁকে বাইরের সিঁড়িতে দাঁড়াতে বলায় বাধ্য সুবোধ বালকের মতো কোনো ওজর আপত্তি না ক'রে দাঁড়ালেন।

ফটোতোলা সমাপনান্তে বিরাট জলযোগের ব্যবস্থা।—শরের তৈরি সন্দেশ, রসগোল্লা, নারকেলের নাড়ু, বিস্কুট ও চা এল। আহারাদির পর আমার মনের মধ্যে যে প্রশ্নটি নিয়ত নাড়া দিচ্ছিল সেটি করলাম্।

—আপনার ঐ 'মাঝি তরী হেথা বেঁধো নাকো আজকের এই সাঁঝে।' গানটি যা রবীন্দ্রনাথকেও উৎসুক পাঠকের প্রশ্নে বিব্রত করতো প্রাচীনকালে 'তাঁর ঐ গানটি লেখা কিনা', সেটি কি আপনার সম্পূর্ণ কবিকল্পনা প্রসূত না সত্যের অনুভূতিতে এর ভিত্তি আছে?

—না, না। সম্পূর্ণ কল্পনা নয়। বাস্তবিকতার স্পর্শ রয়েছে। তা হ'ল এই, একদিন সন্ধ্যেবেলায় আমি ও আমার বন্ধু নৌকো ক'রে নদীর ধারে ধারে যাচ্ছিলাম শ্মশানের কাছে আসতে সে বললে—'আর যাস্‌নে, আজ আর যাবো না, ফিরে চল্।' আমি বললাম—'কেন কি হ'ল?' সে বললে—'নাঃ নাঃ তুই ফিরে চল্।' আমি তাকে জিগ্যেস্ করলাম—'ব্যাপারখানা কি খুলে বল।' সে তখন তার প্রিয়তমার মৃত্যুকাহিনী ও নদীর ধারে এই শ্মশানে তাকে দাহ করার ইতিবৃত্ত আমায় বলল। সে কাহিনী আমার তরুণ প্রাণে গভীর

মর্মবেদনার নিবিড় অনুভূতিতে তা আমি গ্রহণ করেছিলাম। তার পরই ঐ কবিতাটি লেখা।'

—আমরা ঐ গান শ্রীমতী ইন্দুবালার কণ্ঠে গ্রামোফোন রেকর্ডে প্রথম শুনি। সে প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে। আচ্ছা, বলুনতো এ পর্যন্ত আপনি কত কবিতা লিখেছেন?

—তার তো হিসেব রাখি নি। কতকগুলো বইয়ে ছাপা হয়েছে, কতক মাসিক পত্রে, কতক সাপ্তাহিকে, দৈনিকেও হয়েছে। তবে এখনও সব বইয়ে ছাপা হয় নি।

—সেগুলো কি যত্ন ক'রে রাখা আছে?

—কৈ, তাতো নেই।

—আন্দাজ ক'রে একটা বলুন কতগুলো হবে?

—হাজার চব্বিশ পঁচিশ হবে।

—তা হলে আপনি রবীন্দ্রনাথকে ছাড়িয়ে গেছেন। এ কথা শুনে কবি যেন চমকে উঠলেন ও সবিনয়ে বললেন—না, না, ওঁকে। হতে পারে না—

আমি গাণিতিক হিসেব দিচ্ছি। সত্য যে পৃথিবীতে যত কবি বা লেখক জন্মেছেন তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি লেখা তো রবীন্দ্রনাথেরই বেরিয়েছে। অপ্রকাশিত কিছুই রয় নি। বিশ্বভারতী প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর সাতাশ খণ্ড ও অপ্রচলিত রচনা দুখণ্ড মিলিয়ে ছাপা পাতার সংখ্যা হ'ল ১৬,৭৮০। হাতের লেখা ফুলস্কেপ পাতায় তার ডবল হবে। এতো গেল বাংলা রচনা; তা ছাড়া বহু ইংরিজি রচনাও আছে। ওঁর গান হ'ল প্রায় আড়াই হাজার (২২৮০) ও রবীন্দ্র-রচনাবলীতে প্রকাশিত কবিতা (৩৫৬৯) শুদ্ধ মিলিয়ে ছ হাজারের বেশি হবে না। অতএব আপনি সংখ্যায় ওঁর চেয়ে প্রগতিশীল। আপনার গুণের কথা আপনার সামনে না বলাই ভালো।

এ প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে প্রশ্ন করলাম—এবার পূজোয় কতগুলো কবিতা লিখলেন!

—গোটা বাটেক পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুরেন, তোমারটা এখনও সংহতির জন্যে লেখা হয় নি। দু' এক দিনের মধ্যেই পাঠিয়ে দেবো।

আমি বললাম—দিন না এখুনি একটা লিখে। আমরা সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাই।

—তোমরা এসেছ আমার কাছে। আর আমি তোমাদের ছেড়ে দিয়ে কবিতা লিখতে বসবো! এ হয় না। বরং আমি পাঠিয়ে দেবো খুব তাড়াতাড়ি।

সুরেনবাবু বললেন—তা হলেই চলবে। বরং আপনি আপনার জীবনের পুরোনো কথা বলুন।

আমি প্রশ্ন করলাম—কবে আপনি কবিতা লেখা শুরু করেন?

—আমার বয়স তখন তেরো।

—সহরে আপনার কৃতী পুত্রেরা রয়েছেন, সেখানে থাকেন না কেন ?

—আমার গাঁয়েই ভালো লাগে। তবে তেরো বছর বয়সে সহরে যাই। সেখানে চোদ্দ বছর ছিলাম। তার পর মহারাজ মনীন্দ্র নন্দীর স্কুলে অধ্যাপনা শুরু করি ও সেখানেই কাজ শেষ করি। বদলাবদলি, ছোটাছুটি নেই। আমার গাঁয়েই ভালো লাগে।

—কবিশেখর কালিদাস রায়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল তিনি সহরে থাকতেই বেশি পছন্দ করেন বললেন।

—কিন্তু আমার গাঁয়েই ভালো লাগে। এই কোগ্রাম এরই নাম উজানী। কালিদাসের উজ্জয়িনী থেকেই এর নাম। উজ্জয়িনীতে যেমন মহাকালের মন্দির আছে তেমনি এখানেও কপিলাশ্বর মহাদেবের মন্দির। এই উজানিতেই দক্ষযজ্ঞে মৃত সতীদেহের বিষ্ণুচক্রে ছিন্ন দক্ষিণ কফোনি (কনুই) পড়েছিল এখানে। দেবী ওখানে মঙ্গলচণ্ডী ও ভৈরব কপিলেশ্বর। এখানেই কবি 'নীল লোহিত' শিবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। অধুনা পাকা মন্দিরের এক পাশে নদীগর্ভ হতে সংগৃহীত পাথরের তিনটি নারায়ণ মূর্তি সযত্নে রক্ষিত আছে। শাক্তপীঠ ছাড়াও আপন ভিটেতে মাটির ঘরে থাকতেন যেমন বিশ্বকবি 'শ্যামলী' তৈরি করে নিয়েছিলেন। সেবার অজয়ের বানে যখন ভিটে মাটি ধুয়ে মুছে সব শেষ হয়ে যায় তখন এই একতলা পাকাবাড়ি পুত্রদের প্রচেষ্টায় তৈরি করান। সামনেই এক বসবার ঘর। সেই ঘর পার হলেই তাঁর শোবার ঘর। বিরাট একটি খাট পাতা ও পাশেই একটি ক্যাম্প খাট। সেখানেই তিনি দুপুরে বিশ্রাম করেন। পাশেই কাঠের র‍্যাক। তাতে অজস্র মাসিক ও সাপ্তাহিক গাদা মারা। আর আছে একখানি কাঠের চেয়ার ও একখানি ইজিচেয়ার। ঘর থেকে বেরুলেই চালা বারান্দা। পূবদুয়ারী দুখানি ঘর ও দক্ষিণ দুয়ারীও খান দুই। রান্নার ব্যবস্থা সামনের চালায়। বাড়ির মেঝে মাটি থেকে আড়াই হাত উঁচু। তবুও সেবার যখন ড্যামের জল ছাড়ে ঐ পাকা ঘরের মেঝেতেও জল উঠেছিল। জলে বহু বই, জিনিসপত্র নষ্ট হয়ে যায়। মেঝে বসে যায়। সে সব স্মৃতি বর্ণনা দেবার সময়ও সদা প্রফুল্ল আনন। সামনেই স্কুল বাড়ি ও নলকূপ। সিঁড়ির সামনে শশা ও নধর কুমড়ো লতা। পেঁপে গাছে অজস্র পেঁপে ধরেছে। লিলি ফুলের এখনও কুঁড়ি আসে নি। বেড়ার বাইরের বিরাট তেঁতুল গাছটি অতন্দ্র প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে। তার কোল দিয়ে রাস্তা। রাস্তাপার একটা মাটির ঢিপি। আর একটু এগুলেই খরস্রোতা অজয়।

—দেখুন, আপনার 'মাঝি, তরী হেথা' বিরহের এক অবিস্মরণীয় রচনা। আপনার দীর্ঘ জীবনের মধ্যে বহু হাসিকান্না দেখেছেন। বহু পরিচিতদের মৃত্যুতে তাঁদের স্মরণে আপনি কতগুলি কবিতা লিখেছেন। তাঁদের স্মরণে কি কালিদাস রায় বা নজরুল ইসলামের মতো কবিতা পুস্তক লিখেছিলেন ?

—মানুষের স্মরণে লিখেছি সত্য কিন্তু আমি 'সোমনাথের' উপর একশো আটটি কবিতা লিখেছি। তার পঞ্চাশটি কবিতা এখনও প্রকাশিত হয় নি। কেন জানি না শৈশবে যখন সুলতান মামুদের সোমনাথের মন্দির লুন্ঠন ও দেবতার অপমানের কাহিনী পড়ি তখন অন্তরে গভীর বেদনা অনুভব করি।

—আপনি কি বর্তমানের সোমনাথের মন্দির দেখেছেন?

—না।

—না দেখেই এত কবিতা। দেখলে কিনা হ'ত। আমি প্রায় বছর খানেক আগে বোম্বাই থেকে জাহাজে 'ভেরোয়াল' হয়ে সোমনাথে যাই। তিরিশ চল্লিশ মাইল দূর থেকে সোমনাথের নবনির্মিত মন্দিরের অচলকেতন দেখে হৃদয় অভিভূত হয়েছিল। প্রাচীন ভিত্তির উপর এই মহাদেব মন্দির রচিত হয়, উপপ্রধান মন্ত্রী বল্লভ ভাই প্যাটেলের প্রচেষ্টায়। তা না হলে এটি সম্ভব হ'ত না। ভারতের পরাধীনতার সূত্রপাত এই খানেই। বর্তমান মন্দির প্রাচীন মন্দিরের চেয়ে মজবুত উপাদানে প্রস্তুত ও উচ্চতায় আরও বেশি।

ভিতরের রোয়াকের সিঁড়িতে বসে সবাই মিলে কয়েকটি ছবি নেওয়া হ'ল। প্রথমে আমি ফটোগ্রাফার; তার পর আমার ভাই সৌরানন্দ।

এবার এল বিরাট মধ্যাহ্ন ভোজন পর্ব। যেখানে সরষের তেল পাওয়া যায় না, চাল পাওয়া যায় না, মাছ পাওয়া যায় না সেখানে কবি প্রত্যেকের জন্য একটি করে মাছের মুড়োর বন্দোবস্ত করেছেন। রান্না বর্ধমান জেলার পদ্ধতিতে, কচুর তরকারি, মোচার তরকারি, বেসনে ডোবানো বেগুনী ভাজা যা বর্ধমানে 'তিল পিটিলি' ব'লে, কলায়ের ডাল, মাছের টক, শুধু পোস্তর চড়চড়ি হয় নি। তা ছাড়া প্রত্যেকের পাতে মাছের তরকারি। রান্না অপূর্ব, মুখে যেন অমৃত সমান। অতি তৃপ্তির সঙ্গে সকলে ঘণ্টাখানেক ধ'রে আহারাদি পর্ব সারলো। নিরামিষাশীদেরও কোনো অসুবিধে নেই—দই, পায়েস, রসগোল্লা, নারকেল নাড়ু ইত্যাদি। মৎসাশীরাও মিষ্টান্ন পেলেন। এই দুষ্প্রাপ্যতার বাজারে কেমন ক'রে এ সম্ভব হল? শুধু ঐকান্তিকতা, নিষ্ঠা, প্রীতি ও স্নেহের বিনিময়ে। খেতে বসিয়ে বারম্বার অনুরোধ। চাল রাঢ়ভূমির মোটা কাঁকুরে লাল চাল নয়—মিহি পুরোনো বাঁকতুলসী কি গোবিন্দভোগ হবে। শুভ্র, সুবাসিত যেন যুঁই ফুলের মতো জড়ো হয়েছে।

আহার পর্বের পর তাম্বুল গ্রহণ ক'রে পুনরায় কবির শয়নকক্ষে প্রবেশ করলাম। সকলে প্রায় বিশ্রাম নিতে শুয়ে পড়ল। কালীকিঙ্করবাবু একটি চেয়ারে, আমি ইজিচেয়ারে। কালীকিঙ্কর বাবু কবিবরের পুরাতন কবিতা থেকে সুন্দর সুন্দর পদগুলি আবৃত্তি করতে লাগলেন। বয়স হলে শুনেছি স্মরণশক্তি কমে যায় কিন্তু অশীতিপর কালীকিঙ্করবাবু এর ব্যতিক্রম। কবির ক্ষণে ক্ষণে অতীত দিনের স্মৃতি থেকে থেকে মনে পড়তে লাগলো। কয়েকটি ছত্রের কথা তাঁর আজ স্মরণে নেই। নিজের রচনার প্রতি রচয়িতার যে অপত্য

স্নেহ থাকে তা থেকে তিনি যেন মোহমুক্ত হচ্ছেন। পার্থিব মায়ার আকর্ষণ থেকে নিজেকে ছিন্ন ক'রে ফেলছেন। রচনা করা ছিল তাঁর কাজ, সে কাজ তাঁর হয়ে গেছে আর তার প্রতি তাঁর আকর্ষণ নেই। তিনি যে নিষ্কাম কর্মযোগী। যশোপ্রার্থী হওয়ার মোহ থেকে তিনি নিরাসক্ত হয়েছেন। তাই প্রতি বাচনভঙ্গিতে তার রয়েছে বৈষ্ণব সুলভ বিনম্র প্রকাশ তেমনি প্রতি কাজের মাঝেও রয়েছে বৈষ্ণবজনোচিত দীনতা।

আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম—আপনি তো কয়েক হাজার কবিতা লিখেছেন; বহু কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন কিন্তু কোনো মহাকাব্য কি লিখেছেন?

—মহাকাব্য লেখার যোগ্যতা কই?

—এটা আপনার বিনয়। রবীন্দ্রনাথও লেখেন নি সত্য। নবীনচন্দ্র সেনের পর থেকেই ওর গতি স্তব্ধ হয়েছে কিন্তু বর্তমানে থান ইটের মাপে মহা-উপন্যাসের মতো মহাকাব্য রচনায় প্রচেষ্টা চলেছে।

—তাঁরা মহাকবি নিশ্চয়।

—এখনও হন নি, হবার বাসনা মনে নিশ্চয় রাখেন। তবে এখন যিনি মহাকবির ভ্রুণদশায় আছেন তিনি হলেন কালীপদ ভট্টাচার্য।

—এই আলোচনায় তাঁর সজনীকান্ত দাস, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির কথা আলোচনা হ'ল। তিনি বারবার মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়ের লেখা তিন খণ্ড 'সদালাপ' নামে বইটির ভূয়সী প্রশংসা করলেন। তিনি তার কয়েক খণ্ড পাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন ফণীদার কাছে, যদি গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের কাছে পড়ে থাকে।

একদিনের পরিচয়ে তাঁর এত ঘনিষ্ঠ হয়েছিলাম তা উত্তরোত্তর পত্র বিনিময়ে ঘনিষ্ঠতর হয়। সেদিন আমার বাড়ির ঠিকানা দেবার প্রয়োজন হয় নি। কিন্তু আমার লেখা আনন্দ পাবলিশার্স প্রকাশিত 'সুর ও সুরভি' প'ড়ে তিনি লিখলেন ফণীন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে ও সুরেন নিয়োগীকে ১৬।৯।৭৪ তারিখে কোগ্রাম থেকে—

প্রিয়বরেষু ভাই সুরেন, সুধানন্দবাবুর 'সুর ও সুরভি' পড়ে বড়ই ভালো লাগলো। লোকটি তো প্রকৃত কবি এবং স্নিগ্ধ সদয়হৃদয় লোক। তাঁর পিতা, ভগ্নী ও অন্যান্য পরিবারবর্গের প্রতি কি ভক্তি, কি প্রীতি, কি স্নেহ। একজন প্রকৃত হৃদয়বান মানুষ। আমার ভালো করিয়া আলাপ করা হয় নাই, এখন মনে করিতেছি। তাঁর ঠিকানা জানিনে। ফণীন্দ্র'কে পত্র দিয়াছি, তাহাতে আমার অভিমত জানাইয়াছি তুমি সুধানন্দবাবুর ঠিকানা দিবে। তোমার কবিতা আগেই পাঠাইয়াছি পূজাসংখ্যার জন্য, বোধ হয় পাইয়াছ। তোমরা আসায় বড় আনন্দিত হইয়াছি। ইতি শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

বাড়িতে ফিরে এসে ঐ ১৬ই সেপ্টেম্বর ইংরিজিতে তাঁকে একটি পত্র দি, কেন না সহজে টাইপ ক'রে পাঠানো সম্ভব। তিনিও ইংরিজিতে তার জবাব

দেন। এইটিই আমাদের প্রথম ও শেষ ইংরিজিতে চিঠি। পরে বহু চিঠি শুধু বাংলাতেই লেখা হয়।

Kogram, Nutunhat
Burdwan
22. 9 64

My dear Sudhananda Babu,

I am immensely thankful and greatful to you for your very kind letter of the 16th instant and for the nice things you have said about me.

I have already written a letter to you to the address of Phanindra Babu as I did not know your present address. Your book I read with great interest and liked it much. You have got my remarks I presume.

The 13th September is the pleasantest day I spent with you all. I shall bear in memory the sweet day for a long long time, Your poems I appreciate and love. Within a short compass you have given an distinct but exquisite description of your home life. I enjoyed it much. You belong to a শুচি সুন্দর পরিবার and you are 'true to the kindred points of heaven and home'

Yours affectionately,
Kumudranjan Mullick

পরে তাঁকে এক পত্রের মধ্যে একটি সনেট লিখে পাঠাই দক্ষিণেশ্বর ২০।১১।৬৪—

কুমুদ রঞ্জন করে অলিদের মন।
কুমুদ রঞ্জন করে কবিদের মন।
কুমুদরঞ্জন কবি তোষে জনমন।
কুলভাঙা অজয়ের কূলে উন্মন।
জয়দেব কবি এই অজয়ের কূলে
কেঁদুলির কোলে ব'সে হৃদি মন খুলে
রচিলেন গীতগোবিন্দের প্রেমগীতি।
'বাঙালী ভুলিয়াছিল সে মোহন বাঁশি ;
বহু যুগ পরে তারে তুলে নিলে আসি।'
আবার বাজালে পুন প্রভাত বেলায়
ভাবের লহরী উঠে বালুকা বেলায়।
দুই বাংলার তুমি সর্বজ্যেষ্ঠ কবি
প্রেম প্রীতি করুণার অপরূপ ছবি।

এর পর বহু পত্র বিনিময় হয় তার সব কথা বলা সম্ভব নয়। কবি কুমুদরঞ্জন শুধু বড় কবি নন, অতি বড় দরদী মানুষ যা বর্তমান জগতে সুদুর্লভ।

'মাঝি, তরী হেথা বাঁধবোনাকো আজকে সাঁঝে'

সন্তোষকুমার দে

বাংলার গাছ পালা, নদীপ্রান্তর, দেবদেবী, পল্লীপ্রকৃতির কোলে লালিত সাধারণ মানুষের সুখদুঃখ হাসি কান্নার অকৃত্রিম রূপটি যাঁর লেখনীতে সহজ সুরে কথা বলে ষাট বছরেরও অধিককাল আপামর জনসাধারণ সকল বাঙালীর মনে সুগভীর শ্রদ্ধার আসন অধিকার করেছিল, সেই কুমুদরঞ্জন মল্লিক আর ইহজগতে নেই। তিনি ছিলেন পরম বৈষ্ণব, ঈশ্বরানুরাগী, ভক্ত এবং নিবেদিত প্রাণ। তিনি সজ্ঞানে সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করেছেন, এ নিয়ে আমাদের দুঃখ করা উচিত হবে না, কেবল মনে হয়, কুমুদরঞ্জনের তিরোধানের সঙ্গে পল্লীবাংলার প্রকৃত কবির তিরোধান ঘটল।

বাংলা দেশের সাহিত্যিক গোষ্ঠীর মধ্যে এমন অজাতশত্রু মানুষ বোধ হয় একমাত্র কবি নরেন্দ্র দেব ব্যতীত আর কেউ নেই। তবে নরেনদা খাস কলকাতার মানুষ ছিলেন, শহরেই তাঁর জন্ম, শহরেই চিরকাল কাটালেন। কবিশেখর কালিদাস রায়কেই বরং কুমুদরঞ্জনের কাছাকাছি মানুষ মনে করা হয়ে থাকে। কিন্তু কবিশেখরও শহরের বাসিন্দা। কুমুদরঞ্জনও তাঁর কৃতী সন্তানদের কারো কাছে এই কলকাতাতেই থাকতে পারতেন, কিন্তু তিনি তাঁর অজয় নদীটির কোলে কোগ্রামের বাস্তুভিটা ত্যাগ করে নড়তে চান নি। ঐ ক্ষুদ্র গ্রামের সংকীর্ণ পরিধির মধ্যেই তিনি বিশালাত্মার প্রাসাদ লাভ করেছিলেন।

আমি যখন 'গায়ত্রী' মাসিক পত্র সম্পাদনা করতাম তখন কবি কুমুদরঞ্জন আমার পত্রিকায় অনেকবার কবিতা দিয়ে আমায় অনুগৃহীত করেছিলেন। তখন তাঁর সঙ্গে নিয়মিত পত্রলেখা চলত। কবিকঙ্কণ হেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে একটি সাহিত্যসভায় কবির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাত-পরিচয়ের সুযোগ ঘটে। সৌভাগ্যক্রমে সেই সভায় তিনিই ছিলেন সভাপতি এবং আমার আসনটি তাঁর অতি নিকটেই পড়েছিল।

সভা আরম্ভের পূর্বেই প্রণাম ও পরিচয় হয়ে গেল। তিনি বললেন—'গায়ত্রী' ছোট কাগজ হলেও চমৎকার সাহিত্যপত্র ছিল, বন্ধ করে দিলে কেন? এমন দরদের সঙ্গে সব সময় কথা বলতে লাগলেন যে আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম।

তখন দেশ বিভাগের ধাক্কা চলছে। আমি 'উদ্বাস্তু' শীর্ষক একটি দীর্ঘ কবিতা পড়লে কুমুদরঞ্জন নিজেই এমন অভিভূত হয়ে পড়লেন-যে আমি অত্যন্ত লজ্জিত বোধ করতে লাগলাম। তাঁর মতো উদার হৃদয় ব্যক্তির কাছে আমার কবিতা সমাদৃত হবে এত স্বাভাবিক। কিন্তু তিনি উদ্বাস্তুদের অসহায়তার কথাতেই বেশি কাতর হয়ে পড়েছিলেন।

ঐ সভায় একটি গায়িকা খুব দরদ দিয়ে গাইলে—'মাঝি, তরী হেথা বাঁধবো নাকো আজকে সাঁঝে।' এই গানটি তখন রেকর্ডে বেরিয়েছিল এবং খুব জনপ্রিয় হয়েছিল।

আমি কবিকে জিজ্ঞাসা করলাম—গানটি কেমন লাগল?

তিনি বললেন—চমৎকার। তুমি লিখেছ নিশ্চয়!

উদ্বাস্তুদের বেদনাময় চিত্র কবিতায় এঁকেছি বলে এই গানের বেদনার সুরও যে আমার সৃষ্টি এমন দাবি করব কোন্ অধিকারে। বললাম—আমি লিখব কেন?

তিনি বললেন—তবে কার লেখা? কান্ত কবির কি?

কান্তকবি রজনীকান্ত সেন দরদী গীতিকার ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু তাই বলে এটি তো তাঁর রচনা নয়।

আমি বললাম—এ গানটি একবার রেকর্ড হয়েছিল বিশ বাইশ বছর আগে। ইন্দুবালা গেয়েছিলেন তখন, এবার আবার নতুন করে রেকর্ড করা হয়েছে। এত আপনারই রচনা, আপনার কি মনে পড়ছে না?

কবি বললেন—আমার রচনা? তাই তো, পদগুলি যেন পরিচিত মনে হচ্ছিল বটে!

সভার শেষে কলকাতায় তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র তদানীন্তন প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্টেট শ্রীজ্যোৎস্নানাথ মল্লিক মহাশয়ের গৃহে যাবেন, আমায় বললেন—চলো আমার সঙ্গে। গেলাম। গাড়িতে বসেই বললেন—গানটির কথায় মনে পড়ল—একদিন নদীপথে যেতে যেতে নদীর তীরে একটি চিতা জ্বলতে দেখে নৌকায় বসেই ঐ কবিতাটি লিখেছিলাম। কবিতাটি দীর্ঘ, রেকর্ডে তার সামান্য অংশই গাওয়া হয়েছিল।

তিনি আরও বললেন, তখন দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বেঁচে ছিলেন। তিনি একটি বড় ধরনের সচিত্র মাসিক পত্রিকা বের করবেন স্থির করেন এবং কুমুদরঞ্জনের কাছে কবিতা চেয়ে চিঠি দেন। এই কবিতাটি কবি তাঁকেই পাঠিয়েছিলেন।

তার পর আকস্মিকভাবে দ্বিজেন্দ্রলাল মারা গেলেন। তাঁর মৃত্যুর কয়েকমাস পরে বেরুল 'ভারতবর্ষ' পত্রিকাটি। ভারতবর্ষের প্রথমবর্ষের কোনো একটি সংখ্যাতেই মনে হয় ঐ কবিতাটি ছাপা হয়েছিল এবং চোখ জুড়ানো চমৎকার কাগজখানি কবি যখন পেলেন, তার সঙ্গে পেলেন একটি মনিঅর্ডার—দশটাকার।

সে যুগে কবিতার জন্য কোনো কাগজ টাকা দিত না, ভারতবর্ষ কিন্তু তাঁকে টাকা পাঠালো এবং মানি অর্ডারের কুপনে লিখে জানালো, আরো কবিতা দিতে। সঙ্গে সঙ্গে অনুরোধ,—শুধু তাঁদের কাগজেই যেন তিনি কবিতা লেখেন, লিখলেই সম্মান দক্ষিণা তাঁরা দেবেন।

কুমুদরঞ্জন কখনও কবিতা বিক্রয় করেন নি এবং অন্য কোনও কাগজে লিখবেন না এমন সর্তে কোনও কাগজে লিখতেও সম্মত নন এই কথা জানিয়ে

সেই মানিঅর্ডার তিনি ফেরত দিলেন। পরে অবশ্য 'ভারতবর্ষ' কর্তৃপক্ষ তাঁদের ভুল বুঝতে পারেন এবং আবার অনুরোধ জানিয়ে ভারতবর্ষে তাঁর বহু কবিতা প্রকাশ করেছেন।

সেদিন কবির সঙ্গে তাঁর পুত্রের কলকাতার বাসস্থানে ফিরে তাঁকে আরও অন্তরঙ্গ ভাবে পেয়েছিলাম। ঘরোয়া পরিবেশে তিনি নগ্নপদে নগ্নগাত্রে গ্রামের মানুষটি সেজে যেন আরও সহজ, আরও শান্তস্নিগ্ধ এবং আনন্দময় মূর্তি পরিগ্রহ করলেন। গলায় কণ্ঠি, উন্মুক্ত বক্ষ, মুখে মধুর হাসিটি লেগেই আছে। অজয় নদীর তীরে কোগ্রামের বাসিন্দা স্বভাবের কবি, মানুষের কবি কুমুদরঞ্জন মুহূর্তে আপন সত্তায় ফিরে এসেছিলেন যেন।

কুমুদরঞ্জনের গদ্যরচনা বিরল বললেও অত্যুক্তি হয় না, কিন্তু সে রচনাও বেরিয়েছিল 'ভারতবর্ষ' পত্রিকাতেই। কয়েকটি প্রবন্ধে তিনি তাঁর গ্রামের কথা, গ্রামের প্রতিবেশীদের কথা, গাছপালার কথা এমন জীবন্ত ভাবে বলেছিলেন যাতে মনে হ'ত, তাঁর গাঁয়ের প্রত্যেকটি গাছকেও যেন পৃথক করে চেনেন, নিত্য তাদের কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন এবং তাদের সঙ্গে কবির গভীর নাড়ির টান আছে।

একবার অজয়ের বানে যখন তাঁর গ্রাম ডুবে গিয়েছিল তখনও কবি নিজের ভিটা ছেড়ে চলে যেতে রাজি হন নি। বস্তুত একটি দ্বীপের মতোই তাঁর গৃহটুকু জেগে ছিল, জল আবার নেবে গেল।

কবিশেখর কালিদাস রায়ের অসুস্থতার সংবাদে বিচলিত তিনি গাঁয়ের মন্দিরে পূজা দিয়ে তারই প্রসাদী ফুল বন্ধুর মঙ্গল কামনায় পাঠিয়েছিলেন কবিশেখরের কাছে সে কথাও আমরা শুনেছি।

আর যেবারে কলকাতা থেকে 'ভারতবর্ষ' সম্পাদক ফণীদার সঙ্গে কয়েকজন এবং 'সাহিত্যতীর্থে'র তরফ থেকে যেবার কয়েকজন সাহিত্যিক তাঁর গ্রামে গিয়েছিলেন, কবি তাঁদের যে কত আদর যত্ন করে নিজের গ্রাম দেখিয়েছিলেন তার কথাও শুনেছি। সাহিত্যিকদের সম্বর্ধনা জানাতে নদীর ঘাটে বাদ্যভাণ্ড উপস্থিত ছিল, গ্রামের পথে দেবদারু পাতার তোরণ উঠেছিল, কবির কুঞ্জে আনন্দের হাট বসেছিল।

কুমুদরঞ্জন ছিলেন পল্লীর কবি, মনে হয় তাঁর তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই এই বিশিষ্ট ধারাটিও নিঃশেষ হয়ে গেল।

প্রার্থনা করি

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বাঙালী একে একে সব কিছু হারিয়েছে, হারাচ্ছে। ব্যবসায় ক্ষেত্রে তার ঠাঁই নেই, দেশবিভাগের পরে স্বদেশেও তার স্থান নেই। তার উদরে অন্ন নেই, মুখে হাসি নেই। কিন্তু একটি জিনিস এখনও বাঙালীকে ছাড়ে নি—বঙ্গভূমি ভঙ্গ হয়েছে বটে, কিন্তু তার রঙ্গ অর্থাৎ রসবোধ গিয়েও যাচ্ছে না। এ জন্য আমরা বিধাতার নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

বাঙালীর এই রসবোধ প্রকাশ পাচ্ছে তার সাহিত্যে—গল্পে, উপন্যাসে, প্রবন্ধে আর কবিতায়। বাঙালীর জীবনের কাঁটাবনে এই একটি সুরভি ফুল—তার সাহিত্য।

এই সাহিত্যের ধারক আর বাহক যাঁরা—সেই সব কবি আর লেখক, ভগবানের আশীর্বাদের মতন এখনও আমাদের মধ্যে বিরাজ করছেন। এদের মধ্যে এখনও আমাদের মাঝে আছেন কবি শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক। কবিতায় যিনি এ যুগের বাঙালীর প্রাণের পরিচয় দিয়েছেন, সত্য সত্য যা দেখেছেন, তা মিষ্টি ভাষায় আমাদের শুনিয়েছেন—এই জন্য তিনি আমাদের এত প্রিয়। তাঁর বয়স এখন আশীর কাছাকাছি হল। তাঁর জাতির মানুষের অন্তরের কামনা আর প্রার্থনা, তিনি নীরোগ সুখী জীবনে শতবর্ষ বয়স পর্যন্ত আমাদের মধ্যে থাকুন, আর বঙ্গসরস্বতীর আরও সেবা করে নিজে ধন্য হন, বাঙালী জাতিকে আর ভারতকেও ধন্য করুন। ইতি ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭, ৫ জুন ১৯৬০।

কথাসাহিত্য কুমুদরঞ্জন মল্লিক সম্বর্ধনা সংখ্যায় প্রকাশিত

মাটির মানুষ

অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়

এই শহরের কয়েদখানায়
বসে বসে ভাবি তোমার কথা,
মাটির মানুষ, শোনো কি তুমি ?
বোবা কান্নায় কাঁদে যে নগরী,
পরবাস হল জন্মভূমি ;
সেই কান্না কি শুনেছ তুমি !
পাকা রাস্তায় পিচ গ'লে গ'লে
এখানে-ওখানে গলিত ক্ষত ,
এখানে বন্ধু নাই বা এলে !
পল্লীর পথ সেই তো ভালো,
অশথ বটের ছায়ায় ছায়ায়
অনেক স্বস্তি শান্তি মেলে ;
মাটির প্রদীপে মিষ্টি আলো ।
এখানে আকাশ সীমিত খণ্ড,
ওখানে অসীম অখণ্ডিত,
সহস্র চোখে যায় না ধরা ।
ওখানে বাতাস শুদ্ধ স্নিগ্ধ,
বুক ভ'রে নাও সে-অমৃত ;
এখানে ব্যাধির জীবাণুভরা ।
বনতুলসীর গন্ধ কোথায় ?
কোথায় পাখির কলকূজন ?
কুমুদ শোভিত সরসী কই ?
প্রাণের প্রবাহ শেষ হয়ে আসে,
মজে আসে তাই গঙ্গা নদী ;
ওখানে দীঘিতে জল অথৈ ।
এখানে মানুষ কলের পুতুল,
তৃষ্ণা মেটায় কলের জলে,
তাতে কি কখনো তৃপ্তি মেলে !
ওখানে মানুষ—আসল মানুষ,
তুমি কবি আছ তাদের দলে ;
এখানে বন্ধু নাই বা এলে !

অজয়ের কবি

নচিকেতা ভরদ্বাজ

বাংলার মাটির গন্ধ আসশ্যাওড়া—ভাঁটফুল
দোপাটি, বকুল
এখনো আশ্চর্য ফোটে তোমার উদ্যানে।
অজয়ের ঢেউগুলি আজো তারা বাউলে কীর্তনে
তোমার নিপুণ হাতে রূপময়, তুলসী মঞ্চের
শেষ দীপাবলী তুমি, ভাসিয়ে দিতেছ আজো লক্ষ উজানে।
গ্রাম-বাংলা বেঁচে আছে এখনো তোমার উচ্চারণে।
ভীরু বাংলার দীপ অপরূপ জ্যোতির্ময় হয়,
লক্ষ নিয়নের নীচে বাংলার স্থিরতম হৃদয়ের কথা,
স্নিগ্ধতম ছবিগুলি এখনো তোমার হাতে মুগ্ধ সজীবতা
ফিরে পায়; অজয়ের তীরে তীরে রূপমগ্ন রাত্রিদিন
এখনো বিস্ময়।
আমরা হারিয়ে গেছি সময়ের স্বভাবের হাতে।
আমাদের চারিদিকে আজ এত শাঠ্য-হিংসা-ভয়-ব্যথা
ষড়যন্ত্র, অসুখী মত্ততা
আমাদের গ্রাস করছে, ভুলে গেছি গ্রামীণ বাংলার
চিরন্তনী শান্ত আলো, শান্তি, সরলতা—এই শতাব্দীর ভয়াবহ রাতে।
কেবল তোমার কাছে ফিরে এলে অতীত ছায়ার
অবাক সংলাপগুলি শুনতে পাই: আল্পনা, নিকানো উঠান,
চাল ধোয়া স্নিগ্ধ হাত, নদীর নিবিড় কলতান.
মার কথা, মাকে মনে পড়ে।
কস্তাপাড় শাড়িটির লাল পাড় মায়ের পায়ের কাছে
এসে পড়িয়াছে,
নিটোল দুহাতে কলি, শান্ত শাঁখা, স্নেহ নম্র দু চোখে উষার
ধ্যানমগ্ন অপাবৃতি, 'ফুল্লকুসুমিত দ্রুমদল-শোভিত' প্রান্তরে
'পুলকিত যামিনীর' 'শুভ্র জ্যোৎস্না' স্বপ্ন হয়ে আছে!
আমরা যে মায়ের মুখ কতকাল দেখি না এখানে,
জন্ম-নির্বাসিত হয়ে আমরা আজ অন্য এক করুণ শ্মশানে
শূন্যতায় সমর্পিত: তবুও এখনো তুমি
চারণের মতো এক মরমিয়া সুরে
বুকের রুধিরে মাখা স্মৃতিময়ী স্বপ্নগুলি আমাদের বুকের ভিতরে

তুলে ধরছ কত যত্নে ; প্রত্যহের স্তরে
তবু যদি একবারও মাকে মনে পড়ে।
খঞ্জনী বাজাও তুমি, একতারা তুলে নাও বুকে,
স্মৃতির শান্তিজল বিপর্যস্ত আমাদের ক্লান্ত চোখে মুখে
ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাও, মৃত্যুর ওপারে থেকে তুমি
বাজাও নতুন করে এ প্রাণের নিহত ঝুমঝুমি।
বিদীর্ণ প্রান্তর জুড়ে ঝরে যাক অন্তিম মৌসুমী
দক্ষিণ সমুদ্রের থেকে
আমাদের অসহায় অস্বস্তির অসহ্য বিবেকে।

স্মরণে

পুষ্প দেবী

বেদ বেদান্ত ঘেঁটেছি জীবনভরে,
শাস্ত্রের কথা গেঁথেছি কাব্যফুলে,
অমর আত্মা মৃত্যু যে তার নাই—
এই কথা আজ বারে বারে যাই ভুলে।
দুনয়ন ভরে উথলি উঠেছে বারি
বক্ষের মাঝে শূন্যতা অনুভব,
হারানো মুখটি পড়ে বারে বারে মনে—
যা কিছু পূর্ণ আজকে শূন্য সব।
কতদিনকার কত কথা মনে পড়ে
হৃদয় ভরা যে শত স্মৃতি সম্ভার,
বলিবার নয় অকথিত এই ব্যথা
মনের মাঝেতে কি যে তার হাহাকার-
নিয়তির খেলা অমোঘ বিধান এ যে
প্রতি ঘরে ঘরে এই হারানোর বিধি,
তবু মনে হয় এ যেন কঠিন বেশি
হারাই যখন আপনার জন নিধি।
দয়াল শ্রীহরি নিয়েছেন কোলে তুলে—
এই ভেবে মনে সান্ত্বনা নাহি পাই ;
তবু বারে বারে সেই মুখখানি ভাসে
মনে পড়ে যায় এই ছিল এই নাই।

পল্লীর কবি

বেলা দেবী

জনাকীর্ণ সহরের কলকোলাহল
ট্রামবাসের মুখরতা,
পাঁচতলা বাড়ির ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে
নিওনের আলো,
ফুলদানিতে সাজানো রজনীগন্ধার গুচ্ছ
জিপ্‌সি আর ক্রিসেনথিমমে
এখানে এটাই মানায়।
কিন্তু কুমুদ ফুল—
সে ফুটে ওঠে সুধাক্ষরা চন্দ্রালোক তলে
চাঁদের আলোর স্পর্শে দল মেলে
চাঁদ ডুবে গেলে মুদে আসে চোখ
ফুলদানিতে মোটেই মানায় না তাকে
নিওনের আলোতেও নয়।
পল্লীর টলটলে নীল জলে ভরা
গভীর দীঘিতেই
কুমুদ ফুলের সুন্দর বিকাশ।

কবি কুমুদরঞ্জন—সার্থকনামা কবি
এখানে সহরের অশান্ত আবর্তে
মোটেই মানায় না তাকে
পল্লী প্রকৃতির স্নিগ্ধ পরিবেশে
'ভাঙনধরা অজয় নদের বাঁকে'
মেঠোপথ আর ধানক্ষেতে ভরা
ছোট্ট গাঁয়ের শান্ত ঘরটিতেই
তার স্নিগ্ধ এবং গৌরবময় প্রকাশ।
তাই—
সাহিত্যতীর্থের যাত্রী
কবি কুমুদরঞ্জন—সহরের কবি নয়
পল্লীর কবি॥

শ্রদ্ধেয় কুমুদরঞ্জন

নগেন্দ্রকুমার মিত্রমজুমদার

মানুষ বাঁচে কিম্বা মারা যায় তার
ক্রিয়া কার্য সকল কর্ম ধারায়
অমরতা অর্জ্জন করে তার
সুখ্যাতি দিয়ে।
নামে ও খ্যাতিতে প্রখ্যাত কবি
সশ্রদ্ধ কুমুদরঞ্জন মল্লিক
রেখে গেলেন তাঁর স্মরণীয় স্থিতি
বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রের কাব্যজগতে
সুদীর্ঘ অশিতিবর্ষ ধরে
মূল্যবান রচনায়।
আদর্শময় সৌন্দর্যের মনমুগ্ধ-অভিব্যক্তি
উদ্ভাবিত লালিত্যময়
সারগর্ভ বোধোদয়ের
রুচি-স্বাদ বর্ণনা-ভঙ্গির কারুকলায়
গ্রামীণ প্রাণবন্ত বিষয় প্রতিপাদ্যের
প্রকৃতি-জগৎ
প্রভাবিত করে যাহা বৃহত্তর জনগণকে।
শিক্ষায়তনের উন্নতি কল্পে
সামগ্রিক জীবনের পরিপূর্ণতায়
যাহার এই সুদীর্ঘ-কাল ধরিয়া
যথাযথ প্রয়োজন ছিল
সময় ও অভাবের তাগিদ পূরণে।
স্নিগ্ধতা সৌন্দর্যবোধ উজ্জ্বল পবিত্রতা
সহজাত সরল বর্ণনায়
মনোমত শব্দ-চয়নে
স্বকীয় নিষ্ঠা-সত্তায়
মানব ও প্রকৃতির মহানন্দের সহিত
আদর্শগত ভাবধারায় ফুটিয়ে তোলায়।
তিনি আর এই ইহজগতে নাই
কিন্তু তাঁর এই খ্যাতিবিশিষ্ট রচনাগুলি
তাঁর সেই কুমুদ নামটির

পদ্মের প্রতীক সাদৃশ্যের ন্যায়
প্রস্ফুটমান পদ্ম পাঁপড়ি দলের
প্রভূত সৌন্দর্যের মতো
স্মরণীয় স্মৃতি রেখে যাবে
সকল জাতির হৃদয়মন্দিরে
যতদিন থাকবে তাঁর রচনা অস্তিত্ব

কুমুদরঞ্জন মল্লিক স্মরণে

দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

তুমি নিজেই একটি নিটোল কবিতা—
অনুভূতির জগতে কম্পমান
আনন্দে উদ্বেলিত, বেদনায় ম্লান
সৌন্দর্যে অভিভূত, আশায় উদ্‌ভাসিত
একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ কবিতা।
যুগের জীবন-যন্ত্রণার বিদীর্ণ হাহাকার নেই
সে সরস সজীব কবিতায়।
নীলকণ্ঠের মতো পান করেছ জীবনের বিষ
এবং মুঠো মুঠো ছড়িয়েছ প্রাণের অমৃত।
সে অমৃত সঞ্জীবিত করলো আমাদের
সে অমৃত পান করবে গৌড়জন নিরবধি কালে।

লোকশ্রুতি, প্রকৃতি-প্রিয় তুমি
প্রকৃতি তাই ধরা দিলো অনাবৃত রূপে
তোমার কবিতার স্তরে স্তরে।
আসলে উল্টোটাই সত্য—
প্রকৃতিই ভালোবাসতো তোমাকে
কনিষ্ঠ সন্তানের মতো,
মাতৃস্তন্য দিয়ে লালন করেছে
এবং তোমার লেখনী দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করেছে
বিচিত্র রূপে।
নদ-নদী বিধৌত শ্যামল প্রকৃতি
ধানের ক্ষেতে ঢেউ খেলানো রূপসী বাংলা

পাখির কলগান গুঞ্জিত আরণ্যক পরিবেশ,
লাঙ্গল-কাঁধে চাষী, নোলক-পরা চাষী বৌ
আদুল গায়ে নেংটো ছেলে, রাখালের প্রাণ মাতানো বাঁশি
আষাঢ়ের ধারাস্নান, বসন্তের মুঞ্জরিত তরু—
তোমার চেতনার জগতে এনেছে নবসৃষ্টির প্রেরণা
তাইতো তুমি কবি—অবক্ষয়ী যুগ-বিজয়ী চিরকালের কবি !

স্বদেশাত্মার বাণীমূর্তি তুমি—
স্বদেশের গৌরব স্মরণে শিশুর মতো উচ্ছল
বর্তমানের অবক্ষয় বেদনায় ম্লান
ভবিষ্যৎ উজ্জীবন স্বপ্নে ধ্যানতন্ময়।

আধুনিকের চোখে সেকেলে—রোমান্টিক তুমি।
নিত্যকালের মাটি আর মানুষের কথা
তোমার কাব্যবীণায় ঝঙ্কৃত—
সেকেলে হয়েও তুমি চিরকালের।
গভীর আনন্দ বেদনায় মেশানো
নানা রঙে রঞ্জিত তোমার কবিতা
সে কবিতা রোমান্টিক ?—হোক রোমান্টিক
তবু সে তো কবিতা !

কুমুদরঞ্জন স্মরণে

অশোক হালদার

যে যত মাটির কাছাকাছি   মা-টি তার ততো কৃপাদাত্রী,
উৎসে যার শ্রদ্ধা অবিচল   মোহানার সে-ই তো বিধাতৃ।

এ বিশ্বাস জীবন ও কাব্যে   সত্য ব'লে আজীবন চিনতে,
প্রকৃতির উপচার তাই   কুসুমিত কবিতার বৃন্তে।

নদীর ভাঙনে গেছে ভিটে   বান-ভাসি তবু তার তীর হে।
আশ্চর্য, প্রসন্ন প্রাণে   চেতনার শাশ্বত তীর্থ।

অনলস কাব্যসাধনায়   ভক্তি প্রেম স্নেহে চিন্ময়
সিদ্ধকাম মহা লেখনীর   সৃষ্টি তাই অটায় লয়।

গ্রামের নদী কুমুদরঞ্জন স্মরণে

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

দিগন্ত বিস্তৃত নয় অজানার সমুদ্র বেলায়—
আপন গ্রামের পাশে ধীরে ধীরে বহতা নদীতে
প্রাণের পুষ্পিত রাগ অনুভূতি অনুরাগ
চেতনায় পান্নাজলা হাজারো যে মানিক ধারায়—
আনন্দ বেদনা গানে নিবেদিত মঙ্গলা বেদীতে।

রামায়ণ-ভারতের পালাগানে মুখরিত গ্রাম,
বাউলের একতারা গৈরিক মাটির বুকে শোনা।
শিশুমনে কথাকলি ছন্দিত ছড়ার কলি
কবির চৈতন্যে আনে জন্মের উজানি বা কোগ্রাম,
মন ভরা প্রকৃতির আলোঝরা ছবি যেন বোনা।

অজস্র বর্ষিত তাঁর প্রসাদী ফুলের আশীর্বাদ
জনে জনে নির্বিচার নির্বিকার কল্যাণ কামনা।
প্রাচীন ঐতিহ্যমানে— মাঙ্গলিক অভিজ্ঞানে
আরতি প্রদীপ হয়ে মহতী শুভার্থী নির্বিবাদ—
ক্ষতিহীন জ্যোতিমান সুচিন্তার রাজত্বে বাসনা

এমন ধ্যানীর মূর্তি বাণীর দেউলে ছিল জানি—
সাহিত্যের তীর্থপথে শীর্ষভাগে অগ্রবর্তী প্রাণ,
সাফল্য পূর্বাহ্নে যিনি স্থির করে দিতেছেনই,
অজানা কাজের মধ্যে উপস্থিতি দেখি আশীর্বাণী
সে কোন কালের চোখে হারাবে কি দীপ্ত অনির্ব

দূরের চিন্তায় নয় কাছের ছোটর বুকে দেখা
বৃহতের মহতের ভূমার দিগন্তটুকু যেন—
আপন বিন্দুর বুকে সিন্ধুর স্বাদ সে সুখে—
মুখে হাসি ভাবতীর আজো চোখে এঁকে যায় রেখা,
সীমিত আপাত দৃষ্টি অসীমা ভূগোলে ভরা জানে।

পুরোনো প্রসাদী ফুলে নতুন প্রেরণা দেবে যদি
তাই নিয়ে কথাটুকু গোপন কর্মের স্রোতে ডুবে,
আনন্দ বেদনা যত আসুক বাধার মতো—
তার বুকে ঢেউ তুলে এঁকেবেঁকে যাবে ছোট নদী;
ধারা স্রোতে ভরে দিয়ে প্রেরণার অজানা স্বরূপে।

কুন্থরের প্রাণধারা অজয়ের গৈরিকের ধারে
আপন কূলের থেকে অকূলে গৌরব অভিপ্রায়—
নতুন জীবন ছন্দ সাধনায় শিবানন্দ,
প্রস্ফুটিত পদ্মে যেন হৃদয়ের কোরক আধারে
জ্যোতির্লোক স্বরচিত সহজিয়া দূর অসীমায়।

আধুনিক বিজ্ঞানের দৌলতে জটিল কত যাত্রা
জীবন যন্ত্রের মতো পোষাকী রেয়োজে সব ভরা
তুম্ তানা নানা শুধু কথার কাকলি ধুধু
মধুটুকু রূপে নয় রৌপ্য মুদ্রা স্থিত পূর্ণমাত্রা—
তার বেশি কিছু নেই—শুধু দৈবী বুঝি প্রাণহরা।

এ রাজ্যে অম্লান পুষ্প কতদিন প্রস্ফুটিত আর!
অবিশ্বাসী বিষ বায়ু দূরে রেখে বোঝে বিশ্বময়—
মধুর বাতাস মধু, সুদূর আকাশ মধু,
গভীর গহন রাজ্যে হারানো প্রান্তরে মন যার—
বিশ্বাসের অমলতা দেহাতীত একান্ত নির্ভয়।

অহেতুকী

ছোট ফুল, ছোট পাতা, ছোট ছোট গ্রাম,
শীর্ণ নদী আর শীর্ণ গ্রামের মানুষ--
বাংলার মায়াবী মন প্রেমের বৈরাগী
একতারা সুরে সুরে গ্রামের ফানুস
উড়িয়ে গিয়েছে দেখি কোন দূর কালে,
সূর্য যবে দীপ্ত ছিল প্রখর আলোকে;
আমি সে আলোর দ্বীপে বসতি পেয়েছি
তবু তাঁর পথে পথে পথিক গোলোকে।

জেনেছি আনন্দ মনে নিহিত সদাই
নিজের প্রশান্ত চিন্তা গভীর গহনে,
তাঁর থেকে প্রাণশিল্পী প্রতিমা-প্রকাশে
অজস্র প্রেরণাসূত্র মনের গঠনে।

আসে যা আসুক প্রেমে ক্ষতি নেই কিছু,
যাবার যা গেলেও, কালে—আসে পিছু পিছু।

কুমুদরঞ্জন

শান্তশীল দাশ

দীর্ঘদিন ধরে তুমি দিয়ে গেছ কত না আলোক,
সে·আলোক স্নিগ্ধ দীপ্ত চোখ ঝলসানো দ্যুতি নয় ;
কী আরাম সে আলোকে—স্নিগ্ধতায় তৃপ্ত মন প্রাণ ;
সে প্রদীপ নিভে গেছে, কোনদিন আর জ্বলবে না।
যা দেখেছ চারিধারে সমদৃষ্টি সবাকার পরে,
সে দৃষ্টি প্রেমের দৃষ্টি, কারো পরে হওনি বিমুখ ;
প্রসন্ন অন্তর নিয়ে গড়েছিলে আনন্দ নিলয়—
মানুষ প্রকৃতি স্রষ্টা—সমপূজ্য তোমার মন্দিরে।

কবিতা বিলাস নয়, সহজিয়া সাধনা তোমার ;
সেই সাধনায় তুমি সিদ্ধকাম : শাশ্বত সম্পদ
রেখে গেছ, আলো তার দেবে নিত্য দেশের মানুষে
বঙ্গ ভারতীর কণ্ঠে চির দীপ্ত তোমার মালিকা।
তোমার কবিতাকুঞ্জে নিত্য ভক্তজনের উৎসব—
স্নিগ্ধ শান্ত সে-মন্দির, পরিপূর্ণ চিত্তের আরাম।

কুমুদরঞ্জন

জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়

যখন অজয় নদ দেখিনিকো তখনো কেমন
তোমার কবিতা পড়ে অজয়ের অফুরন্ত প্রাণ
মনে হত কি ভীষণ চেনা চেনা, সমস্ত জীবন
তোমার মতন পারি শুনে যেতে জীবনের গান
অজয়ের তীরে বসে। জেলে, মাঝি, কিশান, গোয়ালা,
তাদের একাত্ম হয়ে, বাংলার শ্যামল মাটিতে।

সে কথা, বলছি শুধু থেকে গেছে হয়নিকো ঢালা
সে মাটিতে আমাদের প্রাণস্পর্শ। তোমার সঙ্গীতে
আমাদের সকলের এ মাটিকে ভালো না বাসার
প্রায়শ্চিত্ত করে গেছ, তুমি একা প্রাচুর্যে প্রাণের
জীবনকে ভালোবেসে, ছন্দে গেঁথে ধ্রুপদী আশার।
তুমি বুঝি শেষ শিখা ভালোবেসে আত্মদানের।

কুমুদ স্মৃতি

হরপ্রসাদ মিত্র

আমার সকল ভালো-লাগার হলুদ চাঁদে
মনের মধ্যে মন জানে কেউ কাঁদেই কাঁদে।
অথচ তার চোখ মোছাবার রুমালও নেই,
দু'হাত জোড়া পুঁটলিতে আর সাত-মোড়কে।

রণ পা আমার বিশ্বময়ীর অনুগ্রহ,
পাকাচুলের মধ্যে তবু কী সন্দেহ!
কার্য-কারণ পাপ-পুণ্যের কর্মফলের
এই চেতনা শরীর নামক অন্ধ ঘরের।

বেঁচে-থাকার তাৎপর্যের ভাবনা কেবল
কালী নদীর ঢেউয়ের মতন, ঢেউয়ের মতন!
সে তো তোমার 'উজানি' নয়, 'তুনীর'ও নয়,
তোমার 'স্বর্ণ সন্ধ্যা' কি আর আমার হবে?

ফুলের নামে লেখা তোমার কাব্য ধারা
'শতদলে'র কিংবা 'বনমল্লিকা'ময়
গন্ধ তোমার যে-চেতনার, তারই দিকে
আমারও মন অংশতঃ চায় ফিরে ফিরে।

জনপথ

গোরাচাঁদ নন্দী

গাঁয়ের পথ নদীর পথ
সে ত তোমার আমার হাতধরা প্রেমের পথ
ঝরা পাতার কার্পেটে ঢাকা
কালের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়ুতে গেলেই
পায়ের ধূলো আকাশে উড়ে মেঘ হয়ে জমে
দিন কতক বাদেই যৌবনের পায়ের দাগ
প্রগতির অ্যাসফ্যাল্টে ঢাকা পড়ে যাবে
তার পাথর কনক্রীটের ওপরে
ভাসতে থাকবে আমাদের তপ্ত হৃদয়ের উষ্ণ নিশ্বাস
তখনো পথের ধারের ধূলোবালি
পায়ে পায়ে গাঁয়ে যাবে………

কুমুদরঞ্জন

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

ওরা বলে, তুমি স্বল্প সীমাবদ্ধ শৃঙ্খলিত বৈচিত্র্যবিহীন
গণ্ডগ্রামে গণ্ডি এঁকে ঘোরো ফেরো দৃষ্টিভঙ্গি ভাবালু প্রাচীন,
ঘরোয়া বিষয় কিছু কিম্বা কিছু পুনরুক্তি পুরাকাহিনীর
কাব্যবস্তু মুষ্টিমেয়—তৃণাঙ্কিত গ্রামাঞ্চল আর নদীনীর,
নও তুমি আস্ফালিত আর্ত রুষ্ট নাগরিক নাস্তিক্যজর্জর,
ভবিষ্য নৈরাশ্যবাদী আস্থাহীন নও তুমি ইষ্টক প্রস্তর,
তোমার সকাশে শুধু ছোটোখাটো সুখদুঃখ গার্হস্থ্য চেহারা
কিছুই পাবার নেই কটিমাত্র ছন্দ আর চিত্রকল্প ছাড়া।

আমি বলি, তুমি স্রষ্টা সত্যদর্শী সর্বদর্শী সর্বগ্রাহী কবি,
বিন্দুবোধে বিশ্ববোধ—ভাঙা-রে রাঙাও তুমি বিরাট বিপ্লবী।
চক্ষের সম্মুখে যাহা প্রতিভাত প্রত্যহের সরল মুকুরে
অন্তরের অক্লান্ত বিস্ময়ে তাহা ভরে তোলো অনন্তের সুরে।
প্রজাপতি শুঁয়াপোকা বৃদ্ধ বট কিম্বা তুচ্ছ রিক্ত কটি ঘাস
তোমার নয়নস্পর্শে নবীন নবায়মান প্রাণের প্রকাশ।
নও তিক্ত উদাসীন, পরিবেশে সমাসক্ত সমাজে জাগ্রত
ঢেলে দাও অনুরাগ চতুর্দিকে অজয়ের প্লাবনের মত।

তাই দেখি শ্রীমন গফুর ছিরু সিল্‌ভিয়া মজিদ আছে জেগে
সবারে অমূল্য করো সন্নিহিত সুনিবিড় আত্মীয় আবেগে।
সে আবেগে মন্ত্র হয়ে ওঠে কাব্য—ধ্যান আর ধ্বনির ব্যঞ্জনা,
আব্রহ্মস্তম্ব সে এক সর্বব্যাপী জীবনের বিপুল বন্দনা।
তোমার সকাশে গিয়ে প্রশ্ন আর থাকে নাকো—পাই কী, না পাই-
সে-মন্ত্রের উচ্চারণে বারে বারে আমরাও কবি হয়ে যাই॥

অজয়ের কবি কুমুদরঞ্জন

কৃষ্ণ ধর

নদীর সঙ্গে কবিতার এবং জীবনের উপমা আসে সহজেই। কুমুদরঞ্জনের কথা মনে এলেই অপরিহার্যভাবে মনে পড়ে অজয়ের কথা। কুমুদরঞ্জন ছিলেন অজয়ের কবি। শুধু আলংকারিক অর্থে নয়, অজয় নদ এই কবির জীবন ও স্বপ্নকে প্রকৃত অর্থেই স্ফুরিত করেছিল। কুমুদরঞ্জন কত বড় কবি তার বিচার করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তিনি কবিতাকেই জীবনের বিকাশ রূপে মেনেছিলেন। তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নিজস্বতার কবি। অন্য কারু সঙ্গে তুলনার কথা তাই মনে পড়ে না। সহজ সরলতার যে নিজস্বতা, কুমুদরঞ্জনের কবিতায় তা পাই। যেন একটি সদ্য ফোটা শিউলির কথা উপমায় পাই তাঁর কবি-ব্যক্তিত্বে। এই সরলতা এবং নিষ্পাপ শুভ্রতা কি একালে খুব সহজে মেলে? মেলে না বলেই পবিত্রতার উৎসে যাই কুমুদরঞ্জনে।

কুমুদরঞ্জনের জীবনাবসানে বাংলা কাব্যজগতের একটি স্নিগ্ধ-মধুর সুরের রেশ মিলিয়ে গেল। কুমুদরঞ্জন ছিলেন এ যুগের প্রবীণতম কবিদের অগ্রণী পুরুষ। তাঁর কবিতার সঙ্গে বাংলাভাষী শিক্ষিত মানুষ প্রায় সকলেরই পরিচয় আছে। নগর জীবন থেকে দূরে পল্লী নিকেতনে বাস করতেন এই কবি। নাগরিকত্বের মোহ কোনো দিন তাঁকে আকর্ষণ করে নি। যে গ্রামবাংলা অনন্তকাল ধরে একাকী তার বিশাল প্রান্তরে, সবুজ শ্যামলিমায়, নদীর কলতানে মুখরিত হয়ে একান্তে পড়ে আছে, কুমুদরঞ্জন ছিলেন তার প্রিয় সন্তান। গ্রামজীবনের প্রতি তাঁর মমতা তাঁর কবিতাকে দিয়েছিল এক অপরূপ চিত্রময় গীতলতা যা আমাদের গভীরভাবে আকর্ষণ করত।

অজয় নদের তীরে ছিল তাঁর জন্মস্থান। মনে পড়ছে কয়েক বৎসর আগে বন্যায় গ্রাম প্লাবিত হয়ে গেলে সকলে যখন এই বৃদ্ধ কবির নিরাপত্তার জন্য উদ্বিগ্ন, তখন তিনি বলেছিলেন এই গ্রাম ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। গ্রামের মানুষের সুখ-দুঃখের সমব্যথী এই কবির অন্তর ছিল সাধারণ মানুষের জন্য সমবেদনায় পূর্ণ। তাঁর কবিতা বাংলার সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং আনন্দ-বেদনার এক কল্লোলিত অভিব্যক্তি।

রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন, কুমুদরঞ্জনের কবিতা পড়লে বাংলার গ্রামের তুলসীমঞ্চ, সন্ধ্যাপ্রদীপ, মঙ্গলশঙ্খের কথা মনে পড়ে। জীবনের বহিরঙ্গ পরিবর্তনের কোনো ছাপ এই কবিকে স্পর্শ করতে পারে নি। কোনো দিন যদি বাংলাদেশের গ্রামপ্রকৃতি কোনো যাদুমন্ত্রবলে পরিবর্তিত হয়ে যায় তখন কুমুদরঞ্জন মল্লিকের কবিতা পড়ে বাংলার গ্রামের নিখুঁত নিসর্গচিত্রের পরিচয় আবিষ্কার করতে পারবে উত্তরকালের পাঠক।

বৈষ্ণব ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ কবি কুমুদরঞ্জন তাঁর কবিতায় রাগানুগ ভক্তিপর্বের উজ্জ্বল নিদর্শন রেখেগেছেন। তাঁর কবিতায় আধুনিককালের সংশয় বা জিজ্ঞাসা, অন্তর্দ্বন্দ্ব কিংবা হতাশা খুঁজতে গেলে হয়তো ভুল হবে। কিন্তু যে কবিতা সহজ, সরল এবং ঈশ্বর ও প্রকৃতির প্রতি অনাবিল আনুগত্যে প্রশ্নহীন তার আবেদনও এককালে এই দ্বিধা-সংশয়-দীর্ণ বাংলাদেশেই ছিল অপরিমেয়। কুমুদরঞ্জন সেই যুগের কবি। সে যুগ আজ অতিক্রান্ত। তাই আধুনিককালে হয়তো তাঁর কবিতার পাঠনসংখ্যা ছিল সীমিত। কিন্তু বাংলা কবিতার সেই নিস্তরঙ্গ প্রশান্তির যুগে কুমুদরঞ্জনের কাব্যপ্রতিভা ছিল স্বীকৃত। তাঁর কাব্যগ্রন্থের নামকরণেই এই কবিসত্তার স্বরূপটি নিশ্চিতভাবে ধরা পড়ে— 'উজানী' 'একতারা' 'বনমল্লিকা' 'বনতুলসী' 'রজনীগন্ধা'—মনে হয় যেন এই শ্যামলিম বাংলাদেশে ছায়াশীল কোনো পথেই পরিক্রমা করছি কবির হাত ধরে। শিক্ষাব্রতী ছিলেন তিনি। শিক্ষা ও সাহিত্যসেবায় উৎসর্গীকৃত প্রাণ কুমুদরঞ্জন ছিলেন আদর্শ মানুষ। আজীবন সাহিত্য সেবায় ব্রতী এই কবিকে কিন্তু রাজ্য সরকার বা সাহিত্য একাদেমী কেউই পুরস্কার দানে সম্মানিত করার কথা ভাবেন নি। প্রচার বিমুখ নিরহঙ্কার এই কবি বাংলার পাঠক-সাধারণের কাছ থেকে জীবনভর যে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পেয়েছিল তাকেই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার রূপে মাথায় পেতে নিয়েছিলেন।

কী প্রত্যাশা ছিল তাঁর আমাদের কাছে?

হয়তো কারো হরবে ক্ষুধা
আমার তরুর ফল,
স্নিগ্ধ কারো করবে দেহ
অশ্রুদীঘির জল।
ঝরা ফুলের গন্ধে ওরে
হয়ত কেহ স্মরবে মোরে,
ভাবুক পথিক বলবে হেসে—
লোকটা ছিল খাসা।

খাসা তো বটেই, বাংলার গ্রামের মাটি, সোনালী ধান, টলটলে নদীর জলের মতোই নিষ্কলঙ্ক, এবং খাঁটি। কোথায় পাব তারে?

স্বভাব-কবি কুমুদরঞ্জন

রণজিৎকুমার সেন

বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমায় মঙ্গলকোট থানার মধ্যে কোগ্রাম, পুরো নাম—উজানি-কোগ্রাম। অজয় নদ ও কন্নুর নদী এই গ্রামটিকে আলিঙ্গন করে যেন নিজেদের মিলন ঘোষণা করেছে। একদিকে বীরভূম জেলার নান্নুর থানা, আর একদিকে বর্ধমানের এই মঙ্গলকোট থানা। কোগ্রাম বা মঙ্গলকোট থেকে শ্রীখণ্ডও বেশি দূরে নয়। শ্রীখণ্ড-কোগ্রাম-নান্নুর জুড়ে রাঢ় বাংলার এই প্রাকৃতিক অঞ্চলে একদা বৈষ্ণব কাব্যের ঝর্ণাধারার ত্রিবেণী-সঙ্গম হয়েছিল। সেই কাব্যধারার উৎস ছিলেন শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার, কোগ্রামের লোচন দাস ও নান্নুরের চণ্ডীদাস। এই বৈষ্ণবভাবসিঞ্চিত অঞ্চলের শেষ কবি কুমুদরঞ্জন। বাংলা কাব্যের এই ঐতিহাসিক পরিবেশে তাঁর কাব্যপ্রতিভার আত্মবিকাশ একান্তই স্বাভাবিক ছিল।

রবীন্দ্রানুসারী কবি হয়েও কুমুদরঞ্জন তাঁর ব্যক্তিচরিত্রে চিরকালই একক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কণ্ঠের তুলসী মালাটির মতো তাঁর মনের চারদিকে রয়েছে বৈষ্ণব ভাবরসের একটি নিবিড় আস্বাদন। জগৎ ও জীবনকে ভালোবেসে মানুষকে প্রসন্নতার সঙ্গে গ্রহণ করেই তাঁর কাব্যসাধনা। বাংলার জল-মাটি তাঁর গোপীচন্দন, এর প্রতিটি গ্রাম তাঁর কাছে মধুবৃন্দাবন, প্রতিটি তরু কদম্ব-তমাল, প্রতিটি নদী সূর্যাত্মজা কালিন্দী। কুমুদরঞ্জনের কাব্য এক শান্ত নিস্তরঙ্গ 'লেগুন'। তার চারদিকে উত্তাল সমুদ্রের ক্রুদ্ধ গর্জন ; তারই মধ্যে একটি সুচিরস্নিগ্ধ নীল জলের প্রসন্ন অবকাশ। শহর-ভীরু কবি জীবনকে ভালোবেসেছেন। সে জীবন কেতাবী বিদ্যা দিয়ে গড়া ড্রয়িং রুমের কৃত্রিম জীবন নয়। সে জীবন প্রত্যহের অযুত আকাঙ্ক্ষার রসে আরক্তিম। তত্ত্ব নয়, তর্ক নয়, সমস্যা নয়—শুধু একটি প্রাণ অপর প্রাণের সঙ্গাভিলাসী।

'সুন্দর আমি যাহা কিছু দেখি ভবে,
মোর দৃষ্টির কষ লেগে আছে সবে।
রয়েছে ধরায় সব সৌরভ কুঁড়ি,
আমার বুকের প্রণয়ের কস্তুরী।
সকল সলিলে আমার অঙ্গবাস,
সব সমীরণে আমারি যে নিশ্বাস।
ঘন অনুভূতি দেয় মোরে সন্ধান—
সকল প্রাণেই রয়েছে আমার প্রাণ।

তেমনি নিজের জগৎ সম্পর্কে কবির আত্মপ্রত্যয়—

'ভুবন আমার অমৃতসিক্ত শুধু আনন্দ আলোকের,
ক্ষীর নবনীর অবনী সে মোর, আমার ধরণী বালকের।

সোনার নূপুর গুঞ্জরে যেথা, বাজে রয়ে রয়ে বাঁশরী,
সব দুখ মোর সুখ মনে হয়, সব ব্যথা যাই পাসরি।…

অন্যত্র বলেছেন—

'আনন্দ মোর কতই নিবিড়, কি বিপুল হর্ষ,
আমি ও আমার প্রতি অণুটুকু এ ভারতবর্ষ।
আমি গয়া-কাশী, আমি অযোধ্যা, পুরী ও বৃন্দাবন,
আমি কামাখ্যা, আমি কাশ্মীর, সোমনাথপত্তন।
আমি তো ক্ষুদ্র অতি—
কিন্তু বিরাট ওই হিমাদ্রি আমার গোত্রপতি।'

ভারতাত্মা ও ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে কবি এখানে একাত্ম। নিজের দেশকে, দেশের খাল-বিল, নদী-নালা ও বৃক্ষরাজিকে, এর মানুষ ও পশু-পাখিকে পাল-পর্ব ও প্রতিদিনের সুখ-দুঃখকে তিনি অন্তর দিয়ে ভালোবেসেছেন। ভালোবেসেছেন এর অতীতকে, বর্তমানকে, স্বপ্ন দেখেছেন এর উজ্জ্বল আশাদীপ্ত ভবিষ্যতের।—কুমুদরঞ্জনের কবিহৃদয়ের অন্তর্নিহিত প্রধান সুরটি হল অমৃতসন্ধানী সাধকের দিব্যানুভূতিজাত উচ্চকোটির ভাব। অথচ তারই ফাঁকে ফাঁকে এও দেখা যায়, মানুষের অভাব ও বেদনা তাঁকে একাগ্রভাবে স্পর্শ করে। দেশের দুঃখ-দারিদ্র্য তাঁর অন্তরকে অত্যন্ত পীড়া দেয়। আবার অতীত গৌরবকাহিনী, মাতৃভূমির বিবিধ বিগত মহিমায় তিনি গর্ববোধ করেন। তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য তাঁকে মুগ্ধ করে। দেশের মাটির তুচ্ছতম তৃণ তরুলতাটিকে পর্যন্ত তিনি ভালো না বেসে পারেন নি। মানুষের মধ্যে নীচ জাত বলে তাঁর কাছে কেউ নেই। সর্বজীবে সমদৃষ্টি এই কবির। তাঁর বহু কবিতায় এর পরিচয় রয়েছে। এই ধরনের রচনাগুলিরও প্রত্যেকটিতেই পাওয়া যায় তাঁর শুচিশুভ্র শান্ত হৃদয়ের একটি নিবিড় গভীর ভাগবতস্পর্শ। কবিতা লিখতে হবে বলে তিনি যেন প্রস্তুত হয়ে লেখনী নিয়ে বসেন নি। কবির কলমের মুখে যেন আপনিই প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে তাঁর স্বতোৎসারিত কাব্যধারার পাষাণ-গলানো অজস্র প্রপাত। সে রচনা হৃদয়রসে অভিষিক্ত। বর্ণাঢ্য ফুলের মতো সুরভিসুন্দর ও সুষমাময়। অতি সহজ স্বাভাবিক তাঁর স্বচ্ছন্দ বিকাশ। ভাবগৌরবে সমুজ্জ্বল তাঁর এই সব রচনার মধ্যে কোনও দুরূহ জীবনসমস্যা নেই। কষ্টকল্পিত প্রহেলিকার গোলকধাঁধা নেই। মাথা ঘুরিয়ে দেওয়া হেঁয়ালীর সমাবেশ নেই। কুমুদরঞ্জনের রচনা সোজা পাঠকের মর্মে প্রবেশ করে।—তাঁর একাধিক কাব্যগ্রন্থের যে কোনও একখানি হাতে নিয়ে পাতা ওল্টালেই দেখা যাবে—সহজ সাবলীল গতিতে বয়ে চলেছে তাঁর ছন্দ উজ্জ্বল কল্পনার মন্দাকিনী ধারা নানা ভাবের বিচিত্র লহরী তুলে। দুই তীরের জনমনতট ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় সেই রচনাপ্রবাহ পরমপ্রীতির প্রাণদ পরশ দিয়ে। গ্রামের কবি তিনি। গ্রাম্য বধূর সাজেই তাঁর কাব্য-

লক্ষ্মীকে এনে হাজির করেছেন শহুরে রসিক সমাজের উঁচুতলার বালাখানায়। তিনি কূপমণ্ডুক নন। তাঁর দৃষ্টি গ্রামের বাইরেও অসঙ্কোচে সর্বত্র প্রসারিত। অযোগ্যতা অনভিজ্ঞতা বা অক্ষমতার কোনো কুণ্ঠা নেই, দ্বিধাসঙ্কুল জড়তা নেই, আত্মপ্রত্যয়ে অকুতোভয় তাঁর লেখনী। বাহাদুরী দেখাবার অশোভন প্রয়াস নেই কোথাও। নূতনত্বের মোহ সৃষ্টির লোভ নেই, পাণ্ডিত্য প্রকাশের নির্লজ্জ অহমিকা নেই তাঁর রচনায়। ছন্দের নূপুরে উচ্চকিত তাঁর দিব্যভাবের সমারোহ। প্রকাশভঙ্গির মাধুর্যে মধুময় তাঁর কাব্য। তাঁর রচনায় সরল ঐশ্বর্য যেন সহজাত কবচকুণ্ডলের মতো তাঁর কাব্যকে অলঙ্কৃত করে রেখেছে। তাঁর উপাস্য দেবীর কণ্ঠে দোলে অনাদরে ফোটা আকন্দ-কুসুমের বনমালা, কবরীতে বিজড়িত মাটি থেকে কুড়িয়ে আনা শিউলি ফুলের বেণী-বন্ধন। কদম্বকেশর-কীর্ণ তাঁর আরাধ্যার পূজা-প্রাঙ্গণ।

'প্রতি পদার্থে অপার্থিবের রহিয়াছে পরিবেশ,
অচিন্তনীয় সম্ভাবনার হেরি নিতি উন্মেষ।
প্রকাশ করিতে চাই—
অফুরন্তকে ফুরায়ে বলার সাধ্য আমার নাই।'

একালের মানসিকতা যখন কুমুদরঞ্জনকে প্রাচীন বলে পরিহার করতে উদ্যত, তখন রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কথা বিশেষভাবে স্মর্তব্য।—'আমাদের দেশের হাল-আমলের কাব্য, যাকে আমরা আধুনিক বলছি, যদি দেখি তার দেহরূপটাই অন্য দেহরূপের প্রতিকৃতি, তা হলে তাকে সাহিত্যিক জীবসমাজে নেব কি করে। যে কবিদের কাব্যরূপ অভিব্যক্তির প্রাণিক নিয়ম পথে চলেছে, তাঁদের রচনার স্বভাব আধুনিকও হতে পারে, সনাতনীও হতে পারে, অথবা উভয়ই হতে পারে, কিন্তু তার চেহারাটা হবে তাঁদেরই, সে কখনোই এলিয়টের বা অডেনের বা এজরা পাউণ্ডের ছাঁচে ঢালাই করা হতে পারে না। যে কবির কবিত্ব পরের চেহারা ধার করে বেড়ায়, সত্যকার আধুনিক হওয়া কি তার কর্ম।'—কুমুদরঞ্জন আধুনিকও নন, সনাতনীও নন। তিনি স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত কবি।

গ্রামোফোন রেকর্ডে তাঁর যে গানটি একদা বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল, তা হচ্ছে 'ওরে মাঝি, তরী হেথা বাঁধবো না কো আজকে সাঁঝে।' গেয়েছিলেন প্রথমে ইন্দুবালা, পরে তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। রেকর্ডে কুমুদরঞ্জনের গানের উদ্যোক্তা ছিলেন কাজি নজরুল ইসলাম। ২৮-১০-৩৭ তারিখে তিনি কুমুদরঞ্জনকে এক পত্রে লেখেন : "...আপনার 'অধরে নেমেছে মৃত্যু-কালিমা।' শীর্ষক গানটির কথাগুলি ও তার সাথে অন্য একটি গান (যা ওর জোড়া হতে পারে) যদি অনুগ্রহ করে পাঠিয়ে দেন, তা হলে বিশেষ বাধিত হবো। শ্রীমতী ইন্দুবালা ঐ গান দুটি গাইতে চান। আপনার প্রেরিত গান দুটি পেলেই রেকর্ড

করা হবে।...” নজরুল-উল্লেখিত গানটির জুড়ি গান ‘তরী হেথা বাঁধবো নাকো আজকে সাঁঝে’ ছাড়া আর কোন্ গান উপযুক্ত হতে পারতো ?

কুমুদরঞ্জন সম্পর্কে যে কথাগুলি এতক্ষণ উল্লেখ করা হল, সে সম্পর্কে বাংলা সাহিত্যে যাঁরা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, তাঁরা হচ্ছেন নরেন্দ্র দেব, বিনয় ঘোষ, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, কাজী আব্দুল ওদুদ, ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়, কবিশেখর কালিদাস রায়, অজিত দত্ত, ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায়, ডঃ উমা দেবী, ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। আমার নিজের অনুভূতিকে তাঁদের কথার সঙ্গে মাত্র গেঁথে দেবার অবকাশ পেয়েছি। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ এবং কাল ও কালান্তর যাঁর দার্শনিক সত্তার মধ্যে একই গতিতে প্রবাহিত, সেই কবি-দার্শনিক কুমুদরঞ্জনকে বুঝতে হলে বুঝতে হয় তাঁর অনুপম সৃষ্টির এই পংক্তিটি—

‘...সকল শব্দ ভাষা ও কাকলি, সব সুর সব গীতি
আমার জিহ্বা কণ্ঠতালুর বহিতেছে পরিচিতি।
সুরের নীড় যে কোন্ নীড়ে ডাকে, ভাবিয়া পাই না সীমা,
বিস্মৃত প্রিয় কতই কণ্ঠ দিল ওতে মাধুরিমা।
ভালো লাগা সব বর্ণে গন্ধে, ভালো লাগা সব গানে
জন্মান্তর সৌহার্দ্যের অভিজ্ঞান যে আনে।
পাইনি অমর বর,
যুগের যুগের প্রেম শুধু মোরে করেছে জাতিস্মর।’

আমার ছোটবেলায় বাড়িতে যেসব সাময়িকপত্র আসতে দেখতাম, তার মধ্যে অন্যতম ছিল ‘ভারতবর্ষ’। ভারতবর্ষেই প্রথম আমি কুমুদরঞ্জনের কবিতা নিয়মিত পড়ার সুযোগ পাই। তখন তাঁর নামের সঙ্গে ‘বি-এ’ ডিগ্রীটির উল্লেখ থাকতো। তখন থেকেই কুমুদরঞ্জনের কবিতার সহজাত ও খাঁটি বাঙালীত্ব আমার মনের মধ্যে কেমন যেন এক অদ্ভুত সাড়া জাগাতো। বড় হয়ে দেখেছি --কত কবিকে নিয়ে কত হৈ-চৈ, কিন্তু কুমুদরঞ্জনকে নিয়ে কোথাও কোনো আলোচনা নেই। অর্থাৎ—আলো, বাতাস আর জলের মতো তাঁর কবিতা বাঙালীর জীবনে এমন ওতপ্রোতভাবে মিশে গিয়েছিল যে, তা নিয়ে কারুর পক্ষে আলোচনার অবকাশ ছিল না।

তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে ১৯৪৩ সালের গোড়ায়। আমি তখন ‘বঙ্গশ্রী’ মাসিকপত্রের সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়ে কবিতা চেয়ে কুমুদরঞ্জনকে চিঠি লিখি তাঁর কোগ্রামের ঠিকানায়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি কবিতা পাঠিয়ে দেন। পত্রে প্রথম দিন থেকেই তিনি এমনভাবে কুশল কামনা করে আশীর্বাদ জানাতেন —যেন কত দীর্ঘকাল ধরে তিনি আমাকে চেনেন। এ এক অদ্ভুত আত্মীয়তা-বোধ। তাই তাঁর চিঠি পাবার জন্যে আমি নিয়ত উন্মুখ হয়ে থাকতাম।

একবার তাঁর কবিতার অপর পৃষ্ঠায় একটি অসম্পূর্ণ কবিতার তিনটি লাইন পাওয়া গেল—

'আমায় তুমি করো খাঁটি।
সাপ করো তো সাপই করো,
নেউল করো, সাপকে কাটি।'

পড়ে—আমার এত ভালো লাগলো যে কবিতাটি সম্পূর্ণ করে লিখে পাঠাবার জন্যে লাইন তিনটি উদ্ধৃত করে কুমুদরঞ্জনকে চিঠি দিলাম। সপ্তাহ খানেকও কাটলো না, তিনি কবিতাটি সম্পূর্ণ করে পাঠালেন, নাম দিলেন—'খাঁটি'। লিখে জানালেন—'…কখন্ জানি না লিখতে শুরু করেছিলাম, তার পর ভুলে তার পরের পৃষ্ঠাতেই তোমার জন্যে কবিতা কপি করে পাঠাই। 'খাঁটি' কবিতাটি তোমার জন্যেই লেখা হলো।'

কবিতাটি আমি আজও আবৃত্তি করি—যেমন করে মনে মনে গুনগুন করি রবীন্দ্রসঙ্গীত—'আমারে তুমি অশেষ করেছ, এমনই লীলা তব।' 'খাঁটি' কবিতাটি শেষ করে পাঠিয়ে কুমুদরঞ্জনও সেদিন আমাকে অশেষ করেছিলেন।

তাঁর সঙ্গে দিনে দিনে আমার সম্পর্ক ক্রমেই নিবিড় হয়ে উঠতে লাগলো। তাঁর এই নিবিড়তায় দীর্ঘ ত্রিশ বছর আমি আচ্ছন্ন ছিলাম। ছেদ পড়লো—যখন ইহলোকের জীর্ণবাস ত্যাগ করে চলে গেলেন। দীর্ঘ বারো বছর আমি বঙ্গশ্রী সম্পাদনা করি। এই বারো বছরে আমি কুমুদরঞ্জনের প্রায় একশো কবিতা প্রকাশ করার সুযোগ পাই। এই সুযোগ দিয়ে তিনি আমাকে ধন্য করেছিলেন।

কলকাতার সঙ্গে তাঁর নাড়ীর যোগ ছিল না। দেবীমূর্তিপ্রতিষ্ঠিত কোগ্রামের নিজ গৃহই ছিল তাঁর স্বর্গরাজ্য। তবু সভা-সমিতি বা যাতায়াতের সূত্রে কচিৎ কখনও তাঁকে কলকাতা ছুঁয়ে যেতে হতো। এই অবকাশে আমি কয়েকবারই তাঁর সঙ্গে কথা বলে মন ভরে নেবার সুযোগ পাই। প্রতিবারই তিনি 'ভাই' বলে বুকে আকর্ষণ করেছেন। এমন স্নেহময় কবি এ যুগে বিরল। প্রাক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্বে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র জ্যোৎস্নানাথ যখন রাজবাড়ি কোর্টের মুন্সেফ, তখন আমার পিতৃদেব শশিভূষণও রাজবাড়িতেই ছিলেন। জ্যোৎস্না-নাথের কাছে গিয়ে তিনি আমার পিতৃদেবকে দর্শন দেন। তাঁরা উভয়েই প্রধান শিক্ষক হিসেবে জীবন শুরু করেন এবং উভয়েই ভক্তি-জগতের মানুষ হওয়ায় আমার পিতৃদেবের সঙ্গে কুমুদরঞ্জনের পরিচয় নিবিড় হতে কয়েক ঘণ্টা মাত্রও সময় লাগে নি। বহু জন্ম-জন্মান্তরের আত্মীয়তা না থাকলে বুঝি এমনি করে মুহূর্তকালের মধ্যে এমন নিবিড় আত্মীয় হয়ে ওঠা যায় না।

অনেক বৈষ্ণবের সঙ্গে আমার নানাভাবে যোগাযোগ ঘটেছে। কিন্তু কুমুদরঞ্জনের মতো এমন পরম বৈষ্ণব আমি কদাচ দেখেছি। বৈষ্ণব বলেই জীবনে তাঁর সহজতা এত স্বতঃস্ফূর্ত ছিল। সহজেই তিনি বলতে পেরেছিলেন—

ধনী মানীর আদর পেতে করি নাকো প্রাণান্ত,
সহজিয়া সহজ খুঁজি সহজে পাই আনন্দ।...

তাঁর স্নেহের জগতে কখনও আত্মীয়-অনাত্মীয় ভেদ ছিল না। মুহূর্তের পরিচয়ে সকলেই আত্মীয় হয়ে যেতো। চিরকাল তিনি গ্রামবাসী ছিলেন বলে একালের অনেকেই তাঁকে পল্লীকবি বলে থাকে। কিন্তু পল্লীগ্রামে বাস করে পল্লীময়তায় মন আশ্লীষ্ট হলেই কি কবি পল্লীকবিরূপে মাত্র আখ্যায়িত হয়ে ওঠেন? আমার ধারণা তা নয়। কবি যেখানেই বাস করুন না কেন, কোনো বিশেষ গণ্ডির মধ্যে তিনি কোনোদিনই সীমাবদ্ধ থাকেন না। গণ্ডি পেরিয়ে তিনি সমস্ত দেশ-কালে ছড়িয়ে পড়েন। যে পল্লীসভ্যতার সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির আন্তর-যোগ, শহরবাসী কবিদের রচনায় সেই পল্লী প্রধানতই থাকে উপেক্ষিত। সেই উপেক্ষার প্রায়শ্চিত্ত ঘটেছে কুমুদরঞ্জনের জীবনে। চিরকাল তিনি পল্লীজীবন যাপন করে পল্লীকে নানা ভাবে, নানা রসে ও নানা রূপে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর কাব্যে। বাংলা কাব্যসাহিত্যের নৈরাজ্য যুগে তিনি পল্লীসভ্যতার সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির নতুন সেতুবন্ধন ঘটিয়েছেন। এখানেই তিনি মহৎ, এখানেই তিনি শ্রেষ্ঠ। কিন্তু পল্লীকাব্য ছাড়া তিনি নানাবিষয়ক যে সব কবিতা রচনা করেছেন, তার সংখ্যাও কম নয়।

গান্ধী-জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আমি একটি সঙ্কলন প্রকাশে উদ্যোগী হয়ে কুমুদরঞ্জনকে গান্ধীজী সম্পর্কে একটি কবিতা লিখে পাঠাতে অনুরোধ জানাই। কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি একটি নতুন কবিতা লিখে আমাকে পাঠিয়ে দেন। কবিতাটি এই—

অর্ধ ধরণী নত হল যাঁর পদ্মাসনের তলে,
অহিংসা নব যুগের সূচনা করিল ভূমণ্ডলে,
হেরি পশু-ঘাত সদয় হৃদয় বুদ্ধ-শরীরধারী—
কেশবে আমরা চক্ষে দেখিনি হতভাগ্য যে ভারি,
পশু-ঘাত নয় নর-পশুদের আঘাত ব্যথিল যাঁকে—
আমরা দেখেছি সে মহামানব গান্ধী মহাত্মাকে।

প্রায় দু হাজার বৎসর পরে জন্মেছি ইহলোকে
যীশু খ্রীষ্টের ক্ষমাসুন্দর মূর্তি দেখি নি চোখে,
কোথায় প্রতাপী 'পাইলেট'? আর কোথায় রিচারদিন?
উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর সে অমর নেজারীন।
যুগের যুগের শিল্পী ও কবি চিত্র যাঁহার আঁকে,—
দেখি নি—কিন্তু আমরা দেখেছি গান্ধী মহাত্মাকে।

প্রেম-অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ চলেছেন ভাবাবেগে—
মাঠ ঘাট বাট তীর্থ হতেছে চরণের ধূলা লেগে,

ভক্তিতে নত যত নরনারী পশুপাখী তরুলতা—
জীবে সে কি দয়া ! শ্রীহরির লাগি কি গভীর ব্যাকুলতা।
আচণ্ডালকে ডাকি কোল দেন—যান যেথা তাঁরে ডাকে,
দেখিনি—কিন্তু আমরা দেখেছি—গান্ধী মহাত্মাকে।

কুমুদরঞ্জনের জন্ম ৩রা মার্চ ১৮৮২ এবং মৃত্যু ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৭০। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর পরিচয় এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মর্তব্য। যথা—শতদল (১৯০৬), বনতুলসী (১৯১১), উজানি (১৯১১), একতারা (১৯১৪), বীথি (১৯১৫), বীণা (১৯১৬), বনমল্লিকা (১৯১৮), নূপুর (১৯২২), রজনীগন্ধা (১৯০২), অজয় (১৯২৭), তূণীর (১৯১৮), চুনকালি (১৯৩০), স্বর্ণসন্ধ্যা (১৯৪৮)। 'দ্বারাবতী' নামে একটি নাটিকাও তিনি রচনা করেন। তাঁর সর্বশেষ দুটি সঙ্কলন—'কুমুদরঞ্জন মল্লিকের শ্রেষ্ঠ কবিতা' (১৯৫৭) এবং 'কুমুদরঞ্জন-কাব্যসম্ভার' (১৩৭৪)। নিজের কাব্যরচনা সম্পর্কে তিনি বলেছেন : 'কবিতা আমি লিখিব বলিয়া লিখি না। লিখিবার জন্য নির্জনতার দরকার হয় না। সহস্র গোলের মধ্যে কবিতা লিখি, নদীতে বন্যা বা জোয়ার আসার মতো কবিতা লেখার সময় একটা মাঝে মাঝে আসে। আমি কবিতা গড়ি না, তাহারা রূপ-গন্ধহীন ফুলের মতো আপনা হইতে ফোটে।'

মাসিকপত্রে তাঁর কবিতা পাঠ করে একদা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : 'আপনার যে কোনো কবিতা পড়িয়াছি,—তাতেই বিশেষ আনন্দ পাইয়াছি। আপনার কবিতা আমাদের বঙ্গসাহিত্যে অম্লান-শোভায় বিরাজ করিবে।'

অথচ আশ্চর্য, যে যুগে বয়স ও প্রভৃত গুণবিচারের অপেক্ষা না করে বহু শিল্পী-সাহিত্যিককেই রাষ্ট্রীয় পুরস্কার ও খেতাব অকাতরে প্রদত্ত হয়ে থাকে, সেকালে তাঁর অষ্টাশি বছর বয়সে মৃত্যুর পূর্বে মাত্র কুমুদরঞ্জনকে সামান্য 'পদ্মশ্রী' খেতাব দিয়ে রাষ্ট্র তার কর্তব্য সমাপন করে নিশ্চিন্ত থাকলো। এর মতো লজ্জা এবং পরিতাপের বিষয় আর নেই।

স্বদেশী কবি কুমুদরঞ্জন

শিলাদিত্য

একাধিক কবি পরিচায়কের মতে কুমুদরঞ্জনের কবিতার উপাদান প্রধানতঃ বাংলার মাটি, জল, আকাশ, বাতাস, তরুলতা বা সংস্কৃতি। কিন্তু বাংলার মাটি জল আকাশ বাতাসকে অতিক্রম করে যে কবিমানস ভারতের মর্মভূমিতে বিচরণ করে বেড়াত, সেই মনও বিচিত্র অনুভূতির সম্ভারে সমৃদ্ধ ছিল। তার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আপনা থেকেই চোখে পড়ে, যেমন

১) অতীতের গ্লানি উপেক্ষা করার ক্ষমতা,

২) আশাবাদী বিচার ভঙ্গি,

৩) অখণ্ড ভারতে বিশ্বাস,

৪) প্রবীণ শিক্ষকসুলভ সমালোচনা শক্তি।

সহস্রবৎসর ব্যাপী পরাধীনতার গ্লানিময়যুগ থেকে ভারত মাত্র সিকি শতাব্দী মুক্তি পেয়েছে। এই গ্লানিকে কবি উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখেছেন। বলেছেন—

যাহা ঘটে তাই ইতিহাস নয়, কতটুকু তার রহে?
অনন্ত এই কালসমুদ্রে সদা তরঙ্গ বহে,
চিহ্ন রাখে না, ভাসাইয়া দেয় আবর্জনার ভার;
দেশ ও জাতিকে সমৃদ্ধ করে চলে তার কারবার।

(ভারতের দাসপর্ব। শ্রেষ্ঠ কবিতা পৃ ৫)

ইতিবৃত্ত কথার মুখরভাষণ শুনবার মনোবৃত্তি কবির নয়। তাঁর হৃদয়ে অনুক্ষণ ধ্বনিত হত ভারতের অতীত গৌরব বাহিনী বাণী। মোগল বা ইংরেজের কুশাসনের বা অত্যাচারের ইতিহাস নিয়ে যাঁরা সাতকাহন লিখেছেন, তাঁদের তীব্র হুঁশিয়ারী দিয়েছেন—

কৃতঘ্নতা ও নৃশংসতার রঞ্জিত বিবরণ
কলঙ্কিত ও দূষিত করেছে যুগের তারিখ সন।
তাদের উপর নাইক শ্রদ্ধা নাই মমতার লেশ,
শপ্ত সপ্ত-শতাব্দী কর সাতটা ছত্রে শেষ,

(ভারতের দাসপর্ব। শ্রেষ্ঠ কবিতা পৃ ৫)

কবিতাটিতে এক অপূর্ব স্বদেশপ্রেমের অভিব্যক্তি দেখা যায়। সেই দৃষ্টি প্রসারে স্বদেশের নিন্দা গ্লানি দীনতা সব কিছু 'এহ বাহ্য এহ বাহ্য' পর্যায়ে। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল—

অপবিত্র তো হবে না এ মাটি শুদ্ধ ও সিদ্ধ,
ভক্তের পদ-পরশে নিত্য সে অপাপবিদ্ধ।

এখানে বৃথাই অপশক্তির দম্ভ-সৌধ গাঁথা,
চূর্ণ হইয়া ধূলায় মিশিবে বাসুকি নাড়িলে মাথা ॥'
(ভারত মহিমা। শ্রেষ্ঠ কবিতা পৃ ৩)

সেই বাসুকি মাথা নেড়েছিলেন! তারই ফলে ইংরেজের দম্ভ-সৌধশীর্ষে ভারতের জাতীয় পতাকা সগৌরবে উন্নতশির।

আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে কবি ভারতের অখণ্ডতায় বিশ্বাসী ছিলেন। লিখেছেন—

এই ভারতে করে নি ভাগ মোগল কি ইংরাজ ;
একদিকে তার কামাখ্যা, আর একদিকে হিংলাজ।
নিজের জাতির কুষ্টি রেখে গেছে উৎপীড়ক,—
নিভেছে আগ্নেয়গিরি উদ্গারি হীরক।
(আমাদের ভারত। শ্রেষ্ঠ কবিতা পৃ ১)

মোগল কি ইংরেজ যা করে নি, আমরা তা করেছি—ভারত ভেঙ্গে দু'ভাগ করেছি। কিন্তু আশাবাদী কবি তবুও নিরাশ হ'ন নি। ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন—

ওই বাজে জয়ভেরী
হরণ করেছে, বরণ করিতে করিবে না বেশি দেরি।
(ভারত মহিমা। শ্রেষ্ঠ কবিতা পৃ ৩)

ইতিহাসের বিচিত্র বিপাকে ভারত ভেঙ্গে গঠিত, ভারতের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত প্রতিবেশী রাষ্ট্র, বিভিষ্ট সিকিশতাব্দী পরে আজ মিত্রভাবে ভারতকে বরণ করেছে। পশ্চিমের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের কথা ভবিষ্যতের জন্য তোলা রইল।

কবি শুধুমাত্র আশাবাদী-স্বপ্নবিলাসী ছিলেন না। যেখানে অন্যায়, যেখানে পাপ, যেখানে অবিচার, সেখানে কবি তীব্র অগ্নিবাণ বর্ষণ করেছেন। অকুতোভয় স্বদেশপ্রেমিক, ব্রিটিশ বিচার প্রহসনকে সমালোচনা করে লিখেছেন—

'নন্দকুমারে' ফাঁসি দিল যারা তাদেরো বিবেক আছে?
ওকে বল ন্যায়? তবে অন্যায় স্পৃহনীয় ওর কাছে।
ওকি কদর্য বিচারের রূপ?
হীন কুৎসিত বিষ-বিদ্রূপ—
ও বিচারে মরে দেবতা মানুষ— অসুরই কেবল বাঁচে।
...
স্বার্থের নামে এ তো বলিদান
নাহিকো যুক্ত যুক্তির স্থান,
সব ত্যজিয়াছ লজ্জা—ত্যজো না হে ভদ্র রও চুপ।
(ব্রিটিশের বিচার। কাব্যসম্ভার পৃ ৩১৮-৯)

সেই একই লেখনী থেকে নিঃসৃত হয়েছে দেশের আভ্যন্তরিক অশান্তি ও সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার কঠোর সমালোচনা।

ডেকে আমাদের পায় নাই কেহ সাড়া,
মরণ-কান্না উঠিয়াছে ঘরে ঘরে,
সুমুখে মোদের জ্বালায়ে দিয়াছে পাড়া—
দাঁড়ায়ে যে থাকে সেই একরূপ লড়ে।
সাজানো নগরী হল যে হত্যাগাব,
ফেরে লুণ্ঠন হিংসা ও আক্রোশ,
মোদের ছিল না কিছুই কি করিবার,
ভগবান কাছে আমরা কি নির্দোষ?

(শান্তিরক্ষক। কাব্যসম্ভার পৃ ৩২৮)

এ যেন ১৯৪৬ সালের কলিকাতার হত্যাকাণ্ড ও দেশবিভাগের পর তামসিক দাঙ্গার সময় ভারতীয় ক্লৈব্যের বিরুদ্ধে শুদ্ধ হৃদয়ের কঠিন আক্ষেপ। যারা এই মহাপাপ করে বেড়িয়েছে কবি তাদেরও ছেড়ে কথা বলেন নি—

বনস্পতির রাজ্যে দেখছি বিষবৃক্ষের ভিড়,
ধূমকেতু আর উল্কায় ভরা নভ,
সাধু ধিক্কৃত দুষ্কৃতিদল দম্ভে উচ্চশির,
দারুণ মর্মবেদনা কাহারে কব?
এই ধরাতলে মানবের রূপে এসেছেন ভগবান
প্রেমানন্দেতে হৃদয় উঠে যে ভরি,
সুমুখে আমার হতে যে দেখিনু মানুষকে শয়তান
স্ফুরে না বচন—গোপনে গুমরি মরি।

(পরিবর্তন। কাব্যসম্ভার পৃ ৩২৯)

কুমুদরঞ্জনের চরিত্রের দুইটি বিভিন্ন দিক ছিল। একদিকে তিনি তৃণাদপি সুনীচ, দূর্বাঘাসের মতো সহনশীল, বৈষ্ণব দীনতায় ভরা, অন্যদিকে তিনি বজ্রাদপি সুকঠোর, অন্যায়ের অকুতোভয় সমালোচক। ইংরেজকে 'চোপরও' বলা ও ভণ্ড দেশপ্রেমিককে 'শয়তান' বলার সৎসাহস খুব কম কবিতায় দেখেছি।

শিক্ষক সুলভ মনোবৃত্তি কুমুদরঞ্জনের চরিত্রে চিরস্থায়ী হয়ে গিয়েছিল। তাই দোষ দেখলে যেমন তাঁর কাব্যে তিরস্কারধ্বনি গর্জ্জন করে উঠত, গুণ দেখলে তেমনি প্রশংসাবাদ গুঞ্জরণ করে উঠত। যে ব্রিটিশ বিচার প্রহশনকে তিনি তীব্র কশাঘাত করেছিলেন, সেই ব্রিটিশদের ভারত ত্যাগ কালে তিনি বিদায় আরতি রচনা করলেন—

হয়ে বিতাড়িত, লাঞ্ছিত, হৃত, অনেক জেতাই যায়
তুঁষের ধোঁয়ায়, কুলায় বাতাসে,—নাহি গৌরব তায়।

তোমরা যেতেছ—মহা উল্লাসে করিয়া সমর্পণ।
যোগ্য হস্তে নবীন ভারত—ভাগ্য অসাধারণ।
ন্যাসের মতন ছিল এ ভারত, করি প্রত্যার্পণ
জানাইয়া দিলে নহ তুমি চোর—সত্যই মহাজন।
(ব্রিটিশের বিদায়ে বিদায়-আরতি। শ্রেষ্ঠ কবিতা পৃ ৩৪)

এ যেন মাথরুণ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী সভায় পুরস্কৃত ছাত্রদের আশীর্বাদ জানাচ্ছেন। ইংরেজ যাই হোক, তারা ভারতীয় কৃষ্টির ভোল পালটে দিয়েছিল। ভারতীয় খাঁটি সোনাতে পাশ্চাত্য খাদ মিশিয়ে গিনি সোনায় পরিবর্তন করে, অনেক সহনশীল ও কার্যক্ষম করে দিয়েছে। ইংরেজ শাসনের যুগ ভারতীয় ইতিহাসের এক অঙ্গ হয়ে গিয়েছে। তারা ভারত ছাড়লেও, ভারতের সঙ্গে পশ্চিমের সংযোগ অব্যাহতই রয়ে গিয়েছে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলতে ইচ্ছা হয়। দেশশাসনের ক্ষমতা হাতে পেয়ে, কোনো এক রাজনৈতিক দল, কিছুকাল আগে এদেশ থেকে ইংরেজ শাসনের চিহ্ন অবলুপ্তির প্রচেষ্টা শুরু করেছিলেন। এই চেষ্টার বাহ্যরূপ নিয়েছিল যত্রতত্র থেকে ইংরেজ রাজপুরুষদের প্রতিমূর্তির অঙ্গহানি করা বা অপসারণ করা। ইতিহাস পুস্তকের পাতাছিঁড়ে চিরন্তন ইতিহাস যে বদলানো যায় না, এ কথা তাঁরা বোঝেন নি। এই ঐতিহাসিক মূর্খতার যুগে কুমুদরঞ্জনের 'বিদায় আরতি' দেশপ্রেমিক ঐতিহাসিকের প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গিতে লেখা বলে মনে হয়।

পল্লীগ্রামের বাইরে কুমুদরঞ্জনের যে বৃহত্তর দুনিয়া ছিল তারই সামান্য চালচিত্র আমি তুলে ধরলাম। আশা রইল কোনো সমর্থ লেখনী এই চালচিত্রের মধ্যে কুমুদরঞ্জনের ধ্যানলব্ধ দেশমাতৃকার মূর্তি রূপায়িত করে পাঠকের আনন্দবর্ধন করবেন।

পিতৃস্মৃতি

জ্যোৎস্নানাথ মল্লিক

কুমুদরঞ্জন ও কিপ্‌লিং

পঞ্চাশ বছর আগে বাবা তখন স্কুলের প্রধান শিক্ষক, আমি সেই স্কুলে ছাত্র। ছাত্রাবাসে বাবা আমি ও আরও দুজন ছাত্র একটি ঘরে থাকি। ইংরাজি সাহিত্যের সঙ্গে আমার পরিচয় করে দিতে বাবা তখন ব্যস্ত' ছোটদের সেক্সপিয়ার ও ডিকেন্স্‌ পড়ানো হয়ে গেছে। মূল রচনা থেকে Shakespeare, Dryden, Pope, Gray, Goldsmith, Scott, Wordsworth, Shelley, Keats, Burns, Tennyson পড়ানো চললো। গদ্যে—Swift, Bacon, Addison, Burke, Scott, Lamb, Dickens, Macaulay, Hazlitt, Ruskin, Carlyle, Oscar Wilde, Victor Hugo ও Dumas এইসময় বাবার সঙ্গে পড়া হয়। Milton এর কাব্য একটু পরে পড়ানো হল। রাজসংস্করণের—সুইন্‌বার্ন ও কিপ্‌লিং এর রচনাবলী স্কুলের লাইব্রেরীতে আসতে দেখি। বাবার কিপ্‌লিং পড়া আরম্ভ হ'ল। তাঁর যখনি যে অংশ ভালো লাগতো অমনি আমাকে পড়াতেন—কতটা বুঝতে পারবো আগে থেকে ঠিক করে নিয়ে শুধু স্কুলের ছাত্রের উপযোগী অংশগুলিই সব পড়ানো হতো না। ছাত্রদের সঙ্গে সাহিত্যের রসাস্বাদনে তাঁর কোনো অসুবিধা হতো না।

কিপ্‌লিং-এর সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী বাবা পড়েন। বহু কবিতা, গল্প ও গদ্য-রচনা আমাকে পড়ান। একটি হাসির গল্প 'জার্মকিলার' (Germkiller) আমাকে ও অনেককে পড়ে শোনান। কয়েকবারই পড়া হয়। হাসির রোল মনে পড়ে। সাম্রাজ্যবাদী ও 'ফিলিস্টাইন' কবি কিপ্‌লিং তখন ভারতে ও ইংরাজের কাছেও অপ্রিয়। কিন্তু তিনি বাবার প্রিয় কবি। বাবার বন্ধু J. G. Drummond I. C. S. অবসর গ্রহণ করার পর Aberdeen বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার অধ্যাপক হন। রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি' তিনি অনুবাদ করেন। বাবার 'অজয়' কাব্যগ্রন্থ তাঁকে উৎসর্গ করা হয়েছে। তাঁর সঙ্গে বাবার এই কিপ্‌লিং প্রিয়তা নিয়ে আলোচনা হয়। Drummond-এর চিঠিগুলি সবই প্রায় অজয়ের বন্যায় নষ্ট হয়ে যায়। কিপ্‌লিং-এর ছন্দ চাতুর্য, ঐতিহাসিক কল্পনা, জীবনে একটি নীতিবোধ, সূক্ষ্ম ভগবৎ বিশ্বাস, পরিহাসপ্রিয়তা, গদ্যকথার মিল মাধুর্যে ঘটনার বর্ণনা, ব্যক্তির ও স্থানের নামের ছন্দবদ্ধ বহুল ব্যবহার বাবাকে আনন্দ দিত। সমসাময়িক কোনো ঘটনা দুজনেরই চোখ এড়াত না।

একজন কবির আর-একজন কবির ওপর প্রভাব নানাভাবে ঘটে থাকে —কোথাও ছন্দ, কোথাও ভাব, কোথাও রচনাশৈলী, কোথাও অনুকরণ,

অনুসরণ, অনুবাদ বা অনুরণন। কিপ্‌লিং পড়ার আগে বাবার কবিতায় ব্যক্তির ও স্থানের নামের ছন্দবদ্ধ গ্রথন চোখে পড়ে না। কট-এর ব্যালাড্‌-এ এই ধরনের বিশেষ্য ব্যবহারের কাব্যময় চাতুর্য আছে। কিপ্‌লিং-এর কবিতায় এর বহুল ব্যবহার এবং ছন্দময় সম্ভাবনা ও সাফল্য দেখা যায়। এই শব্দ ঝংকারের প্রভাব বাবাকে স্পর্শ করে। নীচে বাবার ও কিপ্‌লিং-এর কবিতা থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলাম অবশ্য নগর ভূধর অরণ্যানী ফল ফুল নদ নদীর নামকরণ যে সব আদিম ও অনামী কবি করেছিলেন তাদিকে কিপ্‌লিং কোন নমস্কার জানিয়েছিলেন বলে জানা নেই।

দাবী—টার্কি কি টাস্‌খন্দ্‌ টোকিও কি মস্কো,
কানাডা কি কেন্‌টাকি যেথা হোক্ বাস গো।

কবি কথা—'সীগম্যানরী'র দাপট দেখেছ? মালান ম্যালেনকফকে মানো?
'রোজেনবার্গে'র মৃত্যুদণ্ড কেন দিল তার কারণ জানো?
থাকো ছন্দের ঝুমঝুমি নিয়ে; সুরের সোহাগ কথার ধূমে,
খপর নাওনা কিযে করিছেন, 'হো চিনমিন' আর মা'ও সেতুঙে?
'আইসেন হাওয়ার' হাওয়ায় যে বীজ বপন করেন আনন্দেতে
দেখো না হয়ে তা আফিম ফুল যে, ফোটে কোরিয়ার তুষার ক্ষেতে?
ইরান খনিতে কি তেল উঠিছে? সুয়েজে নাসের কি খেলা খেলে
জানো কি কেজনে সাগর বাঁধিছে ফরমোসা দ্বীপে কাঠবিড়ালে?
ওই সব নিয়ে নাটক লেখো না, লাগাও উপন্যাসের কাজে
কবিতা লিখো না, বকো না বাজে।'

কঃ পন্থা—'কেপুয়া কোরিয়া, কোজো, কেনিয়ার বিশেষ প্রভেদ নাই,
কাজ করিতেছে একই সভাতাই।'

ক্লাইভ ষ্ট্রীট—'বোস্টন হতে ব্লাডিভোস্টক, কাণ্টন হতে লণ্ডন,
কোবো হতে কীল বোঁর্দো ট্রিসটী, লাভালাভ করে বণ্টন।'

টরে টক্কা—'টক্কা টরে টরে টরে টরে টক্কা
সিগ্‌নেল পলকেতে মস্কো কি মক্কা।
হামবার্গ মাণ্টা
সিড্‌নি কি সাংহাই মালদ্বীপ লঙ্কা।'

জজের জুরী—'গীধ গ্রাম হতে গোমোস্তা এলো নায়েব নরজা হতে
কর্জনা তার করকে পাঠালো খাঁকে পাঠালো ঘতে।"

বাঙালী—'তিরাই এর জঙ্গলে বিপাশার বুকে সে,
বর্মার তেলকলে মেঘনার মুখে সে।
পেশোয়ারে তার ঘরে, কুমারীতে কেরাণী
কোয়েটায় ধুলি খায় কি কঠিন পরানই।
গুজরাটে ডাক্‌বাবু লুণ্ডীতে পোদ্দার,

চিত্রালে দেনদার নাই তার উদ্ধার।
কোথা মেসোপোটামিয়া বোগদাদ কোথারে
সিন্দবাদ বাংলার সেইখানে উতারে।
ট্রিনিদাদ—কাছে আজ, কাছে আজ কেনিয়া
বাংলার ছেলে আজ ব্যাংককে বেনিয়া।'

গতকাল—'কাল তুমি আহা রাজ্যভ্রষ্ট দুর্গেতে কাইজার
কাবুল তক্ত সরিয়া গিয়াছে কোথা আমানুল্লার।'

Fuzz-Wuzzy—'We took our chanst among Kyber' ills,
The Boers knocked us silly at a knile,
The Burman give us Irriwaddy chills
And a Zulu *impi* dished us up in style.

Shilling A Day—
'My name is O'kelly, I've heard the Revelly
From Birr to Bareilly, from Leeds to Lahore
Hong Kong and Peshawar
Lucknow and Etawar
And fifty five more all end'in in pore'.

এ ছাড়া বাবার ঐতিহাসিক কল্পনা বা অনুভূতির ঐতিহাসিক চেতনা, কিপ্‌লিং-এর অনুরূপভাবের কবিতায় রসসমর্থন ও পুষ্টি লাভ করে। সামান্য ও সাধারণ জিনিসও সামাজিক প্রকরণে ও ব্যবহারে একটি কাব্যময় সত্তায় মণ্ডিত হতে পারে। কিপ্‌লিং-এর 'Files', 'The Song of the Banjo' বাবার 'কাগজ', 'গোপীযন্ত্র'—একই জীয়ন-কাঠির স্পর্শে ধন্য। 'Tinka-tinka-tinka-tinka-tink' ও 'বাজিয়ে যাবো গাব গুবাগুব' ভিন্ন প্রকৃতির দুই কবির ভিন্নবাদ্যযন্ত্রে ভিন্নসুর কিন্তু তার কাব্যরূপ একই ধরনের। বিভিন্ন কর্মের ও পেশার সামাজিক সার্থকতা ও গৌরব দুজনের কাছেই কাব্যের বস্তু। কিপ্‌লিং-এর 'Sappers' ও বাবার 'পি ডব্লিউ-ডি' একই ধরনের।

বাবার সঙ্গে যে সব কবিতা পড়ি তার মধ্যে মনে পড়ে কলকাতা সম্বন্ধে 'A Tale of Two Cities', বুয়ার যুদ্ধ সম্বন্ধে The lesson, এবং Galley Slave, Mesopotamia, Recessional, The Secret of the Machines, Gunga Din The White Man's Burden, The Thousandth Man, Sussex, The Ballad of East and West। শেষোক্ত কবিতার 'Oh East is East and West is West and never the twain shall meet' বাবা কোনদিনই পছন্দ করেন নি। 'অজয়'এর মুখবন্ধে Burns-এর কবিতা ও তার অনুবাদ এবং J. G. Drummond কে উৎসর্গ করা কবিতায় এর প্রতিবাদ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।...

"For a' that, and a' that
It's coming yet for a' that
That man to man, the world o'er,
Shall brothers be for a' that. (Burns)
সুখের সময় আসছে ওগো, স্বপ্ন নয় ক' সত্যি এ,
সকল জাতি নিকট জ্ঞাতি ভরবে ধরা আত্মীয়ে। (অনুবাদ)

বন্ধুবর ড্রামণ্ডকে লেখা কবিতায় এই মিলনের কথা—

'দুই জনাতে প্রথম মিলন অজয় নদীর তীরে,
ওকের সাথে আকন্দেরি দেখা,
ভাসলো ভ্রমর দহের ভেলা স্কটিশ লকের নীরে
সারঙ হলো ব্যাগপাইপের সখা।'

'আই সি এস' কবিতায় কিপ্‌লিং-এর এই পূর্ব পশ্চিমের চির অনৈক্য বোধ সম্পর্কে একটু মৃদুব্যঙ্গ প্রকাশ পেয়েছে।

'একই দরের ষ্টিল, দেশী ও বিদেশী নাম
টাটানগরের সাথ মিলেছে বার্মিংহাম।
দেয় ডোভারের ক্লিক, ছিমসিরি করে কর
মিলেছে টুইড টেম্‌স মেঘনা ও দামোদর।
মিলনের খুসরোজ, ফুলেদের প্রীতিভোজ
টগর নাগেশ্বর অর্কিড, প্রিমরোজ।
পূব পশ্চিম দুই হইয়াছে একাকার
তাজমহলের পাশে ওয়েষ্ট মিনিষ্টার।
কাঁদে বুঝি কিপলিং হেরি এই সমাবেশ
ভারত সেবাব্রতী তোমরা আই সি এস।'

১৩৭০ সালের 'যষ্টিমধু'র আশ্বিন সংখ্যার 'শুভদিন' কবিতায় কিপলিংএর ঐ কথাটির প্রতি শ্লেষাত্মক কটাক্ষ আছে।

'দুর্দিনেও সুদিন আসে হলে হরির ইচ্ছে,
এবার নিবিড় মিলন হবে প্রাচী ও প্রতীচ্যে।
প্রতিক্রিয়া ভালোই হবে কিপলিং-এরও চিত্তে,
যদিও তায় প্রমাণ হবে বাণী তাহার মিথ্যে।
মার্কিনী বউ ঘুঁটে দেবে, ঢেঁকীতে ধান ভান্‌বে,
ভলগা তীরের মেয়ে এসে, গঙ্গাতে ঘট আন্‌বে।'

Reformers কবিতায় আছে—

'Not in the camp his victory lies
or triumph in the market place

Who is his nations sacrifice
To turn the judgement from his race.'

বাবা 'কবি'র সম্বন্ধে এই উক্তিটি প্রযোজ্য বলেছিলেন। কিছুদিন আগেও কলা নবগ্রামের শিক্ষা নিকেতনের অভিভাষণে পল্লীগ্রামের দেবধর্মী সেবক ও সাধকদের উদ্দেশে এই পঙক্তিটির উল্লেখ করেন। কিপলিং-এর Sussex কবিতার মূলসুর—

Each to his choice and I rejoice
The lot has fallen to me
In a fair ground in a fair ground
Yea Susserx by the sea.

বাবার 'উজানি আর অজয় আমার প্রাণের সামগ্রী' কবিতায় আরও গভীর, ব্যাপক ও তীব্র হয়ে উঠেছে।

'কিন্তু মায়ার কীট যে আমি বলতে পারি কি
উজানি আর অজয় আমার প্রাণের সামগ্রী
ক্রুদ্ধ কেহ হবেন নাক ক্ষম্য অভাজন
ক্ষুদ্র গ্রামের চৌসীমানায় রুদ্ধ আমার মন।
অভয় মানি মনের কথা বলতে পারি কি
উজানি আর অজয় আমার প্রাণের সামগ্রী।'

১৯২৩ সনে বাবা জম্মু ও কাশ্মীর বেড়াতে যান। 'গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড্' প্রভৃতি কবিতা ঐ সময় লেখা। বর্ণনায় ও শব্দবিন্যাসে কিপলিং-এর প্রভাব দেখা যায়। অনেকদিন পরে কিপলিং সম্বন্ধে আলোচনার সময় বলেন যে কিপলিংএর Mandalay কবিতা 'জলন্ধরের পথে' কবিতা লেখার সময় মনে ছিল। কিপলিংএ পাই—

'Er petticoat was yaller an' er little cap was green'
আর 'I have a neater, sweater maiden in a cleaner,
greener land !
On the road to Mandalay.'

এরা নূতন রূপ পেলো স্নিগ্ধ, শান্ত, মধুর ছবিতে—

'এমন সময় কে ও এলো হরিণ নয়না
কাঁচা সোনার ঢেউ খেলিয়ে, কথাটি কয় না।
সেথায় পেলাম হলুদ পরীর হঠাৎ দরশন
জালন্ধরের পথে আমার আজো বেড়ায় মন।
সেথায় আমার আটকে গেল এ দুটি নয়ন
জালন্ধরের পথে আমার ঘুরে বেড়ায় মন।'

কিপলিং‌এ 'when the mist was on the rice fields an' the sun was dropping slow', বাবার কবিতায়—

'ঝাপসা দিনের সন্ধ্যাবেলা শোভায় উজলি।'

আর একটি হালকা সুরের কবিতা 'রেঙ্গুন রঙ্গিনী'তে অওালে বসে ম্যাণ্ডালের জন্য খেদে কিপলিং‌এর কবিতার ছায়া চোখে পড়ে।

আমি তখন ম্যাট্রিকুলেশন পাস করি নি। আরও বছর খানেক বাকি। ঐ সময় ইংরাজি কবিতা পড়ে শোনানো হলে, তার সারমর্ম লিখতে হতো। কিপলিং‌এর দুটি কবিতা মনে পড়ে 'If' এবং 'Mother o' Mine'। আমি যখন সারমর্ম লিখছি ইংরাজিতে, বাবা তখন পাশে বসে কবিতা লিখতেন। 'If' কবিতা হতে বাবার 'যদি' কবিতা হলো।

কিপলিং‌এর 'If you can keep your head when all about you,
Are losing theirs and blaming it on you.

বাংলায় আরম্ভ হল– 'যদি তুমি বশে রেখে দিতে পার
চঞ্চল তব চিত্তকে।'

'Or being lied about, don't deal in lies
Or being hated, don't give may to hating
And yet don't look too good, nor talk too wise.'
'না হয়ে ঘৃণিত, ঘৃণা সহ যদি নিন্দা না কর নিন্দুকে,
বড় করে যদি নিজ চোখে দেখ নিজ ক্ষীণ দোষ বিন্দুকে।'

কিপলিং-এর 'If' শেষ হল—

'Yours is the Earth an everything that's in it,
And which is more —You'll be a man, my son'

'যদি' শেষ হলো—

'বুঝিবে তখন মানুষ হয়েছ ঝরিছে করুণা মস্তকে
পরশ মাণিক এসেছে সুমুখে পেতে দিও দু'টি হস্তকে।'

এ অনুবাদ নয় কাব্য পাঠে অনুপ্রেরণার শিখায় নূতন আলো জলে ওঠা। নূতন কবিতা হল। তবু ইংরাজি কবিতার অনুসরণ করে লেখা কবিতার সম্পর্ক জ্ঞানে একটা নূতন আস্বাদ পাওয়া যায়। এর পরেই আর একটি সমভাবাপন্ন কবিতা রচিত হয় 'কিন্তু'—

'কিন্তু তুমি তাদের ভয়ে শঙ্কিত হও যদি—
আপনারে আপনি দেবে ফাঁকি,
দেবতা দানব যা খুশী তাই পারবে তুমি হতে
মানুষ হবার অনেক তোমার বাকি।'

একদিন পড়ালেন কিপলিং-এর 'Mother O' Mine'

"If I were hanged on the highest hill,

Mother O' mine, O' mother O' mine
I know whose love would follow me still
Mother O' mine, O mother O' mine!
If I was drowned in the deepest sea,
Mother O' mine, O mother O' mine!
I know whose tears would come down to me
Mother O' mine, O mother O' mine'
If I was damned ot body and soul
I know whose prayers would make me whole
Mother O' mine, O' mother O' mine!

আমার ইংরাজি কবিতার সারমর্ম লেখা শেষ, বাবারও কবিতা লেখা সম্পূর্ণ।

'মা গো আমার ওগো আমার মা'
'যদি উজল চাঁদ বলে কেউ উর্দ্ধে আমায় তোলে
মা গো আমার ওগো আমার মা
জানি তুমি আকাশ হবে করতে আমায় কোলে
মা গো আমার ওগো আমার মা।
সাগর জলে ফেলেই যদি মুক্ত আমায় করে
মা গো আমার ওগো আমার মা
শুক্তি হয়ে থাকবে তুমি বুকের মাঝে ধরে
মা গো আমার ওগো আমার মা।
নিজের ছায়া সঙ্গ ছাড়ে এলে দুখের নিশি
মা গো আমার ওগো আমার মা
তোমার মায়া দুঃখে সুখে সঙ্গে থাকে মিশি
মা গো আমার ওগো আমার মা।
পঙ্কে যদি ডোবে আমার আত্মা এবং দেহ
মা গো আমার ওগো আমার মা
আবার মোরে পদ্ম করে ফোটাবে এই স্নেহ
মা গো আমার ওগো আমার মা।'

এখানেও অনুবাদ সামান্য। অনুকরণ আছে। চিত্র কল্পনা ভিন্ন। তবু ইংরাজি কবিতাটি পাঠেই এক সম-অনুভূতির প্রেরণায় সমসুরে 'আমার মা' এই বাংলা কবিতাটি রূপ পায়। ইংরাজি কবিতা অনুসরণ করে এই কবিতাটি লেখা। এই তথ্য কিংবা ইংরাজি কবিতাটি না জানলেও বাংলা কবিতাটির কাব্যরসাস্বাদনে কোনো ব্যাঘাত ঘটে না। তবে দুটি কবিতা তুলনা করলে ও তাদের সম্বন্ধে জানা থাকলে, কবির কাব্য-রচনা কৌশল, সাধারণ অনুভূতির

অসামান্য প্রকাশভঙ্গি ও কাব্যরূপের বৈশিষ্ট্য সম্যক ভাবে উপলব্ধি করা সহজ হয়।

২

কুমুদরঞ্জনের দিনলিপি

Andre Gide-এর Journals কি Camus এর Carnets এর মত বাবা তাঁর ভাব ভাবনার কি সমসাময়িক ঘটনাবলীর ও কার্যকারণের কোনো ধারা বাহিক রোজনামচা রাখেন নি। Maugham-এর Writer's-Handbook এর মত কোনো রচনার, বিষয়ের বা চিন্তাধারার বৈজিক সংগ্রহণ, সংরক্ষণ, ব্যাখ্যান বা আবিষ্কারের বিবরণ দেখা যায় না। এখানে রবীন্দ্রনাথের 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি' বা 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি'র অপূর্ব দৃশ্য বর্ণনা, গল্পকথন বা কাব্যসৃজন নেই। ডায়ারি লিখতে পারব না বলেও রবীন্দ্রনাথ যে ডায়ারি রেখে গেছেন তা বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

কিছু কিছু লেখা বাবার চারখানি ডায়ারি পাওয়া যায়। একটি ইংরাজিতে লেখা ১৯২৩ সনের খানিকটা অংশের আর তিনটি ১৯৫৯, ১৯৬২ ও ১৯৬৯ সনের। শেষের দিনলিপিগুলি একজন ভাবলোকের যাত্রীরই পরিচয় দেয়—কোনো অন্তর্লোকের তীর্থে তীর্থে চলার কথা—ভাবজীবনের পথনির্দেশ, ভাগবত জীবনের সংকেত আর স্বর্গ মর্ত্যের সেতুচিহ্ন। ভাবুক হৃদয়ের প্রতিদিনের জপমন্ত্রেই যেন দিনগুলির সার্থকতা। লিপিবদ্ধ করার, স্মরণ করার, বর্ণনা করার যোগ্য আর কিছুই যেন নেই। সামান্য কাজের কথা যা আছে তাও কর্মারতির কথা।

'জপের সময় ঠিক থাকে না—হরিনামও কচিৎ করি
কিন্তু এখন সারা দিবস ভগবানের দেউল গড়ি।'

এই সময় বাবা শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের মন্দির নির্মাণ কাজে ব্যস্ত। ১৯৫৬ সনের বন্যায় মাটির মন্দির পড়ে যায়। আমাদের বাড়িও পড়ে যায়। বাবা তাঁবুতে থাকেন, গ্রাম ছাড়েন নি। পরের বছর শ্রাবণ মাসে নবনির্মিত গৃহে প্রবেশ করেন। মন্দিরের কাজ আগে হাতে নিতে পারেন নি—শীঘ্র করবেন বলতেন। ততদিন আর একটি অস্থায়ী মাটির ঘরে মন্দিরের কাজ চলে। ১৯৫৯, ২১শে জানুয়ারী ডায়ারিতে লেখা—'ক্ষন্তব্যো মে অপরাধঃ। শ্রীশ্রীলোচনদাস ঠাকুরের মন্দিরের ভিত আরম্ভ।' ১৯৫৯, ৯ই ফেব্রুয়ারী—'তোমার চরণ ধুলায় ধুলায় ধূসর হবো। লোচন শ্রীমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন—শ্রীযশোদানন্দ ঠাকুর।' ১৬ই জুন লেখা—'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে সাভ্রেস্নিভস্থল কমলিনী ন প্রবুদ্ধাং ন সুপ্তাম। পূর্ণতা গৌরবায়। শ্রীশ্রীলোচনদাস ঠাকুরের মন্দির ছাদ ঢালাই হইল। একটি পরম তৃপ্তির দিন।'

১১ই ডিসেম্বর 'শ্রীশ্রীলোচনদাস ঠাকুরের সমাধি নূতন ভবনে আনা হইল। সংকীর্ত্তনের সহিত। সর্ব্বং শুভায়ভবতু।'

১৭ই ডিসেম্বর—'অদ্যংমে সফলং জন্ম অদ্য মে সফলা ক্রিয়া। নারায়ণ-প্রসীদতু। শ্রীগৌরাঙ্গের বেদী ও শ্রীশ্রীলোচনদাস ঠাকুরের সমাধি।' বছরের অন্যদিনগুলিতে কোনো মন্ত্র কি কবিতার কোনো ছত্র কি পঙক্তি লেখা। সংসারের প্রতিটি কাজ করে গিয়েছেন, প্রতিটি খরচের হিসাব রেখেছেন—ডায়ারিতে তাদের স্থান অল্প। বেশির ভাগই ভাবের কথা, যদিও এই মন্দির নির্মাণ, গৃহ নির্মাণ কাজের মধ্যেই 'কর্মারতি' কবিতাটি লেখা।

'অনেককিছু ভাবার চেয়ে অল্প কিছু করাই শ্রেয়,
সকল কাজই তাঁহারি কাজ নয় কোন কাজ অশ্রদ্ধেয়'।

নীচে ১৯৫৯ সনের প্রথম তিন মাসের ডায়ারির লিপিবদ্ধ বিষয় উদ্ধৃত করলাম।

১লা জানুয়ারী ১৯৫৯—প্রিয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্ব যশেশ্বরো হরি:
অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু।
শ্রীশ্রীমংগলীমা, শ্রীশ্রীকমলে কামিনী। শ্রীখণ্ড

(ঐদিন শ্রীখণ্ডে গিয়াছিলেন। মংগলীমা, মঙ্গলচণ্ডী মায়ের সংক্ষিপ্ত উচ্চারণ, যা তাঁর এক ছোট নাতনী (গাবু) আমাদের বাড়িতে চালু করে।)

২রা—সিরাম্বয়ং মাং জগদীশ রক্ষ।
পিতা ধর্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।

৩রা—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।
দাসোহং শরণাগত করুণয়া বিশ্বেশ্বরী ত্রাহি মাম্

৪ঠা—সর্ব্বসম্ভবায় গোবিন্দায় নমঃ

৫ই—বহুরূপায় বিষ্ণবে নমঃ।
যৎকরোসি জগন্মাত স্তুদেব তব পূজনম্।

৬ই—রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।

৭ই—স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতোভয়াৎ।

৮ই—নহি কল্যাণকৃৎকশ্চিৎদুর্গতিং তাত গচ্ছতি।

৯ই—ন মে ভক্ত প্রণশ্যতি।

১০ই—মহালক্ষ্মী প্রসীদতু

১১ই—রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম।

১২ই—শ্রীকান্ত বিষ্ণোভবদাজ্ঞৈব
সংসার যাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে।

১৩ই—গুরুভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষীঃ নিবাসঃ স্মরণং সুহৃদ।

১৪ই—তস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্ট, প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ।

১৫ই—ওঁ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গ দেবস্য ধিমহি ধিয়োজন প্রযোজয়াৎ।

১৬ই—ক্ষপয়তু মে পুনর্জন্ম নীললোহিত'। ('বিদায় বেলা' কবিতায় এই প্রার্থনা দেখা যায়। 'ক্ষপয়তুপুনর্জন্ম'—হে নীললোহিত কান্ত— যাত্রাপথটি কর আমার সুন্দর শিব শান্ত'। ১৯৬২ সালে নীল লোহিত নামকরণে শিবের মন্দির কোগ্রামে প্রতিষ্ঠা করেন।)

১৭ই— নমামি শিবং শিব কল্পতরুম্ শিবাস্তে পন্থাঃ

১৮ই—জগন্নাথ স্বামী নয়নপথ গামী ভবতু মে।

১৯শে— করতু মম সুপ্রভাতং

২০শে—প্রণতস্মি দিবাকরম্। এসেহ জ্যোতির্ম্ময়, জয়তু জয়তু জয়।
(প্রতিদিন প্রভাতে উদীয়মাণ সূর্য কে প্রণাম ও সূর্য্যস্তব করতেন।)

২১শে—ক্ষন্তব্যো মে অপরাধঃ।
শ্রীশ্রী৺ লোচনদাস ঠাকুরের মন্দিরের ভিত আরম্ভ।

২২শে—এ বিশ্বমাঝে যেখানে যা সাজে
তাই দিয়ে তুমি সাজিয়ে রেখেছ।

২৩শে—জগৎ তৃপ্যতু

২৪শে—যৎ পূজিতং ময়া দেব পরিপূর্ণং তদস্ত মে।

২৫শে—ম্যায় চাকর রাখো জী।

২৬শে—দুর্গতি নাশিনি দুর্গে লোকে তোমায় বলে মা শুনি।
লোচন মন্দির ৫ই হইতে ১২ই মাঘ খরচ ৩৩৲ টাকা মাত্র আমার দেওয়া। ৩৩৲

২৭শে—সদানন্দময়ী কালী মহাকালের মনমোহিনী

২৮শে—বাজিকরের মেয়ে শ্যামা যেমন নাচাও তেমনি নাচি

২৯শে—ছিন্নতুষারের প্রায়
বাল্যবাঞ্ছা দূরে যায়,
তাপ তপ্ত যৌবনের ঝঞ্ঝাবায়ু প্রহারে
পড়ে থাকে দূরাগত
জীর্ণ অভিলাষ শত
ছিন্ন পতাকার মত ভগ্ন দুর্গ প্রাকারে।

৩০শে—আপনাতে আপনি থাক মন যেওনা পরের ঘরে।
যা চাবে এইখানে পাবে খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।

৩১শে—জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতী পরমেশ্বরৌ।

১লা ফেব্রুয়ারী—ভজহুঁ রে মন শ্রীনন্দনন্দন অভয় চরণারবিন্দরে।

২রা—কোথায় সেজন জানে কোন জন? যেজন সৃজন লয় করে?

৩রা—ভবে সেই সে পরমানন্দ যে জন পরমানন্দময়ীরে জানে।

৪ঠা—যখন যে ভাবে হরি রাখিবে আমারে,
সেই সুমঙ্গল যেন না ভুলি তোমারে।
৫ই—কোন্ ভরি পিচ্কারী মারি ম্যায় তো শাড়ী ভিজগয়ী।
৬ই—জনম অবধি হাম রূপ নেহারিণী নয়ন না তিরপিত ভেল।
৭ই—সুজনকো দুখ দিবস দুই চারি
৮ই—জয়তু জগন্মঙ্গল হরিনাম।
৯ই—তোমার চরণ ধুলায় ধুলায় ধূসর হবো।
লোচন শ্রীমন্দিরের ভিত্তিস্থাপন—শ্রীযশোদানন্দ ঠাকুর ৫৫।।৶৹
১০ই—আমার মাথানত করে দাও হে তোমার চরণ-ধূলার তলে।
১১ই—প্রাসীদ দেবেশ জগন্নিবাস।
১২ই—দাসেরে অমর বর দাও তুমি সুবরদে! শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা
১৩ই—পুনরাগমনায়
তুমি এসো আবার এসো সর্ব্বশুক্লা সরস্বতী।
১৪ই—পূর্ণতা গৌরবায়। ৫২।।৶৹
১৫ই—দেহি সৌভাগ্যমারোগ্যং দেহি দেবি পরম সুখং।
১৬ই—A thing of beauty is a joy for ever
রূপের জিনিষ চিরদিনের আনন্দ।
১৭ই—তোমারি গরবে গরবিনী হাম রূপসী তোমার রূপে
১৮ই—হরি বিনা জ্ঞান মিছে, হরি বিনা ধ্যান মিছে।
হরি বিনা প্রাণ—সে তো জীবনে মরণ।
১৯শে—হবে সেই সে পরমানন্দ যে জন্ম পরমানন্দময়ীরে জানে।
২০শে—গৃহেষু পঞ্চেন্দ্রিয় নিগ্রহস্তপঃ। নিবৃত্ত রাগিণঃ গৃহং তপোবনং।
২১শে—কত অজানারে জানাইলে তুমি কত ঘরে দিলে ঠাঁই ৪১।৹
২২শে—হৃদয় জুড়াইতে কোটি মে মিলয়ে একই
২৩শে—ভাবে সৃষ্ট এ ভুবন ভাব করে রূপ পরিগ্রহ
শক্ত বড় রূপ সাগরে ডুব দেওয়া।
২৪শে—এই সময়ে তারা তোমায় নিবেদন করে রাখি,
সে সময় পারি না পারি সচেতন থাকি না থাকি।
২৫শে—Nearer to Thee my God nearer to Thee.
(খ্রীষ্টান ধর্মসঙ্গীতটি অতি প্রিয় ছিল। Titanic জাহাজ ডুবির সময় এই সঙ্গীতটি সমবেত কণ্ঠে গাওয়া হওয়ায় তাঁর কাছে এটি অতি তীব্র মধুর প্রার্থনা ছিল।)
২৬শে—সম্মুখে সুনীল সিন্ধু ভাসে কৃষ্ণ পদতরী,
এ পারেতে সন্ধ্যা ঊষা অন্তপারে মুগ্ধকরী।

২৭শে—নাইকো আলাপ তোমার সনে
তবু দেখলে তোমায় চিনতে পারি।
২৮শে—সকল কাজের পাইহে সময় তোমারে ডাকিতে পাইনে।
২১ ২৩।৵০ বাকি ২।৵০
১লা মার্চ—জয় জয় দেব হরে গণেশায় নমঃ
২রা—হরি তোমার মাতৃরূপ সর্ব্বরূপ সার।
৩রা—তুমি আকাশে চকোর উড়াও দেখাও পূর্ণিমার বিধু
আবার ভুবন ভ্রমায় ভ্রমর বৃন্দে বনফুলে জোগায়ে মধু
৪ঠা—বন্দেমহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম
৫ই—ভজহুঁ রে মন শ্রীনন্দনন্দন অভয় চরণারবিন্দরে।
দুর্লভ মানুষ জনম সৎসঙ্গে তর এ ভব সিন্ধুরে।
৬ই—বেলা গেল তব পথ চেয়ে
৭ই—কিম্বিব হি মধুরানাং মণ্ডনং আকৃতি নাম
৮ই—হরিনাম কৃষ্ণ নাম বড়ই মধুর।
৯ই—চন্দন চর্চ্চিত নীল কলেবর পীত বসন বনমালী—
১০ই—তথাপি মম সর্ব্বস্বং রাম কমল লোচনঃ
১১ই—নয়ন খোয়ায়লু তব পদ লেখি,
নখর খেয়ায়লু তব নাম দেখি।
১২ই—বদন ভরে দেখবো শ্যামের শ্রীমুখ কমল একবার দাঁড়াইতে বল।
১৩ই—তাই মা তোমার কাছে এসেছি আবার।
১৪ই—পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে
ত্রিবেণী (ঐ দিন ত্রিবেণীতে ছিলেন)
১৫ই—কবে পরশমণি করবো পরশন
লৌহ দেহ মোর হইবে কাঞ্চন।
১৬ই—সর্ব্ববেদন মন্থন ধন অন্তরে ফিরে এসো।
(রবীন্দ্রনাথের 'আমার সব সুখদুখ মন্থন ধন, অন্তরে ফিরে এসো' স্মরণ করে লেখা। 'মেঘ ও রৌদ্র' তাঁর সবচেয়ে প্রিয় গল্প ছিল।)
১৭ই—মা আমায় ঘুরাবি কত?
১৮ই—এমন মানব জমি রইলো পতিত আবাদ করলে ফলতো সোনা
১৯শে—কারে সুখে রেখেছ হে সুখময়?
দেবকীর যে যাতনা দেব কি তার পরিচয়
২০শে—পূর্ণতা গৌরবায়
২১শে—যার মা আনন্দময়ী সে কি নিরানন্দে থাকে
২২শে—হাত জুড়ি গুরু হুঁ

২৩শে—আমি ভকত মহৎপদ রজ পিয়াসী
তাই চরণে লুটাতে শির ভাল যে বাসি।
২৪শে—চন্দন চর্চ্চিত নীল কলেবর পীত বসন বনমালি
২৫শে—শ্রদ্ধয়া দেয়ম্, শ্রিয়া দেয়ম, হ্রিয়া দেয়ম
ভিয়া দেয়ম্, সংবিদা দেয়ম।
২৬শে—মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব
আচার্য্য দেবোভব, অতিথি দেবোভব।
২৭ শে—সে যে বাণী অনুভব দূর!
২৮শে—আমি কৃষ্ণরূপে জগৎ দেখি
২৯শে—পুণ্যাহং
দিন ফুরায়ে যায়রে আমার দিন ফুরায়ে যায়!
৩০শে—তুই কি ভেবে দেখেছিস তাকে?
যে প্রত্যহ তোর খোরাক পোষাক পাঠিয়ে দিচ্ছে তাকে?
৩১শে—খোদা দেনেওয়ালা মঙ্গলময় হরি

এই ভাবে দিনের পর দিন কোনো প্রার্থনা, কোনো গান, কোনো কবিতা হতে একটি উক্তি দিয়ে দিনগুলিকে চিহ্নিত করা। কোথাও স্বরচিত কবিতার পংক্তি। এই বৎসরের ডায়রিতে বন্যার কথা কিছু পাওয়া যায়।

২রা অক্টোবর—প্রলয় পয়োধি জলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিত বহিত্র চরিত্রমখেদং
কেশবধৃত মীন শরীর জয় জগদীশ হরে। দারুণ বন্যা
৩রা অক্টোবর—ওমা দিগম্বরী নাচ গে
ভয়াল বন্যা। বন্যার জলের ভীম কল্লোল
অতি প্রচণ্ডমূর্ত্তি। হাঁটু জলে দাঁড়াইয়া রাত্রি যাপন।
৪ঠা অক্টোবর—বন্যার জল কমিতেছে
দুখেই পরম সুখে আছি
যার মা আনন্দময়ী সে কি নিরানন্দে থাকে
৫ই অক্টোবর—গ্রামে থাকি সেবা করিবার জন্য সেবা পাইবার জন্য নহে।
সেইজন্য কিছুতে দুঃখ হয় না। রাগ হয় মা কমলে কমিনীর উপর!
৬ই অক্টোবর—বিশ্বরূপা মা আমার ভয়ঙ্করী শুভঙ্করী
৭ই অক্টোবর—চারদিকে জল
বল মা তারা দাঁড়াই কোথা
শুভ তবু শুভ তবু মঙ্গল সব দিকে
৮ই অক্টোবর—সপ্তমী শুভ সপ্তমী তিথি দুখেও আনন্দ কত
৯ই অক্টোবর—তোমার অভয় বাণী শুনি বারংবার রাজ রাজেশ্বরী মা আমার

('গ্রামের টান' কবিতায়—
"বলবো জোরে ভয় করো না—মোদের মা রাজরাজেশ্বরী")

১০ই অক্টোবর—দুঃখ আমার মন ভুলালি রে
সাবাস দিই তোরে।

১১ই অক্টোবর—রাত্রে মরি দিনে বাঁচি
মায়ের ছেলে সুখে আছি।
দুঃখ কি সুখ নাহি বাছি
জানি মায়ের কোলে আছি।
সাবাস্ দিই আর বলি একি,
অবাক হয়ে ভেলকী দেখি।

১২ই অক্টোবর—বন্যা গেল থামে না মা বৃষ্টি
তোমার দেখি সবেই অনাসৃষ্টি।

১৩ই অক্টোবর—মঙ্গলময়ী
বারে বারে যত দুঃখ দিয়েছ দিতেছ তারা
দুখ নয় সে দয়া তব জেনেছি মা দুখ হরা।

১৪ই অক্টোবর— তোমার আলো চোখ জুড়ালো

১৫ই অক্টোবর—কখন কি রঙ্গে থাক মা শ্যামা সুধা তরঙ্গিণী।

১৯৫৯ সনের বন্যার সময় বাবা নূতন বাড়িতে বাস করছিলেন। এর আগের ১৯৫৬ সনের বন্যায় যখন সমস্ত ঘর বাড়ি পড়ে যায় বাবা তখন এক বৎসর তাঁবুতে বাস করেন। নূতন বাড়ির ইট-কাটা হতে আরম্ভ করে সমস্ত কাজ নিজে তত্ত্বাবধান করেন। ১৯৫৭ সনের শ্রাবণে গৃহ প্রবেশ করেন। ১৯৫৯ সনের বন্যার প্রকোপ সেই গৃহেই ঘটে। আগের বন্যায় লেখা কবিতা 'কেমন আছি'; 'নিরাশ্রয় মাম্ জগদীশ রক্ষ'। পাকাবাড়ি হলে লেখা 'পাকা ঘর'। এবার লেখা হল 'অজয়ের বন্যা ১৯৫৯'। কবিতাটি সহজে পাওয়া যায় না বলে নিম্নে উদ্ধৃত করলাম।

১
"বিপন্ন মোরা—অবসন্ন ও বিষন্ন দেহ মন
এই কি বন্যা নিয়ন্ত্রণ না বন্যা বিবর্দ্ধন?
বন্যা হয়েছে হতেছে এবং প্রতিকার নাই যবে—
ফায়ার ব্রিগেড সঙ্গে বন্যা ব্রিগেড গড়িতে হবে।
গেছে সব বাড়ি, ভাঙ্গা দেহ মন, ধুয়ে মুছে গেছে ধান
পল্লী হতেছে অ-বাসযোগ্য রক্ষ হে ভগবান।
'ফারাক্কা' বাঁধ বাঁধা চাই আগে তার তোড়জড় কর
কিম্বা সকলে নিরুপায় হয়ে নোয়ার আর্কই গড়।

মর্ম্মন্তুদ যাতনা পেয়েছি যা অবিস্মরণীয়
শহর বাঁচুক সঙ্গে তাহার পল্লীকে বাঁচাইয়ো।

২

সাপের সঙ্গে এক সাথে থাকি স্রোতের সঙ্গে লড়ি
বছর বছর কেমন করিয়া এমন জীবন ধরি ?
কেহ গাছে ঝুলে, কেহ চালে চেপে, রক্ষা করিছে প্রাণ
ভেসে গেলে বেশি ক্লেশ ত হত না, সব জ্বালা অবসান।
খড় কুটা দিয়ে দুবছর ধরে যে বাসা হইল গড়া
নিমেষে কোথায় সব ভেসে গেল অধিক যাবে কি করা ?
এমন অগৌরবের জীবন ধারণ করাও পাপ
সভ্য স্বাধীন পুণ্য দেশেতে বিধাতার অভিশাপ।
সময় থাকিতে উপায় না করা সে কি নয় অপরাধ ?
স্বেচ্ছায় এ যে কাছে ডেকে আনা জাতির আর্তনাদ।

৩

গোহাল পড়িছে ঘরে হাঁটু জল, উপায় খুঁজে না পাই
যোজন খুঁজিয়া 'অজয়' 'কুমুরে' সবল নৌকা নাই।
মিলিটারী বোট্ আসিল ক'খনা বন্যা সরিয়া গেলে,
কত যে শক্তি সান্ত্বনা দিত দুই দিন আগে এলে।
আঁধার কাটিল 'আলো' 'আলো' করি বিভীষিকা ভরা রাত—
প্রভাতে পাঁচটা পেট্রোম্যাক্সে জানালো সুপ্রভাত।
রিলিফ আসিছে ভিক্ষা আসিছে কম্বল পিছু পিছু।
বন্যায় শুধু প্রাণ রক্ষার উপায় ছিল না কিছু।
দোষ দিব কারে ? কষ্টে কাটানু শব সাধনার রাত্রি
শবাসনা ভালে দেখিলাম কই, খণ্ড চন্দ্র ভাতি ?

সমসাময়িক কোন সংবাদ বা ঘটনা কোন সময় মনকে নাড়া দেওয়ায়, নিজের লেখা কবিতা ডায়ারিতে স্থান পেয়েছে হঠাৎ। কোথাও ব্যঙ্গ, কোথাও খেদ। তার পর আবার মন ফিরে গিয়েছে আপন অন্তঃপুরে।

২৪শে আগষ্ট—সর্ব্বকার্য্যেষু মাধবঃ তব করুণার কণার ভিক্ষারী আমি

২৫শে আগষ্ট—সুখেই রয়েছ নাগা—
ভারত বিরোধী হলেই হইবে একেবারে হতভাগা।

২৬শে আগষ্ট—ফিজো।
মহা অপকার করিতেছ তুমি দেশের এবং নিজ।

২৭শে আগষ্ট—মুখে বড় বড় কথা
স্বাধীনতা নয় স্বাধীনতা নয় দস্যুর স্বাধীনতা।

২৮শে আগষ্ট—আর কারে ডাকিব শ্যামা ছাওয়াল কেবল মাকে ডাকে।
কাগজে চন্দ্রলোকে মানুষ যাওয়ার খবর পড়ে লিখলেন—

৫ই সেপ্টেম্বর—চন্দ্রলোকেতে যাওয়া না থাকুক কপালে লেখা,
নিকটে আমার তারাপীঠ তাই হল না দেখা।

৬ই—পৃথিবীতে এই ভারতবর্ষে এই দেশে যাহা রয়েছে আছে
তাদিকে দেখিছি ? পরে যাওয়া যাবে গ্রহের কাছে।

৭ই—প্রাসাদে হর্ম্যে গহ্বরেগুহায় বনে জঙ্গলে রই,
সব আত্মীয় সব ভাই ভাই পর কেহ মোরা নই।

৮ই—আমাদেরি মত যে দেশে যেখানে থাকো
সুখে দুখে ভাই একই ভগবানে ডাকো।

৯ই—বসুধৈব কুটুম্বকম্
চন্দ্রলোকে যাবার আগে তোমার কাছে যেতে চাই।

১০ই—এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।

১১ই—বারে বারে যত দুখ দিয়েছ দিতেছ তারা
সে সকলি কৃপা তব জেনেছি মা দুখহরা।

সিদ্ধকবি কুমুদরঞ্জনের অন্তর্লোকের সন্ধানে

সমরেন্দ্রনারায়ণ বাগচী

ছায়া সুশীতল পল্লীশ্রীর মধ্যে একতলা পাকা বাড়ি, দূর থেকে মনে হ'ল যেন তপস্যারত কোন ঋষির আশ্রম।

আমার স্মরণে এল—

অভিষিক্ত আশীর্বাদে ভবন সে মধুর
স্বর্গ থেকে সে গৃহদ্বার নয়কো বেশী দূর।
দুঃখ সেথায় তপস্যা তো, সুখ সেখানে কি সংযত,
আকাঙ্খিত জীবন-মরণ দুই অমৃতময়।

সত্যিই তিনি জীবন-মরণ অতিক্রান্ত অমৃতময় পুরুষ ছিলেন। আশ্রম দ্বারে কবি উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন—প্রতীক্ষমান যেন ভগবান ভক্ত প্রেমে আপ্লুত ও ভাবাবেশে চঞ্চল। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম নিবেদন করতেই আশীর্ব্বাদ ও স্নেহালিঙ্গনে মনপ্রাণ ও চিত্ত শুদ্ধ করে দিলেন।

আমি অনিমেষ দৃষ্টিতে তাঁর শিশু সুলভ সুষমামণ্ডিত মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। বাক্য স্ফুর্তি হল না। ভক্ত প্রেম বিহ্বল ভগবদ ভাবোন্মত্ত কবি আবেগ ভরে বার বার বলছেন "সমর তুমি এসেছ আমার ভাল কত যে লাগছে—আমার কি আনন্দ, সমর আজ এসেছে আমার কাছে। কথায় যেন তাঁর বুকের সুরভি, কালির আঁখরেও তাই—"যায় রেখে কবি,

শুষ্ক কালির আঁখরে তার বুকের সুরভি।"

কি ভাবে আমাদের আদর যত্ন আতিথেয়তা করবেন সেইজন্য কবি নিজেই বার বার আশ্রমস্থ কল্যাণময়ী গৃহপালিকাকে বলছেন "ওদের চা, জল খাবার দাও।" আলাপনার মাঝখানে হঠাৎ গৃহাভ্যন্তরে যাচ্ছেন ও কি কি রান্না হবে তার দফা নির্দেশ দিচ্ছেন, সন্দেশ মিষ্টান্ন কোথাকার কি এল তার সন্ধান নিচ্ছেন। তত্ত্বদর্শী কবির বাসভবনটি যথার্থ ই আশ্রম পরিবেশের মধ্যে। তাঁর সাধনসঙ্গী "দীনবন্ধু" ও তিনি নিজেও দীনবন্ধু। দীনতা তাঁর ভবব্যাধি হীনতায়।

তাঁর ভক্তি দীনবন্ধুর প্রেম প্রশান্তিতে মহাভাবোজ্জ্বল।

নরনারায়ণের সেবাই তাঁর নিত্য যজ্ঞ। আলাপ আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে থেকে থেকে মনে পড়তে লাগল—

"ভালবাসি হেথা ভক্তিতে জ্বলা শান্তিতে ধীরে নেভা।
ভালবাসি শত অভাবের মাঝে দিন অতিথির সেবা।
আছি-আমি লয়ে হেথা কোন দূরে—দীনতা এবং দীন বন্ধুরে
খ্যাতি যশ মান জয় যুদ্ধের সংবাদ রাখে কেবা?"

অপরাহ্ন বেলা। কবি বললেন—"চল সময় তোমাকে আমার কোগ্রাম দেখিয়ে ফিরে এসে আবার বসি।"

কবির সঙ্গে কোগ্রামের পথে চলেছি। আশ্রমের অতি নিকটেই লোচন দাস বাবাজীর আখড়া, মহাপ্রভুর সময় হতে। খানিকটা পথ গিয়ে দেখা গেল নীললোহিতেশ্বর শিবের মন্দির যেখানে হারানো শিবলিঙ্গকে মন্দির প্রতিষ্ঠা করে কবি স্বহস্তে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। পথ চলতে আরও খানিকটা গিয়ে দেখি ৺মা মঙ্গলচণ্ডীর অষ্টধাতুর মূর্তি অতি প্রাচীন ইতিহাস বিখ্যাত মন্দিরে শোভা পাচ্ছে।

মন্দির প্রাঙ্গণে কবি পুরোহিতকে বলছেন—"জানো সময়, ৺মা আমার বড়ই করুণাময়ী—আমার কত আবেদন নিবেদনই না শোনেন।" গ্রামস্থ মেয়ে পুরুষ যাঁরাই কবিকে দর্শন করছেন—সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতে তাঁদের ভক্তি ভালবাসা নিবেদন করছেন। কবি সকলকেই অতি মধুর সম্ভাষণে কুশল প্রশ্নাদি করে তাঁর অন্তরের স্নেহাশীর্বাদ অকাতরে বর্ষণ করে চলেছেন।

সন্ধ্যা ঘনায়মান, আমরা আশ্রমের দিকে আসছি। হঠাৎ কবি বললেন—"সময় দেখছ আমার অজয়, ওই আমার কূল হতে অকূলে খবর বহন করে চলেছে।" দুটি শব্দ কূল ও অকূল আমাকে স্তম্ভিত করল। সিদ্ধ কৌলাচারী না হলে ঐ দুটি শব্দের তাত্ত্বিক পরিভাষার জ্ঞানও সম্ভব নয়। কুণ্ডলিনী চলেন সুষুম্না পথে অকূলে অর্থাৎ পরমশিব সকাশে—অনন্তে, পরব্যোমে।

স্রোতস্বিনীর ধারা পথের মতই কুণ্ডলিনী শক্তি সুষুম্না পথবাহিনী।

অজয় কবির যেন সুষুম্না পথ—তাঁর কুলকুণ্ডলিনী বাহিত হয়ে চলেছে অজয়ের নিরবচ্ছিন্ন স্রোত পথে, অনন্তের অর্থাৎ 'শিবসরিৎ' তীরে। সাধক দৃষ্টির অপূর্ব প্রতিভ জ্ঞানের প্রকাশ দুটি ছোট শব্দের মাধ্যমে। আমি কবিকে প্রশ্ন করলাম—'আপনার কাব্যে ও গানে শব্দ সম্ভারের মধ্যে আছে মন্ত্রচৈতন্যের স্পন্দন, ভাবে আছে ভূমানন্দের স্পর্শন; বেদ, বেদান্ত, দর্শন পুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্র সংস্কৃত ভাষার প্রাচীন মন্ত্রগ্রন্থ, কিন্তু অতি সরল ও সহজ বাংলা ভাষায় আপনার গান ও কবিতাগুলি যুগোপযোগী মন্ত্রগ্রন্থ বলে আমার মনে হয়। আপনার অন্তর্লোকের হয়ত সন্ধান পাওয়া যেতে পারে আপনার ছন্দ বদ্ধ মন্ত্রগাঁথায়। কখনও আপনাকে ভেবেছি ব্রহ্মসাধক, কখনও শক্তি মাতৃসাধক, আবার কখনও আউল-বাউল, বৈষ্ণব ও সিদ্ধ সাঁই পন্থী বলেও আমার ধারণা হয়েছে। তন্ত্রের বচনটি আপনার মধ্যে মূর্ত প্রকাশ—অন্তরে শক্তি সাধক, বাইরে শৈব সাধক, সাধারণের দৃষ্টিতে বৈষ্ণব সাধক—নানাভাবের সাধন পথে যে সিদ্ধ, সেই ত কৌলাবধূত।

সিদ্ধ কৌলাবধূত বলেই না কবি বললেন—"জানো সময়, ঐ আমার অজয়, এই ত আমার নীললোহিতেশ্বর শিব, দেখলে ত আমার ৺মা মঙ্গলচণ্ডীকে, ঠাকুরলোচন দাস আছেন আমার বাড়ির পাশেই, আমার গ্রামের

ছেলেমেয়েরা, মায়েরা বৌয়েরা—এদেরই সব বুকে জড়িয়ে পরমানন্দে আছি। এইত আমার সকল তীর্থের সার তীর্থ উজানি—কোগ্রাম, সকল সাধনার পুণ্য সিদ্ধ ক্ষেত্র। আমার গ্রাম্য পথের ধূলি—এই ত আমার ব্রজরজ বাবা। এই খানেই মুদিত চরণ পঙ্কজে মন গুঞ্জন যে ভুলে যাই।"

মনে পড়ল কবির মন্ত্রগাঁথার কয়েকটি পদ—

'চণ্ডী মায়ের সোনার কোগাঁ তার বুকে যে থাকে,
ভোরে উঠেই লোচনদাসের চরণ ধূলি মাখে
গাজন চড়কেতে হৃদয় উঠে মেতে
সুখে দুঃখে মঙ্গলারে হৃদয় ভরে ডাকে।'

('হংস খেয়ারী' শ্রেঃ কঃ—৮৪)

নিজ গর্ভধারিণী মাতাকেই জগন্মাতার রূপে 'আরোপ সাধন' তন্ত্র সম্মত। মা সার্বজনীন ও সর্বপ্রাণীন। মানুষের মাই যে শুধু মা, তা নয়, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ বৃক্ষলতাদির অর্থাৎ স্থাবর ও জঙ্গমের যিনি সৃষ্টি-স্থিতি বিনাশিনী তিনিই 'মা'। 'মা' মহামন্ত্রে দীক্ষিত সাধক কুমুদরঞ্জন তাঁর জন্মদাত্রী মায়ের কাছে, নয়ত যে মন্ত্রটি—'মাতৃস্তোত্রে' চৈতন্যময়ী হয়ে রূপ নিয়েছে তা সম্ভব হত বলে আমার মনে হয় না। কবি বলছেন—

'আমার লাগি প্রাসাদ রচি আপনি থাক শশ্মানে মা,
চণ্ডী হয়ে আমার লাগি তুমি ছোট মশানে মা
জনম জনম মা হয়েছ জনম জনম হবেও মা
ডাকবে আমায় স্তন্য তোমার তোমার কাজল, তোমার চুমা।'

'মায়ের সোহাগে' সুবোধ বালক কবি কুমুদরঞ্জন হয়ে উঠেছিলেন যেন 'বেণী'—আবদারে বেণী, দেবী স্বর্গাপবর্গ দেন বলেই সাধক স্বর্গ ত চায়ই, অপবর্গও চায়।

'ক্ষীর কই? কই মিঠাই কোথায়? জানাইতে হয় আজ তাঁরে,
জগজ্জননী ঝালাপাল হ'ল অকৃতী সুতের আবদারে!'

('মায়ের সোহাগ'—কাঃ সঃ-৩০)

সাধক কবি কিন্তু জানতেন যে সাধন বৃত্তের অর্ধাংশ সংসার, আর অপরার্ধ—মহাকালে মহাকালী।

জ্ঞানাতীতা—মা। তাঁর বহরাকাশে জ্ঞানাতীতা 'মা' যে তাঁর লোকলোকান্তরে গর্ভধারিণী মা জননী 'মা' মহামন্ত্রের এই রূপটি তাই নিল কবিরই মন্ত্রে—

'মাগো আমার পুণ্যময়ি তুমিই আমার জগন্মাতা
জনম জনম পেলাম কৃপা ধন্য দয়াল মোর বিধাতা।'

'চিদাকাশে যার যা ভাসে'—সেই ত জগন্ময়ী মায়েরই রূপ। কবিমানস চৈতন্যে জগন্মাতা ছিলেন—

'হাস্য ও রহস্য ময়ী যায় নাকি তারে ধরা ?
মৃত্যু জরার অতীত সে ঠাঁই নয় তাহা নির্বাণ—
বুকের আলোকে গড়া সে অলকা জ্যোতির্ময়ের দান।'

যিনি জগন্মাতা তিনিই শক্তিভূতে সনাতনী। তাঁরই মহাশক্তির শাসনে সূর্য চন্দ্র গ্রহতারা, জ্ঞান অজ্ঞান ও বিজ্ঞান স্ফুরিত। চলেছে কাল প্রবাহে সৃষ্টি স্থিতি ও লয় স্রোত, নিরবচ্ছিন্ন তাঁর লীলাবিলাস। সেই লীলাবিলাসের ছন্দটি ছন্দায়িত হল কবি মন্ত্রে—

'যাঁহার তেজেতে সব জ্যোতিস্ক তেজোময়,
যাঁর মহিমায় নাহি উপচয় অপচয়,
সব শক্তির উৎস যে জন,
ইঙ্গিতে যাঁর লয় ও সৃজন,
কতক্ষণ তাঁর ফিরায়ে আনিতে সুসময়।'

রূপসাগরে ডুব দিয়ে কুমুদরঞ্জনের সাধনা অরূপে অমৃত প্রাপ্তির রূপে ও অরূপে সাধক পেয়েছিলেন জগন্মাতাকে—'জগতস্য জগন্ময়ে' রামপ্রসাদ বলেছেন—"দেখার মত দেখ দেখি মন, আমার শ্যামা মাকে।"

ঐ 'দেখার মত দেখেই' কুমুদরঞ্জন বললেন—

"ভুবন তিনি, তিনিই ভুবন, রূপ ত নিতুই দেখি ঢের,
এখন তৃষ্ণা শুধু রূপসাগরের অমৃতের।"

সাধন পথে রূপ হতে অরূপে ও অরূপ হতে রূপে যে অমৃতাস্বাদন ঠাকুর রামকৃষ্ণ করেছিলেন কবিসাধক কুমুদরঞ্জন সে রসেরও রসিক। রূপ ও অরূপ সবই ত "চেতন্যতভিবীয়তে" কারণ "নিতৈব সা জগন্মূর্ত্তি তয়া সর্বমিদংততম"।

কবিমানসে রূপ-অরূপের 'তৃষ্ণা' বহিরিন্দ্রানুভূতি সাপেক্ষ নয়; জাগ্রত চৈতন্যে অমৃতময়াত্মার রসাস্বাদনই তাঁর 'তৃষ্ণা'।

বৈষ্ণব ও বেদান্তবাদীদের সাকার-নিরাকার অর্থাৎ 'রূপ-অরূপের' ঝগড়া নিয়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণ রহস্যচ্ছলে নানা কথা তাঁর অমৃতময়ী বাণীতে বলে গিয়েছেন। রূপে ও অরূপে সাকারে ও নিরাকারে যিনিই সত্য বস্তু তিনিই এই মহামন্ত্রের উদ্‌গাতা এই যুগে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। সাধক কুমুদরঞ্জন তাঁর 'দেখা' মন্ত্রে 'সর্বং খল্বিদং' মন্ত্রের যে রূপ চিত্রায়িত করলেন তাতে রূপে-অরূপে সাকারে-নিরাকারে একাকার অমৃতাকার। তন্ত্রে শিবশক্তি রূপা জগন্মাতাই মহামাতৃকা শক্তিশিব অঘোরেশ্বর। তাঁর নামে যাই গ্রহণ করা যায়, তাই হয় শুচিশুদ্ধ কারণ সুন্দর ও কুৎসিৎ তাঁর কাছে সমান।

দেহাধারে সুপ্তাকুণ্ডলিনী মহাশক্তিই 'মা' বীজাকারে মন্ত্ররূপা বা চিদ্রূপা। জীবাধারে সুপ্তাকুণ্ডলিনী মহাশক্তিকেই তন্ত্রে বলে 'আধার শক্তি'। মূলাধারে তিনি সুপ্তা কিন্তু সহস্রারে তিনিই পরম শিবে সাম্যরসে সংযুক্তা। কবিমানস চৈতন্যে ঐ জাগ্রতা কুণ্ডলিনী শক্তির সঙ্গে চলছে সাধনমার্গে অচিন্তনীয়

আদান প্রদান। সাধনতত্ত্ব অতি গোপনীয় বস্তু প্রত্যেক তন্ত্রসাধকের এটিই তন্ত্রের নির্দেশ। তাই কবি বলেছেন—

'রহিল সে বীজ কঠিন মোড়কে মোড়া
পিঁজরা পোলেতে অশ্বমেধের ঘোড়া।
মোরা যে মন্ত্র সাধি সহস্র-দলে
অচিন্তনীয় আদান-প্রদান।'

দৈবদেহাধারটি পিঁজরা পোল, কিন্তু তারই মধ্যে আছেন নিদ্রিতা মহামাতৃকা শক্তি কুণ্ডলিনী—যাকে কবি বলেছেন—'অশ্বমেধের ঘোড়া' কুণ্ডলিনী জাগরণের সাধনপথে পরমেধী গুরু হলেন পরমশিব, যিনিই একমাত্র জীবন্ত, আর অন্য সকলে নির্জীব। ঐ সাধন পথে যাঁরা পথিকৃৎ তাঁদের না আছে ঘৃণা, না আছে লজ্জা; ভয় ত নেই। সাধক কুমুদরঞ্জন বলছেন—

'হীরক যেমন অঙ্গার হতে জাগে,
শিব হতে হলে শব হতে হবে আগে।
...
ঘৃণা আবরণ সব আবরণ সেরা,
সেই ত মুক্তাকেশীর শক্ত বেড়া।'

ঠাকুর রামকৃষ্ণ নারায়ণকে বলেছেন—'ওরে পাশ মুক্ত শিব, পাশ বদ্ধ জীব।' (কঃ মৃ ৫।১৫৫)

পাশযুক্ত বলেই আমরা কবির কথায় নির্জীব আর একমাত্র পাশ মুক্ত হলেন শিব তাই কবির কথায় তিনি শব হয়েও জীবন্ত। দেহ প্রকৃতি পরতন্ত্রে-পঙ্কশয্যা।

ইহাকে কোন কোন তন্ত্রসাধক বলেন শৈবলিনী জল।
ঐ শৈবলিনী জলে লোহিত কমল-ষটচক্রগুলি ভাসমান।

ঐ কমল চক্রগুলি বহুদল বিশিষ্ট। আধার শক্তি মহামাতৃকাশক্তি কুণ্ডলিনীই সাধকের আত্মস্বরূপ। মূলাধারে চক্র হতে সহস্রার পর্যন্ত সাধকের দেহাভ্যন্তরের প্রতিটি কমলচক্রের মুদিত দলগুলিকে, মহাশক্তি কুণ্ডলিনী প্রস্ফুটিত করেছেন। তখন সাধক প্রবুদ্ধ দশা থেকে সুপ্রবুদ্ধ দশাতে হ'ন উপস্থিত। পঙ্ক শয্যা অর্থাৎ দেহাধার হয় শুদ্ধ বিদ্যার আধার। তাই ত শুনছি কবির বাণী—

'পঙ্ক শয্যা যত পার ঘৃণা কর,
ফোটায়ে কমল সে তাহা তুলিতে দড়।'

কমলদলগুলি প্রস্ফুটিত হলে যে প্রবুদ্ধতা সাধক চৈতন্যে জাগ্রত হয়, তাকেই লক্ষ্য করে আগমবিদ্ মহামহোপাধ্যায় আচার্য গোপীনাথ কবিরাজ বলছেন—"পরাচিৎশক্তির উন্মেষ হইলে যে অবস্থা আবির্ভূত তাহাই প্রবুদ্ধতা বা প্রবোধ অর্থাৎ কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ"। তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত

(৬২ পা) দেহান্দ্রিয়গুলিকে 'শবত্বে' আনতে পারলে চিত্তশুদ্ধি হয়। চিত্তশুদ্ধিকে তন্ত্র বলে 'শূন্যাধার'। শূন্যাধার না হলে 'শূণ্যাকারে' চিতিরূপে চিন্ময়ী কুলকুণ্ডলিনী মাতৃকা মহাশক্তি তিনিই সাধকের "শূণ্যাধারে" হন জাগ্রতা।

কবিসাধক দেহকে ঘৃণা করার কথা বলেন নি—বলেছেন ঘৃণা কর ইন্দ্রিয় পরতন্ত্রতা, শুদ্ধচিত্তে কর আত্মাবলোকন। যে দেহকে মনে কর 'পঙ্কশয্যা' তাতেই আছে কমলনিৎ শুদ্ধচিত্ত। শুদ্ধচিত্তে শুদ্ধাধারে, 'দেহ শৈবলিনী' জলেই বিরাজ করছেন 'নীলমরালী' হংসী রূপা মহামাতৃকা প্রাণশক্তি কুণ্ডলিনী তন্ত্রে তাকেই বলেছে 'মহাকালিকা'। নীলমরালীর নীলপদকমলে ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও রামপ্রসাদের 'কালো মনভ্রমর' মজে গিয়েছিল। সাধককবি কুমুদরঞ্জন তন্ত্রসাধনার চরমতম সত্য উপলব্ধি করেই বলেছেন যে পঙ্ক শয্যাতেই কমল ফোটে।

কুল অর্থাৎ দেহাধার, অকুল বিশ্বাতীত সত্তা যাকে তন্ত্রযোগীন 'সহস্রার'। মহামহোপাধ্যায় তন্ত্রার্ণব কবিরাজ মহাশয় বলছেন—'অকুল সহস্রার হইতে মূলাধারাদি যাবতীয় কুল পদ্ম ভেদ করিয়া ক্রমশঃ উপরদিকে উঠিতে হয়।" (তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত—পৃঃ ৩৪৫)। সাধন পথে সাধক চলছেন কুল হতে অকুলে। পথ প্রদর্শিকা জাগ্রতা কুলকুণ্ডলিনী মাতৃকা মহাশক্তি। তিনি কবির চিদাকাশে জ্যোতির্ময়ী সত্তা। মূলাধার হতে সহস্রার পর্যন্ত অর্থাৎ কুল হতে অকুল নদীর প্রবাহ—ত্রিপথা—ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্না পথে। জীবনতরীতে সপ্তা মাতৃকা মহাশক্তি কুণ্ডলিনী। এই শক্তির জাগরণের সাধনাই কবির জীবন তরী বেয়ে যাওয়ার সাধনা। ঐ সাধনার গোপন মন্ত্রটি কবি প্রকাশ করলেন—

'অকুল নদীর বিজন কুলে জীবন তরী চেয়েছি।'

তন্ত্রে কৌলমার্গে বীরাচার ও দিব্য বীরাচার এই দুটি সাধনার ধারা আছে। দিব্য বীরাচারী সাত্বিক সাধক। তামসকে সত্ত্ব দ্বারা জয় করে প্রবুদ্ধ হতে সুপ্রবুদ্ধ দশা প্রাপ্তিই জীবন্মুক্তি ও এটিই দিব্য বীরাচারীর কাম্য ও সাধ্য বস্তু।

দিব্য বীরাচারী সাধক কুমুদরঞ্জন নিজ দেহটিকে করেছিলেন মায়ের বিজন মন্দির। সেই মন্দিরে হানা দিত ছয় জন শত্রু—চেষ্টা করত মন্দিরটিকে কলুষিত করতে। সাধক তাঁর শত্রুদের সঙ্গে করলেন মিতালি—তামসকে সত্ত্বের করলেন বন্ধু, তন্ত্রের দিব্যবীরাচার সাধনার নিগূঢ় তত্ত্বটি কবির মন্ত্রে শুনি—

'কর্ম মোদের ধর্ম জানি, ধর্ম জানি সংযমেতে,
হৃদয় শোণিত ঢালতে পারি ছয়টি রিপুর তর্পণেতে॥'

চণ্ডীতে আছে—

নিরাহারৌ যতাহারৌ তন্মনসৌ সমাহিতৌ।
দদতুস্তৌ বলিঞ্চৈব নিজ গাত্রা সৃগুক্ষিতম্। (১৩।১১)

নিরাহার ও যতাহার শব্দ দুইটি রসনাদি ইন্দ্রিয় সংযম নির্দেশ করে। তন্মনস্ক শব্দটি—তাদাত্ম্য বোধক—অর্থাৎ মনের গ্রন্থিভেদ জ্ঞাপক। সমাহিতঃ শব্দে মনও রসনার দুর্দমনীয়ত্ব কারণে ইন্দ্রিয় জয় ও রসনা জয় করে সংযমের পরাকাষ্ঠা নির্দেশিত হয়েছে। উক্ষিত, প্রোক্ষিত স্বদেহের রক্তবলি বা শ্রেষ্ঠ উপহার প্রদানই মাতৃ মহাপূজায় আত্মনিবেদনের চরম অভিব্যক্তি।

পশু বলি নয়—আত্মবলি ইহাই তন্ত্রের সিদ্ধান্ত। মাতৃগত চিত্তে স্বদেহ রক্ত সিঞ্চিত পশু কুষ্মাণ্ডাদি জগজ্জননীর চরণে উপহার প্রদানই যে দিব্য বীরাচার সাধনের মুখ্য তত্ত্ব, শাক্ত কবিতাটিতে কবি তাহা ব্যক্ত করছেন—

'মায়ের সনে আমরা কাঁদি মায়ের সনে ভালোই বাসি
মা যে মোদের দয়াময়ী, মা যে মোদের সর্বনাশী।'

('শাক্ত' শ্রেষ্ঠ কবিতা ৩৮ পা)

'সর্বনাশী' শব্দটির তাত্ত্বিক পরিভাষায় যে নিগূঢ় অর্থ তন্ত্রশাস্ত্রে দেখি তার অপূর্ব রূপায়ণও দেখছি সাধককবি কুমুদরঞ্জনের 'মা যে মোদের সর্বনাশী'তে। সর্ব শব্দটি পঞ্চক্লেশ—অর্থাৎ অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও মৃত্যুভয়কে নির্দেশ করে। পাতঞ্জল যোগ সূত্রে—

'অবিদ্যা মোহঃ অস্মিতা দেহেন্দ্রিয়েষু অহংভাবঃ
রাগঃ সুখ সাধনেচ্ছা, দ্বেষঃ দুঃখ নিবারণ চেষ্টা অভিনিবেশ মৃত্যুভয়ম্ ॥

'সর্বনাশ' শব্দ পঞ্চক্লেশ নাশকে বুঝিয়েছে।

মা—মহাবিদ্যা ব্রহ্মস্বরূপিনী, তিনি কি করে সর্বনাশী হলেন? বড়ই দুরূহ ও জটিল সমস্যা বলে মনে হয়।

চণ্ডী বলছেন—'মা বিদ্যা পরমামুক্তে হেতু ভূতা সনাতনী
সংসার বন্ধ হেতুশ্চ সৈব সর্বো স্বরেশ্বরী।' (১।৫৭-৫৮)

মা পঞ্চক্লেশনাশিনী তাই সংসার মুক্তির হেতু ভূতা পরমা ব্রহ্মবিদ্যারূপিনী ও সনাতনী, কিন্তু তিনিই আবার সংসার বন্ধনের কারণ স্বরূপা অবিদ্যা আদি পঞ্চক্লেশ কারয়িত্রী হইয়াও পঞ্চক্লেশ নাশিনী।

সাধক কুমুদরঞ্জনের মাকে দয়াময়ী বলে আবার সর্বনাশী বলবার কারণ কি তা বুঝতে পারা গেল।

তিনি পঞ্চক্লেশ মুক্ত সর্বনাশী দয়াময়ীর কৃপা কণায়। তাই মুক্তির পরমানন্দে করছেন প্রেমাশ্রু বিসর্জন আর গাইছেন—

'স্নেহ প্রেম প্রীতিহীন কর্কশ কঠিন কারাগার
পারে না হইতে কভু দেবতার বিলাস আগার।
আপনার জননীরে জেনো বৎস পারে যে ভুলিতে
বিশ্বজননীর স্নেহ সে কখনো পারে না লভিতে।'

(কাপালিক শ্রেঃ কবিতা ৪৪ পা)

স্বীয় গর্ভধারিণী মা, জগজ্জননী মা মহামায়া ও 'বিশ্বমাতা' যে একই সত্তা,

সাধক কুমুদরঞ্জনের অতিমানস চৈতন্য লোকে—সে বিষয়ে সন্দেহের আর কোন অবকাশ নেই।

'প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যারে
সেটা চাতরে কি ভাঙবো হাঁড়ি বোঝনা মন ঠারে ঠোরে।'

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন মাতৃভাবের সাধক আর কুমুদরঞ্জন মল্লিক মহাশয়ের হৃদ-কুমুদও মাতৃভাব রঞ্জনে রঞ্জিত।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলতেন—রামপ্রসাদ মনকে ঠারে ঠোরে বুঝতে বলেছে—এই বুঝতে বলেছে—যে বেদে যাঁকে ব্রহ্ম বলছে—তাকেই আমি মা বলে ডাকছি। মা বড় ভালোবাসার জিনিস কিনা। ভাব, ভক্তি, ভালোবাসা আর বিশ্বাস। ঈশ্বরকে ভালোবাসতে পারলেই তাঁকে পাওয়া যায়। (কঃ মৃঃ ৩য়-১৭) 'প্রসাদ' কবিরঞ্জনের মাতৃতত্ত্বের রূপকার হলেন মাতৃরূপে রঞ্জিত কুমুদ কবি তাঁর বুকের আসরে।

'ভক্তি আর শক্তি এক, এ নহে ভিন্নভেদ,
তুমিই দেখায়ে দিলে করিলে প্রচার
গান আর প্রাণ তুমি করে দিলে এক
ভক্তিকে করিয়া দিলে পূজা উপচার।'

('রামপ্রসাদ' প্রেঃ কঃ)

ঠাকুর রামকৃষ্ণ গান গাইছেন বিদ্যাসাগর ভবনে আর প্রসাদতত্ত্ব ব্যাখ্যান করছেন। "বিশ্বাস ও ভক্তি! তাঁকে ভক্তিতে সহজে পাওয়া যায়। তিনি ভাবের বিষয়।" (কঃ মৃঃ ৩।১৩)

কুমুদরঞ্জনের 'প্রসাদ' তত্ত্বটির গূঢ় তাৎপর্য বুঝতে হলে তন্ত্রশাস্ত্রের শিবশক্তি তত্ত্বসম্বন্ধে আরও খানিকটা বলা প্রয়োজন। কৌলমার্গের সাধন পথে শিব-ভাব আনে শবত্ব অর্থাৎ নির্গুণাত্মক চিত্তশুদ্ধি। চিত্তশুদ্ধির ফলে সাধকের চিৎকুণ্ডে মাতৃকামহাশক্তির কুণ্ডলিনীর চিৎকলারূপে হ'ন ভাসমান। মহাশক্তিই সাধকের চিদাকাশে অদ্বৈতরূপিণী শিবশক্তি শিবশিবা বাংলায় যাঁকে বলি কালী বা শ্যামারূপে পূজা করি। রামদেবের 'মা' ছিলেন আশ্চর্য ভৈরবী আর মা সারদা যিনি মন্দিরে ভবতারিণী ও তিনিই দুয়ে এক বলতেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। রামপ্রসাদ চরিতকার শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় রাম-প্রসাদ তিরোধান পরিচ্ছেদে ৩৬৫ পাতায় বলছেন যে মহাপ্রয়াণ যাত্রাকালে রামপ্রসাদ সর্বাণী অর্থাৎ তাঁর ধর্মপত্নী; তন্ত্রমতে শক্তিকে আহ্বান করে বলছেন 'সর্বাণি শক্তি' প্রাণের দেবী। আজ আমাদের শেষদিন, এস আজ হাসিতে হাসিতে জগজ্জননীর শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করি। আর গাইছেন—'প্রসাদ বলে বৃদ্ধকালে অশক্ত কি করি বলো
ওমা শক্তিরূপা ভক্তি দিয়ে মুক্তি জলে টেনে ফেল।'

শবভাবে সুপ্রবুদ্ধ শাক্তসাধক রামপ্রসাদ আবার গাইছেন—

'তারার মহিমা আপনি মাত্র জেনেছেন শিব শংকরে
কৈলাস গিরি পুরী দেখাও মা আমারে।'

শিবশব্দের ইকার লুপ্ত হলে হয় বা রামপ্রসাদের সাধনজীবনের একটি দিনের ঘটনা হতে কুমুদরঞ্জনের শিব হতে গেলে শব হতে হবে আগে মন্ত্রটির অর্থ পাওয়া যায়। রামপ্রসাদ জীবনীতে পাওয়া যায় শনিবার অমানিশায় সর্বাণীর সঙ্গে পূজা করেন। মায়ের আলেখ্য সরাইয়া সর্বাণী তৎস্থলাভিষিক্তা হ'ন, সাধনা আরম্ভ হয়। শিব 'প্রসাদ' শক্তিচ্যুত শব, শক্তির পদতলে লুণ্ঠিত হলেন।

'প্রাণভরে মায়ের নাম কর মাকে ভালবাস। ভালবাসাই হবে পূজা উপাচার, দিবে ভোগমুক্তি, করবে মর্তের বন্ধন ক্ষয়। মায়ের শুভঙ্করী ও ভয়ঙ্করীরূপ ভেদজ্ঞান প্রসূত'। কুমুদ কবি তাই বলেছেন—

'মায়েরে 'ম' করে নিলে তুমিই প্রথম,
চিনাইলে অন্নপূর্ণা ধাত্রি জগতের।'

ক্রান্তদর্শী কুমুদ কবি 'প্রসাদ' কবির শক্তি সাধন সুধামৃত মাতৃপ্রেমরস গৌড়জনের পানার্থ করলেন পরিবেশন। তন্ত্রে শিব একাধারে জগদগুরু ও পরম শ্রেষ্ঠ কৌল। তান্ত্রিক সাধনার দৃষ্টিভঙ্গিতে বস্তুতঃ মহাবিন্দুই হৃদয় ও এই তো বিশ্বাতীত পরমেশ্বর অথবা শিবশক্তির আবির্ভাব স্থান। মহাবিন্দু সদাশিব যার উপরে চিৎশক্তি বা চিৎকলা স্বতন্ত্র রূপে খেলা করেন।

ঐ খেলা পরাবাক বা পরামাত্রার বিলাস।

শুক্ল ও রক্তবিন্দু রূপ তার প্রকাশ—বিমর্শময় কাম কলাক্ষরের পরস্পর সংঘট বশত চিৎকলার অভিব্যক্তি হয়। মহাবিন্দুর স্পন্দন থেকে তিনটি বিলীন বিন্দু পৃথক হয়ে রেখারূপে মহা ত্রিকোণের আকার ধারণ করে। "ইহা হতেই শিব ও শিব হতেই পৃথিবী পর্যন্ত সমস্ত বিশ্বের অবিচার"— বলছেন তন্ত্রগুরু মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ মহাশয়।

শিবশক্তি তত্ত্বের দুরবগহ পারিভাষিক অর্থ যা কবিরাজ মহাশয় করেছেন, ভক্ত কুমুদরঞ্জন তারই সহজ ও সরল সাবলীল ব্যাখ্যা করলেন 'সর্বানী প্রসাদ' তত্ত্বে—

হে ভক্ত, পূজার লাগি গড়েছিলে তুমি ভক্তিভরে যেই শিব গঙ্গা মৃত্তিকায়,
জাগ্রত দেবতা হয়ে মহামহিমায় হল তা অনাদি লিঙ্গ পূজিত সবার।

('রামপ্রসাদ' শ্রেষ্ঠ কঃ ৪৫ পৃঃ)

শক্তিসাধক কুমুদরঞ্জন রামপ্রসাদকে জ্ঞানগ্রস্ত অনাদিলিঙ্গ শিব কেন বলেছেন তাই রহস্যময় অর্থটি পাওয়া গেল। 'গঙ্গা মৃত্তিকা' শব্দটি কুমুদরঞ্জন কেন ব্যবহার করলেন? শব্দটি দ্ব্যর্থক। রামপ্রসাদ গঙ্গাতীরবাস ও নিত্য গঙ্গাস্নান করতেন। তাঁর দেহ বা শিবতনু গঙ্গা মৃত্তিকায় পুষ্ট। দ্বিতীয়ত— 'গৌরীত্বমেব শণিকৃত মৌলি প্রতিষ্ঠা'—গঙ্গাজ্ঞানের অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের আকর।

শিবশিখরে গঙ্গা অর্থাৎ জ্ঞানগঙ্গা অধিষ্ঠিতা। শিবশক্তি তত্ত্বের তন্ত্রসম্মত চরমসিদ্ধান্ত সাধক কুমুদরঞ্জন তাঁর অতিমানস চেতনায় যেরূপ প্রত্যক্ষ অনুভব করতেন তারই আভাষ মাত্র দিয়েছেন 'রামপ্রসাদ' কবিতাটিতে।

শাক্ততন্ত্রে সিদ্ধির একমাত্র পথ 'স্নেহপ্রেম প্রীতি' অর্থাৎ প্রেমভক্তি। বৈষ্ণবতন্ত্রে ও শক্তিতন্ত্রে চরমসিদ্ধির পথ যে প্রেমভক্তি কুমুদরঞ্জনের 'দহর বিজ্ঞানে' তাই স্বীকৃত। 'বৈষ্ণব' কবিতাটি বৈষ্ণবতান্ত্রিক কুমুদরঞ্জন বলছেন—'যুগল রূপের উপাসী যে, পিয়াসী যে রসের মোরা'। শিবশক্তি যুগল রূপেও রাধাকৃষ্ণ যুগলরূপ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের তন্ত্রালোকে দেখি।

'শ্রীকৃষ্ণপুরাণ, শ্রীরাধা প্রকৃতি, বিচ্ছক্তি—আদ্যাশক্তি। রাধা প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী' (কঃ মৃঃ ২য় ভাগ ১৮ পৃ) ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে গণেশখণ্ডে সপ্তম অধ্যায়ে স্বয়ং নারায়ণ বলছেন—'সৃষ্টি কর্ত্রী প্রকৃতিঃ সর্বেষাং জননীরূপা সমতুল্য চ মন্ময়া তেন নারায়ণী স্মৃতো। বিশ্বের যিনি সৃষ্টিকারিণী প্রকৃতি ও সকলের পরমাজননী এবং যিনি মন্ময়া ও আমার মত মহাশক্তিশালিনী—তিনিই নারায়ণী।' তন্ত্রে কুণ্ডলিনী ও ভাগবতে হ্লাদিনী দুইই এক। চণ্ডীতে নারায়ণী স্তুতিতে বলা হচ্ছে—'নারায়ণী নমস্তুতে'। নারস্য তত্ত্বসমূহস্য ও জীবসমূহস্য, অয়ণী অর্থাৎ আশ্রয়—তিনিই জগজ্জননী (তত্ত্বপ্রকাশিকা —শ্রীগোপাল চক্রবর্তী)।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন—'চিচ্ছক্তি ও বেদান্তের ব্রহ্ম অভেদ। নামরূপ যা আছে সবই চিচ্ছক্তির ঐশ্বর্য।' (কঃ মৃঃ ২য়, ১৮৬) বৈষ্ণব শুধু জ্ঞান চায় না, চাহে ভক্তি। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলছেন—বৈষ্ণব চায় জ্ঞান মিশ্রা ভক্তি—প্রেমাভক্তি। জ্ঞান, জ্ঞান বললেই কি হয়। জ্ঞান হবার দুটি লক্ষণ প্রথমত অনুরাগ অর্থাৎ ঈশ্বরকে ভালবাসা। শুধু জ্ঞান বিস্তার করছি কিন্তু ঈশ্বরেতে অনুরাগ নাই, ভালবাসা নাই সে মিছে। আর একটি লক্ষণ কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণে। কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণে ভাবভক্তি ও প্রেম এইসব হয়। এরই নাম ভক্তিযোগ। (কঃ মৃ ২য় ১৮৯) চণ্ডী নারায়ণী স্তুতিতে পাই—"বিশ্বশ্রয়া তে তয়ি ভক্তি নম্রা।"

যে জ্ঞান বই পড়া, বিচার করা জ্ঞান, যাতে প্রেমাভক্তিও ব্যাকুলতা নেই শাক্ত ও বৈষ্ণব সে জ্ঞান চায় না। কুমুদরঞ্জনের 'রামপ্রসাদ' ও 'বৈষ্ণব' দুটি কবিতার মর্মবাণী প্রেমাভক্তি। তিনি শক্তিতান্ত্রিক না বৈষ্ণবতান্ত্রিক এই দ্বৈতমতের অবসান হল।

'জ্ঞান আহারে চিনিয়ে দেবে, প্রমাণ তারে আনবে কাছে
এমন দারুণ দুষ্ট আশায় বৈষ্ণবের হায় প্রাণ কি বাঁচে ?
চাই না মোরা শক্তি ওগো, ভক্তি ভরে ডাকবে তারে
প্রণয়ী যে রাখালরাজা, দূরে কি আর থাকতে পারে।' (বৈষ্ণব)

'রামপ্রসাদ' কবিতায় কুমুদরঞ্জন বললেন—'ভক্তিকে করিয়া দিয়ে পূজা

উপচার।' স্নেহ প্রীতি; ভক্তি ও প্রেমের আবীর ও কুঙ্কুমের হোলিখেলায় কুমুদ-কবির হৃদকমল মঞ্চ লালে লাল। সেই কমল মঞ্চে দুলিতেছে শ্যাম ও শ্যামা।

ভক্ত প্রেমিক কুমুদরঞ্জন বলছেন—

'আমার ভক্তি, এ অনুরক্তি বুকের রক্তে বহে।' (পল্লী)

চণ্ডী শক্তিতন্ত্রের প্রসিদ্ধ 'দেবী মাহাত্ম্য' বোধিকা।

ভক্তের ধর্মক্ষেত্র তার কর্মক্ষেত্র। ভক্ত কৃষক একদিন প্রশ্ন করল কবিকে—"ঠাকুর এই জগতের কর্তা জগদীশ্বর, না জগদীশ্বরী?" সাধক কুমুদরঞ্জন কোনো উত্তর দিচ্ছেন না দেখে, কৃষক তার স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করে বলল—'শ্যামা মাই জগতের কর্তা।' কবি বললেন—ভাই তুমি বুকের চণ্ডী পাঠ করলে। 'ভক্তির যুক্তি' কবিতাটি চণ্ডীর নারায়ণী স্তুতির অপূর্ব ব্যাখ্যা, সরল বাংলা ভাষায় স্বচ্ছন্দ ও সাবলীলছন্দে। কবি কৃষকের যুক্তি সমর্থন করছেন যখন কৃষক তাঁকে বলছে—যে জগদ্ধাত্রী, জগৎপালিনী জগৎস্থিতি ও সংহারকারিণী যিনি তিনি বই আর কে জগতের কর্তা হতে পারে।

দেবী মাহাত্ম্য সেইজনই বুঝতে পারবে যে কর্মের দ্বারা জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেমলাভ করে দেবীকে সর্বাশ্রয়ী জ্ঞানে তাঁর চরণে আত্ম নিবেদন করবে ও তাঁর কৃপা কণা চাইবে। নারায়ণী স্তুতির মর্মবাণী কৃষক বুঝতে পারল তার কর্মনিষ্ঠা প্রসূত জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেমের মাধ্যমে। কবি কৃষককে স্তুতি বাদ করে বলছেন—'তুমিই করেছ বুকের চণ্ডীপাঠ।'

কবির ভক্তহৃদয় কৃষকের রাগভক্তির উচ্ছ্বাসে কতখানি অভিভূত হল তার ছবিটি ফুটে ওঠে তাঁর বাণীটিতে—

'জেনো ধর্মক্ষেত্র এই যে তোমার মাঠ
নীরবে হেথায় তুমিই করেছ বুকের চণ্ডীপাঠ।
তুমি ভক্তির গরদ পরেছ, তোমারে প্রণাম কোটি
পাতা খেয়ে খেয়ে ভোঁতা হল মুখ আমরা কাটছি গুটি।'

নারায়ণী স্তুতির সারকথা—'ত্বয়ি ভক্তি নম্রা।'

ভক্তহৃদয়েই ভগবানের বাস ও ভক্তির বাঁধনেই ভগবান বাঁধা—'পাতা খেয়ে খেয়ে ভোঁতা হল মুখ আমরা কাটছি গুটি।' কথাটির অপূর্ব ব্যাখ্যা পাই ঠাকুর রামকৃষ্ণের অমৃতবাণীতে—বদ্ধজীব—সংসারী জীব এরা যেন গুটিপোকা। মনে করলে কেটে বেরিয়ে আসতে পারে। কিন্তু নিজে ঘর বানিয়েছে ছেড়ে আসতে মায়া। শেষে মৃত্যু—কোন কোন গুটি পোকা যত্নে গুটি কেটে বেরিয়ে আসে। সে কিন্তু দু একটা (কথামৃত ২য়। ১৮ পৃঃ) সংসার বন্ধনে বদ্ধজীবকেই কবি কুমুদরঞ্জন বলেছেন—

'পাতা খেয়ে খেয়ে ভোঁতা হল মুখ, আমরা কাটছি গুটি।'

ভোগের ইতি করে কৃষক পেয়েছে ভক্তি।

ক্রান্তদর্শী মরমিয়া সাধক কুমুদরঞ্জন বাংলার চৈতন্য মহাপ্রভু, রামপ্রসাদ, বামদেব, শ্রীরামকৃষ্ণ ও রবীন্দ্রনাথের গোষ্ঠীভুক্ত। তাঁর অন্তর্লোকে ঐসব মহাজনদের ভাবগঙ্গা নিসৃত সুধাতরঙ্গিনী দ্বারা পুত, পবিত্র ও শুচিশুভ্র। তাঁদের সাধনার অন্তর্নিহিত ধারাপথকে অনুসরণ করে কবি কুমুদরঞ্জন তাঁর সাধকজীবনের ধারাটিকে একটি নিজস্বরূপ দিয়েগেছেন।

কুমুদরঞ্জন মল্লিকের গ্রন্থপঞ্জী

নচিকেতা ভরদ্বাজ

সংখ্যার দিক থেকে কবিরা কখনোই গল্পকার ও ঔপন্যাসিকদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারেন না। একমাত্র রবীন্দ্রনাথই উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। কুমুদরঞ্জনের গ্রন্থ স্বল্প। কিন্তু নিজস্ব স্বাদে ও সৌন্দর্যে অকপট আন্তরিক রূপ এবং উচ্চারণে বাংলা কাব্যে চিরকালীন সম্পদ হয়ে আছে।

"কুমুদরঞ্জন মল্লিক, করুণানিধান, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কবিশেখর কালিদাস রায় প্রভৃতির কাছে বাঙালী কাব্যপাঠক চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকবে।...এঁরা দীর্ঘকাল বাঙালী পাঠককে কাব্যরসের মোটা ভাত-কাপড় জুগিয়ে এসেছেন—এক সময়ে এই কাজ করেছেন মঙ্গলকাব্য প্রণেতাগণ ও কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস।...আমার স্থির বিশ্বাস 'অতি আধুনিক কবিতার' ওলাই চণ্ডীর প্রতিমা যখন বিস্মৃতির জলে ডুবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে তখনো এঁদের বহুতর কবিতা বাঙালী সমাজকে আনন্দ দান করতে থাকবে।"—বলেছেন শ্রদ্ধেয় প্রমথনাথ বিশী। "তাঁদের কাব্য এমন একটি ধারাকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে সেই ধারা বুঝি লোপ পাইতে চলিল। এ ধারা বাংলা সাহিত্যে নবাগন্তুক নয়, অতি প্রাচীন; প্রচুর রবীন্দ্র প্রভাব সত্ত্বেও এ ধারা আপন বৈশিষ্ট্য হারায় নাই; রবীন্দ্র প্রভাবের ফলে বাংলাকাব্যে যখন ক্রান্তিকাল ঘটিতেছিল, তখন ইহারা এবং ইহাদের মতো কবিগণ নবীনকে অস্বীকার না করিয়া প্রাচীন কাব্যসংস্কার সাধ্যানুসারে সজীব করিয়া রাখিতে সচেষ্ট ছিলেন।"

"এমন অমায়িক মধুর ব্যবহার খুব সুলভ নয়।...বাংলা প্রবাদ 'মাটির মানুষ' কথাটি সম্ভবত এই ধরণের মানুষদের লক্ষ্য করেই প্রথম উদ্ভাবিত হয়েছিল।" অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত : কুমুদরঞ্জনের কাব্যবিচার থেকে উদ্ধৃত।

"আমার কবিতা সম্বন্ধে আমি কিছু লিখি নাই, তবে অধিকাংশ কবিতায়েই আমার নিজের কথা ও ঘরের কথা বলিয়াছি।" অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্তকে লেখা কবির চিঠির অংশ॥

আগেই বলেছি কুমুদরঞ্জনের কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা খুব বেশি নয়। এবং তারও অনেকগুলি আজ দুষ্প্রাপ্য। তাই তাঁর কাব্যসম্ভার এবং শ্রেষ্ঠ কবিতা একালের পাঠকের কাছে কবি পরিচয় বহন করে। তবু এখানে তাঁর বিরচিত কাব্যগ্রন্থগুলির নাম ও প্রকাশকাল উল্লিখিত হল। তাঁর কাব্যকৃতি এবং কবি-জীবন নিয়ে কিছু আলোচনাও হয়েছে। যে সব গ্রন্থে এ রকম আলোচনা রয়েছে তাও এ পঞ্জীর অন্তর্ভুক্ত করা হল। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এ ছাড়াও বহু নিবন্ধ আছে যার মূল্য হয়তো অপরিসীম। গ্রন্থাগারে অপ্রকাশিত অনেক কবিতাও নানা পত্র-পত্রিকায় ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। তার কিছুই এ পঞ্জীর অন্তর্গত করা গেল না। মোটামুটি সাধারণ কাব্যরসপিপাসু মানুষেরা যাতে কবি কুমুদরঞ্জনের সম্পর্কে একটি পরিচয় পেতে পারে তার জন্যই কেবল মাত্র

তাঁর এবং তাঁর সম্পর্কে বিরচিত গ্রন্থগুলির একটি তালিকা এখানে দেয়া হল। বলাবাহুল্য রূপাবয়বে এবং সামগ্রিকতার বিচারে এ পঞ্জী কোনোদিক থেকেই পূর্ণাঙ্গ নয়। প্রথমে কবির কবিতাগ্রন্থ এ:ং তার পরে কবি এবং তাঁর কাব্য সম্পর্কিত॥

কবির কবিতাগ্রন্থ (বাংলা বর্ণমালার ক্রম অনুসারে সজ্জিত)

অজয়। উজানি। ১৯১১। উজানি। ২য় সংস্করণ। ১৯১৭।

একতারা। ১৯১৪। একতারা। ২য় সংস্করণ। ১৯২০।

কুমুদরঞ্জন কাব্যসম্ভার। কলকাতা। মিত্র ও ঘোষ। ১৯৬৭। ২৯, ৪০০ পৃ। ১০˙০০ মূল্য।

চূণকালি। ১৯৩০।

তূণীর। ১৯২৮।

দ্বারাবতী। ১৯২০ (নাটক)।

নূপুর। ১৯২২।

বনতুলসী। ১৯১১।

বনমল্লিকা। ১৯১৮।

বীথি। ১৯১৫।

বীণা। ১৯১৬।

রজনীগন্ধা। ১৯২১।

শতদল। ১৯০৬। শতদল। তৃতীয় সংস্করণ। ১৯২৫।

শ্রেষ্ঠ কবিতা। কলিকাতা। মিত্র ও ঘোষ। চতুর্থ মুদ্রণ তারিখ নেই। ১৮, ২৬২ পৃঃ।

প্রতিকৃতি। ৫-৫০।

স্বর্ণ সন্ধ্যা। কলকাতা। ১৯৪৯। ৪, ১৮০ পৃঃ।

কবি সম্পর্কে

১। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রানুসারী কবি সমাজ। কলকাতা। এ, মুখার্জি এণ্ড কোং। ১৯৫৯। ৮, ৩২৮ পৃঃ। ৬ ০০ মূল্য।

২। ক্ষেত্র গুপ্ত। কুমুদরঞ্জনের কাব্য বিচার। কলকাতা। গ্রন্থনিলয়। ১৯৫৯। ১০, ১০১ পৃঃ। ২˙৭৫।

৩। ক্ষেত্র গুপ্ত। কুমুদরঞ্জনের কাব্য বিচার। ২য় সংস্করণ। কলকাতা। গ্রন্থনিলয়। ১৯৬১। ১০, ১৪০ পৃঃ। ৩˙৫০।

৪। মোহিতলাল মজুমদার। সাহিত্য বিতান।

৫। প্রমথনাথ বিশী। বাংলার কবি। কলকাতা। শ্রীগুরু লাইব্রেরী। ১৯৫৯। ৮, ১৫১ পৃঃ। ৪ ০০।

৬। সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। পূর্বপত্র। কলকাতা। এস. সি. সরকার এণ্ড সন্স। ১৯৬৩। ২১৯। পৃঃ। ছবি। ৬˙০০।